শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

পরমকারুণিক শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপায় 'কথামৃত-প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথমে বেলুড় মঠে, পরে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে সাপ্তাহিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের যে নিয়মিত আলোচনা হ'ত, সেগুলি কয়েকজন ভক্ত স্বতঃপ্রেরিত হ'য়ে টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখতেন। এইভাবে আলোচনার পরে সেগুলি অনুলিখিত হ'য়ে থাকত। প্রথমে শ্রীসমীর রায় এই কাজের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছিলেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ চালিয়ে গেছেন। যখন তিনি বেলুড়ে থাকতেন, তখন একাজ তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু তারপর যখন তিনি বাসস্থান পরিবর্তন ক'রে কলকাতায় গিয়েছিলেন, তখনও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ ক'রে গেছেন। কেবল, যখন তাঁকে কলকাতার বাইরে স্থায়িভাবে চলে যেতে হয়, তখনই এ-কাজের দায়িত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে সাপ্তাহিক আলোচনায় যোগদানকারী ভক্তদের কেউ কেউ তাঁর আরব্ধ কাজের ভার নিজেদের উপর তুলে নেন। কাজেই এই কথামৃত-প্রসঙ্গের ধারা অব্যাহতভাবে সংগৃহীত হ'তে থাকে।

ভক্তদের অনেকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, যেন এই 'কথামৃত-প্রসঙ্গ' মুদ্রিত হ'য়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেজন্য অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মিত্র সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন ক'রে সেগুলিকে মুদ্রণের উপযোগী করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বোম্বাই শাখার অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ পাণ্ডুলিপিগুলি যথাসাধ্য সংশোধন ক'রে দেন। উদ্বোধন কার্যালয় গ্রন্থটির প্রকাশনার ভার নেয়। আভা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদারের আগ্রহে গ্রন্থখানির

মুদ্রণ কার্য দ্রুত সম্পন্ন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রুফ সংশোধনের কাজে বিশেষ সাহায্য করেন। এই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে গ্রন্থটির এরূপ দ্রুত প্রকাশন কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।

আমাদের অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থের মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে গিয়েছে সন্দেহ নেই, সেজন্য আমরা দুঃখিত। বিশেষতঃ সাপ্তাহিক সভায় আলোচিত হওয়ায় প্রসঙ্গগুলি কোথাও কোথাও বাদ পড়ে গেছে, আবার অনেক সময় বিষয়বস্তুর পুনরুল্লেখ স্থানে স্থানে দেখা যাবে। এই পুনরুক্তি পরিহার করা সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা পাঠকদের কাছে ত্রুটি স্বীকার ক'রে মার্জনা চাইছি।

নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা থাকলেও শ্রোতাদের একান্ত আগ্রহে সুষ্ঠু-ভাবে সংশোধিত না হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'ল। আশা করি ত্রুটিগুলির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যে পুণ্য কথাপ্রসঙ্গ এই আলোচনার বিষয়বস্তু, পাঠকেরা অনুগ্রহ ক'রে সেদিকেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। যদি এই প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-রস আস্বাদনে পাঠকদের বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে, তাহলেই গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে এই সেবা সার্থক গণ্য হবে।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথম সংস্করণ অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায়—দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিতে হইল। পূর্ব সংস্করণের ত্রুটির জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে, বিষয়গুলি মার্জিনে না রাখিয়া অনুবন্ধের মাথায় দেওয়া হইয়াছে এবং পাঠকের সুবিধার জন্য ডান দিকের পাতার মাথায়ও দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী আনুষঙ্গিক যা পরিবর্তন করা হইয়াছে, আশা করি বিষয়নির্ধারক তত্ত্বান্বেষী পাঠক-পাঠিকাদের উহা সাহায্য করিবে। ইতি

প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সূচীপত্রে বন্ধনীর অন্তর্গত প্রথম সংখ্যা কথামৃতের ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা পরিচ্ছেদ। পুস্তকে অধ্যায়ের শীর্ষে এই সংখ্যাগুলিই আছে।

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভিতরে সকল শাস্ত্রের সার পাওয়া যায়। তা ছাড়া, এমন সরলভাবে সকলের সহজবোধ্যরূপে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ আর কোথাও আছে কিনা, আমরা জানি না। কাজেই 'কথামৃতে'র পাঠ ও অনুশীলন আমাদের সকলেরই পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রে পুনরুক্তি

দেখা যায় 'কথামৃতে' একই কথা একাধিকবার বলা হয়েছে। এই পুনরুক্তি কিন্তু দোষের নয়, বরং অশেষকল্যাণকর। আমাদের শাস্ত্রকে বলা হয় সনাতন। যেমন গীতায় ভগবান বলেছেন;

'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ' (৪|৩)

—(হে অর্জুন!) সেই পুরাতন যোগই আমি আজ আবার তোমাকে বললাম।' প্রাচীনকালে বহুবার যা বলা হয়ে গেছে, গীতায় তা-ই তিনি পুনরাবৃত্তি ক'রে অর্জুনকে বললেন। আর যুগে যুগে ধর্মের মূল তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি ভগবান নিজে আবির্ভূত হয়ে করেন। এই যে তিনি বারে বারে আবির্ভূত হয়ে একই সনাতন তত্ত্ব বলছেন, এতে পুনরুক্তি-দোষ হয় না। 'শাস্ত্রেষু ন মন্ত্রাণাম্ জামিতা অস্তি'। বার বার এক কথা বলতে শাস্ত্রের কোন আলস্য নেই। কেন? না, আমাদের এমন মন যে বার বার শুনলেও তাতে কিছু রেখাপাত হয় কিনা সন্দেহ। এই জন্য শাস্ত্র অনলসভাবে বার বার বলে যাচ্ছেন। যেমন মা সন্তানকে বার বার উপদেশ দেন তার কল্যাণের জন্য। বার বার বলায় তাঁর বিরক্তি হয় না, কারণ ঐ বলাতে ছেলের কল্যাণ হয়। ঠিক সেই রকম শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ যা, সার কথা যা, তা শাস্ত্র বার বার বলেন, বহুভাবে

বলেন। আমরা কথামৃতের ভিতরে তারই উল্লেখ দেখতে পাই। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় একবার বলেছিলেন—'মামা, তুমি এক কথা বার-বার ক'রে বলো কেন?' ঠাকুর বললেন—'কেন ব'লব না?' ভাবটা হচ্ছে এই যে, বার বার ক'রে না বললে আমাদের মতো বিক্ষিপ্ত মনের উপরে দাগ পড়বে কি ক'রে? তাই বার বার তাঁদের বলতে হয় এবং বার বার আমাদের শুনতে হয়। কাজেই শাস্ত্রে কখনও পুনরুক্তি-দোষ হয় না। আর ভাগবতে ঋষিরা এক জায়গায় (১।১।১৯) বলছেন যে, ভগবানের কথা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। যত শুনি, তত তার ভিতরে রস আরও আস্বাদন করবার যেন নতুন নতুন শক্তি আসে আমাদের। যত দিন যায়, যত শুনি আরও বেশী ক'রে বুঝতে পারি, আরও বেশী ক'রে তার ভিতর থেকে রস পাই। এই জন্যও বার বার শুনতে হয়।

কথামৃত—অমৃতস্বরূপ, সহজ ও যুগোপযোগী।

সুতরাং যে অমৃত আমাদের মৃত্যু-সাগর থেকে উদ্ধার করবে, সেই 'কথামৃত' আমরা আস্বাদন করবার চেষ্টা ক'রব। তাঁর কৃপায় যদি এর কিছু মর্ম আমরা গ্রহণ করতে পারি, তা হ'লে আমাদের জীবন সার্থক হবে। অমৃতের একটি বিন্দু যদি কোন রকম ক'রে গ্রহণ করি, আমরা অমর হবো। এইজন্য ঠাকুরের কথাকে 'অমৃত' বলা হয়েছে—মাস্টার-মশাই তুলনীয় আর কিছু পাননি। তাই 'কথামৃত' নাম দিয়েছেন—ভাগবতকে অনুসরণ ক'রে। এই অমৃত-পানে মানুষ অমর হবে যুগ যুগ ধরে। এই অমর-বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাবে, মানুষের প্রাণে প্রবেশ করবে এবং তাকে অমর করবে। এই 'কথার অমৃত' পান করবার জন্য মানুষের বিশেষ কোন ভূমিকা দরকার হয় না। শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পড়তে হ'লে বিশেষ একটা যোগ্যতা দরকার হয়। কিছু জ্ঞান অর্জন ক'রে নিয়ে তারপরে মানুষের শাস্ত্র আলোচনা করবার অধিকার

আসে। কিন্তু এই রকম কোন অধিকার নিয়ে 'কথামৃত' আলোচনা করবার দরকার হয় না। যে কিছু জানে না, তার পক্ষে 'কথামৃত' আরও সহজবোধ্য হবে। অনেক জ্ঞান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মানুষের সংশয়কে বাড়িয়ে দেয়। আসলে 'এক জ্ঞান'ই জ্ঞান। প্রথম দর্শনেই মাস্টারমশাই শিখলেন ঠাকুরের কাছ থেকে যে, ভগবানকে জানার নাম জ্ঞান, আর তাঁকে না জানার নাম অজ্ঞান।

এটি শেখবার কথা। মাস্টারমশায়ের কাছে কথাটি নতুন ঠেকেছিল, যদিও তিনি যখন ঠাকুরের কাছে গেছেন তখন শুদ্ধ মন নিয়েই গেছেন—যেজন্য ঠাকুর প্রথম থেকেই তাঁকে আপনার ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কথারূপ অমৃত জগতে পরিবেশন করার বিশেষ ভার তাঁর উপরে দিয়েছেন তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে। সেই শুদ্ধচিত্ত কৃতবিদ্য মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে গিয়েই প্রথমে যখন কথা উঠল, জানলেন যে, ভগবানকে জানার নাম জ্ঞান, আর তাঁকে না জানার নাম অজ্ঞান। আমরা যদি দশটা বই পড়ি, তাতে আমাদের বুদ্ধি একটু মার্জিত হয় বটে; কিন্তু যদি মন শুদ্ধ না হয়, তা হ'লে সেই বুদ্ধির মার্জনা আমাদের তত্ত্বজ্ঞানলাভে বিশেষ কিছু সাহায্য করে না। 'পোথী পঢ়কে তোতা ভয়ে, পণ্ডিত ন ভয়ে কোঈ।' শাস্ত্র প'ড়ে মানুষ তোতাপাখী হয়, পণ্ডিত হয় না। ঠাকুর বলছেন, পাখী 'রাধাকৃষ্ণ' বলে, আরও কত কি পড়ে; কিন্তু যখন বিড়ালে ধরে, তখন ট্যাঁ ট্যাঁ করে। তখন আর 'রাধাকৃষ্ণ' বলে না। পাণ্ডিত্যের দ্বারা মানুষের বুদ্ধির প্রখরতা হয়, বাক্‌পটুতা হয়, লোককে কথা ব'লে মুগ্ধ করতে পারা যায়। কিন্তু তার দ্বারা সংশয় দূর হয় না। পাণ্ডিত্যের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ভগবানকে জানতে পারে, তা নয়। ভগবানকে জানবার পথ হ'ল অন্য। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। উপনিষদ্ বলছেন, আত্মাকে বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা জানা যায় না—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' (মু. উ.

৩।২।৩)। বহু শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করলেই যে মানুষ ভক্ত বা জ্ঞানী হয়, তা নয়। বরং বহু অধ্যয়ন মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। 'নানুধ্যায়াদ্ বহূঙ্‌শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ' (বৃহ. উ. ৪।৪।২১)—বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে না, কারণ তা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। অনেক পড়লে বুদ্ধি বিচলিত হয়। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করবার জন্য, প্রখর করবার জন্য, একাগ্র করবার জন্যই শাস্ত্র-অধ্যয়ন, কিন্তু শাস্ত্রই বলছেন যে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে উল্টে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পঞ্চদশী-টশী পড়েছ ?' সান্ন্যাল মশায় উত্তরে বলেছিলেন, 'সে কার নাম, মশাই, আমি জানি না।' শুনেই ঠাকুর বললেন, 'বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐসব পড়ে আসে ; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জ্বালায়।' কতকগুলো বই প'ড়ে তার বদহজম হওয়ায় মানুষ পণ্ডিতমূর্খ হয়। সে মনে করে পণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি সে যে মূর্খ, এ বোধ তার হয় না। এইজন্য শাস্ত্রই বার বার বলছেন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তাঁকে জানা যায় না। একটু ধর্মভাব এলেই মানুষ গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্তের গ্রন্থ—এই সব পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরিণাম কি হয় ? পরিণাম এই হয় যে, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। তা হ'লে কি শাস্ত্র প'ড়ব না ? এমন কথা ঠাকুর বলেননি বা শাস্ত্রও এমন কথা বলেন না। প'ড়ব, কিন্তু তার জন্য যে বিবেক দরকার, যে শ্রদ্ধা দরকার, সেই বিবেক, সেই শ্রদ্ধা অর্জন ক'রে তবে প'ড়ব। শাস্ত্র মানুষকে কতদূর বিভ্রান্ত করে, তা শাস্ত্রের অসংখ্য মতবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারি। কেউ বলছে, শাস্ত্র এই কথা বলছেন ; কেউ বলছে, শাস্ত্র অন্য কথা বলছেন। এই নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হচ্ছে না, এবং মীমাংসা না হবার কারণ এই যে, সকলেই খোসা নিয়ে টানাটানি করছে। শাস্ত্রের ভিতরে যে সার বস্তু, তাতে পৌঁছতে পারছে না। ঠাকুর বলেছেন, 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে, চিনিটুকু নেওয়া বড়

কঠিন।' কাজেই শাস্ত্র আমরা সহজে বুঝতে পারি না। তা হ'লে উপায় কি? উপায় হচ্ছে, যাঁদের জীবনের দ্বারা শাস্ত্র প্রাণবন্ত হচ্ছে, তাঁদের জীবনালোকে শাস্ত্রকে দেখা। তা না হ'লে শাস্ত্র বোঝা যায় না। শাস্ত্র বুঝতে আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে চেষ্টা করি,—স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে—আমাদের সাধ্য নেই যে, তার মর্ম আমরা স্পর্শ করতে পারি। কারণ, সেক্ষেত্রে আমরা কথার মারপ্যাঁচই খালি দেখব আর বিভ্রান্ত হবো, যেমন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাষাবিদ্ হিসাবে শাস্ত্রের মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে কত যে বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এ স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা যে যন্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সেই মনরূপ যন্ত্রটি শুদ্ধ হয়নি। অতএব তার ভিতর দিয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কিছুতেই প্রতিভাত হয়নি। সুতরাং একমাত্র উপায় হ'ল এই যে, যাঁরা তাঁদের জীবনালোকে শাস্ত্রকে উদ্ভাসিত করেছেন, যাঁরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে শাস্ত্রকে প্রাণবন্ত করেছেন, তাঁদের জীবনালোকেই শাস্ত্রকে বুঝতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

'কথামৃত' এই দিক দিয়ে আমাদের অব্যর্থ সহায় হবে। এর ভিতর দিয়ে আমরা সত্যকে এত সহজে জানতে পারব যে, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। জগতের আদিকাল থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তার এত সুষ্ঠু, এত সহজ সমাধান আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ঠাকুর বলতেন, নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না। বলতেন, আগে সাদাসিধে জ্বর হ'ত, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেত ; এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি 'ডি গুপ্ত' ঔষধ। ভাব হচ্ছে এই যে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নবীন সমস্যার সমাধান হয় না। যুগ বদলে গেছে, অনেক সমস্যা এসেছে, যা আগে ছিল না। নবীন সমস্যার জন্য নবীন কোন আলোকের সন্ধান চাই, যার দ্বারা সমস্যার সমাধান হ'তে পারে।

নারদীয়া ভক্তি

ঠাকুরের জীবন এবং তাঁর 'কথামৃতে' এই নবীন সমস্যাগুলির অপূর্ব সমাধান আমরা পাই। কতভাবে যে তিনি আমাদের জীবনের সমস্যা-গুলির সহজ সমাধান ক'রে দিয়েছেন দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়। বলেছেন, আগে লোকে যোগ-যাগ তপস্যা ক'রত; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্বল মন, একাগ্র হয়ে করলে এক হরিনামেই সব সংসারব্যাধি দূর হয়। বলেছেন, ঋষিদের মতো কঠোর তপস্যা করবে—তোমাদের সে সময় কোথায়! তোমরা অল্পায়ু, অন্নগত প্রাণ; সময় নেই। যাগ-যজ্ঞ অত বিরাট আড়ম্বর ক'রে করা—তোমাদের দরকার হবে না। কি দরকার হবে, তা নানাভাবে বলেছেন। নারদীয়া ভক্তির কথা বলেছেন। সে ভক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তি নয়। নারদীয়া ভক্তির অর্থ—শুদ্ধা ভক্তি, শরণাগতি সহকারে ভক্তি, যাতে ভক্ত ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। কি ক'রে করে ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন: মা, আমি কিছু জানি না; তুমি আমাকে সব জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। কেমন ক'রে তোমাকে পেতে হয়, তার সাধনভজন আমি জানি না। যা করবার আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও। এই যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ, এরই নাম নারদীয়া ভক্তি। ভাবটা হচ্ছে এই যে, তাঁর কাছে কিছু চাই না। খালি তাঁকে চাই। ভগবানকে সেখানে উপায় ব'লে গ্রহণ করা হচ্ছে না। অর্থাৎ, তাঁকে ডাকছি, তিনি আমার রোগ ভাল ক'রে দিন, আমার সম্পদ বাড়িয়ে দিন, আমার আত্মীয়-পরিজন সকলকে সুখে রাখুন, সবাইকে দীর্ঘজীবী করুন, এই উদ্দেশ্যে নয়। এগুলি মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ঠাকুর বারণ করছেন। কেন? বলছেন, রাজার কাছে গিয়ে কেউ কি লাউ-কুমড়ো চায়? ভগবান এ-সব দেন, দিতে পারেন না, তা নয়; কিন্তু তিনি আরও অনেক কিছু দেন। তিনি

কল্পতরু। তাঁর কাছে যা চাই, তাই যদি পাওয়া যায়, তা হ'লে ছোট-খাটো জিনিস চাইব কেন? একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসি না কেন? তাঁকেই যদি পাই, তা হ'লে আর কিছু অপ্রাপ্ত থাকে না। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' (গীতা, ৬।২২)—যাকে পেয়ে তার চেয়ে আরও বড় কিছু লাভ আছে, কেউ মনে করে না।

ধ্রুবের উপাখ্যানে আছে যে, ধ্রুব বিমাতার কাছে অপমানিত হয়ে অতিশয় ক্ষুব্ধ মনে মায়ের আদেশে তপস্যা করতে গেলেন। কেন?—না, বাপের যে রাজ্য, তার চেয়েও বড় রাজ্য চাই তাঁর। ছোট ছেলের যেমন মনে হয়। অভিমানে আঘাত লেগেছে। বাবার যা রাজ্য, তার চেয়েও বড় রাজ্য চাই। ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করছেন তিনি। শিশুর একান্ত প্রার্থনা ভগবানকে অস্থির করেছে। আবির্ভূত হয়েছেন সামনে। ধ্রুবকে বলছেন, 'কি বর চাও, বলো। ধ্রুব বিপদে পড়ে গেলেন। বললেন, 'বর! বর তো কিছু চাই না।' 'সে কি ধ্রুব! তুমি মনে ক'রে দেখ। কি যেন তুমি চাইছিলে, যার জন্য তপস্যা ক'রছ।' তখন ধ্রুবের মনে প'ড়ল। বলছেন, হ্যাঁ, আমি স্থানাভিলাষী হয়ে একটা রাজ্য আকাঙ্ক্ষা ক'রে, বড় রাজ্য একটা চেয়ে তপস্যা আরম্ভ করেছিলাম; কিন্তু আমি যা চাইছিলাম, তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস পেয়ে গেছি। কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে কাঞ্চন পেয়ে গেছি বহুমূল্য জিনিস পেয়েছি। "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে" (হরিভক্তিসুধোদয়, ৭।২৮)—হে প্রভু, আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি, আর বর চাই না।' এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি—নিঃস্বার্থ ভক্তি—নারদীয়া ভক্তি। এ নারদীয়া ভক্তি বৈষ্ণবের হবে, শাক্তেরও হবে। হিন্দুদের শুধু নয়, অন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও হবে। এ না হ'লে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না। এই সহজ কথাটি 'কথামৃতে' আমরা বার বার ক'রে পাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবন ও উপদেশ

সর্বোপরি আমরা দেখব ঠাকুরের জীবন। তাঁর কথাগুলি সবই তাঁর জীবনের দ্বারা প্রাণবন্ত। সেগুলি কথার কথা নয়। তাঁর জীবনেই সেগুলি প্রতিফলিত। তাঁর বাণীর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে তাঁর জীবন। তাই তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা 'কথামৃত' সহজে বুঝতে পারি। যেন এই জন্যই তাঁর আবির্ভাব এই বর্তমান যুগে, এই অনিশ্চয়তার যুগে, যাকে আমরা বলি 'ঘোর কলি'। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলতেন যে, ঠাকুরের জন্ম থেকে সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছে। আমরা এই সত্য-যুগের আরম্ভে এসেছি। এটা বড় কম সৌভাগ্য নয়! এমন যুগে এসেছি, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্বলন্ত প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রবল শক্তির যেন একটা পুঞ্জীভূত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যেন সূর্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। অথচ এই সূর্য দগ্ধ করে না, স্নিগ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে ভীতিজনক কিছু নেই। তাঁর চরিত-কথার মাধ্যমে তাঁকে দেখলে ভয় হবে না। একটা ছোট ছেলেরও ভয় হবে না। চিমটে নেই, জটা নেই, ভস্ম নেই—নেই কোন রকম বিকট হুঙ্কার!

তাঁর উপদেশের ভিতর এমন কোন কঠিন কথা নেই, যা আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। কত সোজা ক'রে বলছেন, যাতে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি, যাতে আমাদের মন বিভ্রান্ত না হয়। ভগবানকে ভাল-বাসার প্রসঙ্গে বলছেন ঃ কি রকম ভালবাসা? না, যেমন বাপ-মাকে আমরা ভালবাসি। বলছেন তিন টান একসঙ্গে হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়—মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান। এই টানগুলি আমরা বুঝি, কারণ আমাদের সকলেরই জীবনে এগুলি অল্প-বিস্তর অনুভূত। বলছেন, এই রকম তিন

টান একসঙ্গে হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। খুব বেশী শাস্ত্রজ্ঞান দরকার নেই এটুকু বুঝবার জন্য।

তাঁকে পাবার জন্য কোন একটা বিকট রকমের সাধনার কথা বলছেন না। সোজা কথা। ধ্যান ক'রব কোথায়? বলছেন ঃ মনে, বনে, কোণে। বনে বলছেন—বনেতে সকলে পারব না যেতে। কোণে—বাড়ীর কোণে। ঘরের কোণে বসে তাঁকে ডাকলে তাতেও হবে। যদি এমন একটি কোণও না পাওয়া যায় যেখানে তাঁকে নির্জনে ভাবতে পারি, তা হ'লে মনে—পরিবেশ-নিরপেক্ষ হয়ে—করলেও হবে।

কেউ বলছেন, মশাই অত সাধনা টাধনা করবার সময় নেই। ঠাকুর বলছেন, দু-বেলা তাঁকে খুব দুটো ক'রে প্রণাম করবে; ক'রে বলবে, আমার তো সময় নেই তোমাকে চিন্তা করার—হে প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কৃপা কর। কত সহজ ক'রে দিচ্ছেন—দুটি প্রণাম দু-বেলা!

গিরিশবাবু ও বকল্‌মা

গিরিশবাবুকে উপদেশ দেবার সময় বলছেন ঃ দেখ, সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো। গিরিশবাবু ভাবছেন, দিনে দুবার ভাববার সময় কোথায়! আমি কত কাজে ব্যস্ত থাকি! গিরিশবাবুকে নীরব দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝে ঠাকুর বলছেন, খাবার বা শোবার আগে একবার স্মরণ ক'রে নিও। গিরিশবাবু তখনও নীরব—উত্তর দিতে পারছেন না। ভাবছেন, আমার তো খাওয়া-দাওয়ার সময়েরই ঠিক নেই—কোন দিন খাই বেলা দশটায়, কোন দিন বিকেল পাঁচটায়। মামলা-মোকদ্দমায় থাকি বিব্রত; সুতরাং কথা দিই কি ক'রে। আবার ঠাকুর এত সোজা কাজ করতে বলছেন, 'পারবো না' বলি কি ক'রে! হতাশ হয়ে তিনি চুপ ক'রে আছেন। গিরিশবাবুর মনের কথা বুঝে ঠাকুর বলছেন, "বলবে, 'তাও যদি না পারি'– আচ্ছা,

তবে আমায় বকল্‌মা দাও।” এমন ক’রে, এত সহজ ক’রে আমাদের জন্য ধর্ম কেউ বলেছেন কি? আবার এ-কথা সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হয় যে, এত সহজ ক’রে বলেছেন বলে তিনি যে ধর্মকে খেলো ক’রে দিয়েছেন, তা নয়। এর ভিতরে কোন আপস নেই। ভেজাল কিছু নেই। তা গিরিশবাবু অনেক পরে—ঠাকুরের অদর্শনের পর—বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন, বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এত মানে আছে তা কি আমি তখন বুঝেছি! বকল্‌মা দিতে বলার পরে ঠাকুর গিরিশবাবুকে সেই ভাবের উপযোগী শিক্ষাও দিয়েছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, একদিন গিরিশবাবু ঠাকুরের সামনে কোন একটি বিষয়ে ‘আমি ক’রব’ বলায় ঠাকুর বললেন, “ও কি গো! অমন ক’রে ‘আমি ক’রব’ বলো কেন? যদি না করতে পারো? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো ক’রব।” গিরিশবাবু বুঝলেন, সত্যিই তো! যদি তাঁর উপর বকল্‌মা দিয়ে থাকি—সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়ে থাকি, তা হ’লে তিনি যদি করতে দেন, তবেই তা করতে পারি। গিরিশবাবু পরে বলতেন, তখন তো বুঝি নি, এখন দেখছি, যে বকল্‌মা দিয়েছে তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয়, ভগবানের জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া ‘আমি’-টার জোরে সেটি করলে।

সংসার ও সাধন

সংসার ত্যাগ করতে হবে, এ কথা বলছেন না—সব ত্যাগ ক’রে ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ কথাও বলছেন না। কোন ব্রাহ্মভক্ত একদিন বললেন, উনি যাই বলুন না কেন এখন, পরে একদিন কুটুস ক’রে কামড়াবেন। অর্থাৎ পরে একদিন এমন ক’রে-যাকে বলে—জাত সাপের ছোবল মারবেন যে, আর ঘর-বাড়ী কিছু থাকবে না। ঠাকুর বললেন, তা কেন গো! আমি তো তোমাদের ঘর-বাড়ী ছাড়তে বলি

না। আমি এইটুকু বলি যে, সংসার কর, কেবল এটি তাঁর সংসার—এই বুদ্ধি রেখে কর। তাঁকে ধরে সংসার কর, যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙে, সেই রকম। আঠা লাগবে না। সংসারেতে থাকো—তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তাঁকে ধরে থাকো, তা হ'লে সংসারের দোষ তোমাকে স্পর্শ করবে না। এই হ'ল ঠাকুরের উপদেশ। বলছেন, খুঁটি ধরে ঘোরো, পড়বে না; যেমন ভাগবতে আছে, কবি—নবযোগীন্দ্রের একজন—নিমিরাজকে বলছেন:

'যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রেণ স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ (১১।২।৩৫)

যা (ভাগবত-ধর্ম) অবলম্বন ক'রে মানুষ কখনো প্রমাদগ্রস্ত হয় না; সে যদি চোখ বুজে দৌড়োয়, তবু পড়ে না। ঠাকুরের কথা: যে ছেলেকে বাপ হাতে ধ'রে বা কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভয় নেই। সে হাত-তালি দিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। আর যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে যাচ্ছে, তার ভয় থাকে। কখনও অন্যমনস্ক হয়ে হাততালি দিলে হয়তো পড়ে যাবে। তাঁকে অবলম্বন করা, তাঁর উপর সমস্ত সমর্পণ ক'রে দেওয়া, নিজের ভার তাঁর উপরে ছেড়ে দেওয়া 'কথামৃতে'র ভিতরে এই ভাবটি খুব প্রকটভাবে আমরা পাই।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য

ঠাকুর যেমন ভক্তির কথা বলেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কথা—চরম জ্ঞানের কথাও বলেছেন। বেদান্তী তাঁর বুদ্ধির সাহায্যে বেদান্তের যতদূর যেতে পারেন, তা ঠাকুরের কথাতেই আমরা পাই অতি সহজে। ঠাকুর বলছেন: তোমার বেদান্তে তো এই কথা আছে—'অস্তি, ভাতি আর প্রিয়!' এই অস্তি-ভাতি-প্রিয় নিয়ে তুমি বিচার ক'রছ। তাৎপর্য তো এই, মোট কথা তো এই—তিনি আছেন, তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এবং তিনি প্রিয় আমাদের! এই কথাটুকু বুঝে নিলেই তো তোমার ঝুড়ি ঝুড়ি

বেদান্তের কাজ হয়ে গেল। কথা ঠিক, কিন্তু তার দ্বারা তো আমাদের বুদ্ধিটা দেখানো হয় না। আমি কত বড় পণ্ডিত এটা দেখাতে হ'লে আমার পূর্বপক্ষ দেখাতে হবে, সিদ্ধান্ত দেখাতে হবে, আবার উল্টে সিদ্ধান্তকে পূর্বপক্ষ ক'রে, পূর্বপক্ষকে সিদ্ধান্ত ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হয়কে নয় করতে হবে, নয়কে হয় করতে হবে। এ না হ'লে পণ্ডিত! ঠাকুর বলছেন, ও তোমার দরকার কি! তোমার দরকার কোন রকম ক'রে 'আমি' টাকে নষ্ট করা। এ ছাড়া জ্ঞানী আর কি করে? 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' তাই এই 'আমি'টাকে যে কোনরূপে পারো, নষ্ট কর। জ্ঞানের ভিতর দিয়ে হোক বা ভক্তির ভিতর দিয়ে হোক বা কর্মের ভিতর দিয়ে হোক, বা সবগুলো দিয়ে হোক। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, স্যাকরারা সোনা গলাবার সময়ে উঠে পড়ে লাগে; এক হাতে হাপর, এক হাতে পাখা, মুখে চোঙ—যতক্ষণ না আগুনটা খুব জোর হয়ে সোনাটা গলে। সেই রকম ভগবানের জন্য যখন মানুষের প্রবল উৎকণ্ঠা আসে, তখন সে সব রকম করে এবং প্রাণপণে এগিয়ে যায়, যতক্ষণ না সোনা গলে—অর্থাৎ বস্তুলাভ হয়। এই হ'ল ঠাকুরের সাদা কথায় উপদেশ। এই যে কথাগুলি এর ভিতর দিয়ে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের কি অপূর্ব সামঞ্জস্য এনে দিচ্ছেন, এটি আমরা 'কথামৃতে' লক্ষ্য করি। অপূর্ব সামঞ্জস্য—যা ঠাকুরের দৃষ্টি দিয়ে যদি না দেখতাম, তা হ'লে আমাদের চিরকাল সংসারের মধ্যে থাকতে হ'ত। পণ্ডিতেরা কবে সেই আদিম যুগ থেকে দার্শনিক বিচার আরম্ভ করেছেন, আর আজ পর্যন্ত সে বিচারের শেষ হ'ল না যে, 'তিনি' অদ্বৈত না দ্বৈত, না বিশিষ্টাদ্বৈত, তিনি এক না বহু, সগুণ না নির্গুণ, সাকার না নিরাকার, আর যদি সাকার হন, তাঁর চারটে হাত, না দশটা হাত, না হাজারটা হাত! সমস্যার আর শেষ নেই! 'কথামৃতে' সাদা কথায় এই সব সমস্যার সুন্দর মীমাংসা আমরা পাই—এত সহজ সমাধান যে আমরা সকলেই বুঝতে পারি।

আমরা আজকাল সর্বজনীনতার কথা বলি। বলি, সকলের পক্ষে উপযোগী সব জিনিস দিতে হবে। ঠাকুরের উপদেশের মতো এমন সর্বজনীন উপদেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর উপদেশ এক সঙ্গে পণ্ডিত এবং মূর্খ উভয়কে তৃপ্তি দেয়, ভক্ত জ্ঞানী কর্মী সকলকে সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করে—নাস্তিককে পর্যন্ত বাদ দেয় না। যদি কেউ নাস্তিক হয়, ঈশ্বর আছেন কিনা সংশয় হয়, ঠাকুর বলছেন, একান্তভাবে প্রার্থনা কর, তিনিই জানিয়ে দেবেন তিনি আছেন কি না। নাস্তিককে পর্যন্ত ঠাকুর বাদ দিচ্ছেন না—উপেক্ষা করছেন না।

তাঁর অভয়বাণী কথামৃতের ছত্রে ছত্রে আমরা পাই। দেখি, তিনি কি ক'রে আমাদের সব সময়ে সাহস দিচ্ছেন। আমাদের ভিতরে যত ত্রুটি, যত অপূর্ণতা—সব দেখেও তিনি আমাদের উপেক্ষা করছেন না এবং কি ক'রে আমরা এগুলি থেকে মুক্ত হবো তার সহজ সরল উপায় বলে দিচ্ছেন। একটি দৃষ্টান্ত: যোগানন্দ স্বামীজী (তখন যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী) ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাম যায় কি ক'রে? ঠাকুর বললেন, খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে। কথাটা যোগীনের একটুও মনের মতো হ'ল না। মনে হ'ল, এ আবার একটা কি উপদেশ দিলেন! —উনি কোন ক্রিয়াট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই যা হোক একটা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়!—তা হ'লে এত লোক তো করছে, যাচ্ছে না কেন? পরে ভাবলেন, ঠাকুর যখন বলছেন, তা করেই দেখি না কেন—কি হয়। এই ভেবে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলেন আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেলেন।

অনেক জায়গায় অধিকারিভেদে ঠাকুরের উপদেশে পার্থক্য দেখা যায় —যার জন্য যেটি দরকার সেটিই বলেছেন। কিন্তু কোন জায়গায় তিনি উৎকট কিছু বলেন নি। উৎকটভাবে কিছু করা—কৃচ্ছ্র-সাধনা, যাতে

অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়, এমন কিছু বলেন-নি। বরং বলেছেন, অসাধারণত্ব কিছু রাখবে না, সরলভাবে থাকবে। এবং তিনি নিজে সহজ সরলতার দৃষ্টান্ত। জটা নেই, ভস্ম নেই, চিম্‌টে নেই, সাধুর বাহ্য চিহ্নগুলি যা তাঁকে সর্বসাধারণ থেকে ভিন্ন ক'রে রাখে, এমন কিছুই নেই। কিন্তু যারা তাঁর কাছে আসছে, যত তাঁর কাছে এগোচ্ছে, দেখছে তিনি তত দূরে। যত তাঁর দিকে এগোচ্ছে, তত তাঁর ভিতরের বিশালতার পরিচয় পাচ্ছে। এই হ'ল তাঁর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর নিজে যেমন সহজ, তাঁর উপদেশগুলিও সেই রকম সহজ। এই সহজ উপদেশের ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের আকর্ষণ করছেন। ভগবানকে পাবার পথ তিনি সুগম ক'রে দিয়েছেন, সরল ক'রে দিয়েছেন। 'কথামৃতে'র ভিতরে এর অজস্র প্রমাণ আমরা পাই।

'কথামৃত' পরিচয় ও অভিপ্রায়

যে-গ্রন্থ আমরা পড়তে চাই, তার যা প্রতিপাদ্য বিষয়, তা আগেই সংক্ষেপে জানতে হয়। এই বিষয়বস্তু জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। 'কথামৃতে'র বিষয়বস্তু কি? 'কথামৃতে'র বিষয়বস্তু হ'ল ভগবান এবং ভগবানলাভের উপায়। কি ক'রে আমাদের ভববন্ধন মোচন হবে, কি ক'রে আমরা এই সংসার-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবো, এই যে জন্মজন্মান্তর ধ'রে আমরা অন্ধকারে ঘুরছি, এই অন্ধকারের কি ক'রে নিবৃত্তি হবে, আমাদের যত সংশয় সেগুলি কি ক'রে দূর হবে, আমাদের সংসারে সমস্ত কাজকর্মের ভিতরেও কি ক'রে আমরা ভগবন্মুখী হয়ে অপার শান্তির অধিকারী হবো—এই সব কথা। এগুলি সব ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে আমরা পাব এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা যে-রকমই হোক না কেন, আমরা জ্ঞান-প্রবণ হই বা ভক্তি-প্রবণ হই বা কর্ম-প্রবণ হই, 'কথামৃতে' আমরা সকলেই পথের নির্দেশ পাব—অপূর্ব প্রেরণা পাব।

'কথামৃতে'র পরিচয় দিতে গিয়ে 'কথামৃতকার' শ্রীম, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তথা মাস্টারমশাই, ভাগবতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভূমিকাতে আমরা সেটির আলোচনা করতে পারি। শ্লোকটি হ'ল :

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১০।৩১।৯

—তোমার এই যে কথারূপ অমৃত, কি রকম? না, 'তপ্তজীবনম্'—সংসারতাপে তপ্ত যে মানুষ, মৃতপ্রায় দগ্ধ যে মানুষ, পুড়ে মরছে যে মানুষ, তার কাছে জলস্বরূপ। তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করে—তাকে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে, সংসারচক্র থেকে বাঁচায় এই কথারূপ অমৃত। তারপর বলছেন 'কবিভিরীড়িতম্'। কবি অর্থাৎ জ্ঞানী যাঁরা, শাস্ত্রমর্ম যাঁরা জানেন, তাঁরা এই 'কথামৃতে'র প্রশংসা করেন। তাঁরা সর্বদা এই 'কথামৃতে'র স্তুতি করেন এই ব'লে যে, এই 'কথামৃত' মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়—মানুষ যে মরণশীল নয়, এই জ্ঞান দেয়। আরও এই 'কথামৃত' কিরূপ? না, 'কল্মষাপহম্'। —আমাদের সমস্ত কল্মষ, পাপ, কলুষ, কালিমা এই 'কথামৃত' দূর ক'রে দেয়। সংসারে আমরা অনেক কালি মেখেছি, কারও গায়ে যে কালি লাগেনি, এমন কথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না। এই কালিমা থেকে মুক্ত হবার উপায় কি? হয়তো অনেকের মনে অনুতাপ আসে যে, এই কালিমা থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই। তাই বলছেন, না, উপায় আছে—এই 'কথামৃত' 'কল্মষাপহম্'। শুধু তাই নয়, পুরাণে বলে, অমৃত পান করেই অমরত্ব লাভ হয়। এ-অমৃত কিন্তু পানও করতে হয় না, কেবল মাত্র শুনেই জীবের কল্যাণ হয়—'শ্রবণমঙ্গলম্'। তারপর যদি মনে হয়—আচ্ছা, শ্রবণেতে কল্যাণ হোক, কিন্তু আমার রুচি হবে কি না? তার উত্তরে বলছেন 'শ্রীমদ্'—সৌন্দর্যবিশিষ্ট, এ-কথার ভিতরে এমন সুষমা আছে যে, মানুষকে অনায়াসে আকর্ষণ করে, স্বাভাবিকভাবে। আর,

এই 'কথামৃত' এতটুকু নয় যে, ফুরিয়ে যাবে। তাই বলছেন, 'আততম্' —বিস্তৃত। বিস্তৃত বলতে অপার এবং সহজলভ্য। যেমন আকাশ চারিদিকে বিস্তৃত থাকে, তাকে খুঁজে বার করতে হয় না, যেমন বায়ু চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাকে অন্বেষণ ক'রে আবিষ্কার করতে হয় না, সেই রকম এই কথারূপ অমৃত অপার এবং অনায়াসলভ্য। এই 'কথামৃত' তা হ'লে আমরা সকলে পান করি না কেন? তার উত্তরে বলছেন, 'ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ'—যারা বহু দান করেছে অর্থাৎ বহু সুকৃতি সঞ্চয় করেছে, তাদের এই কথারূপ অমৃতে স্বাভাবিক রুচি হয়—তারাই এর স্তুতি করে, কীর্তন করে, আলোচনা করে। রুচি কারো হয়, কারো হয় না। তার কারণ—পূর্বজন্মকৃত কর্ম। পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত অনেক সুকৃতি যদি থাকে, তা হ'লে মানুষ আবাল্য এই রুচি নিয়ে জন্মায়। সহজাত হয় তার এই রুচি। সুকৃতি যদি কম থাকে, তা হ'লে হয়তো আঘাত পেয়ে তারপরে এই কথায় রুচি হয়। এই রকম বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে। কিন্তু সকলেরই জন্য এই 'কথামৃত' কল্যাণকর এবং এই কথামৃতের অনুশীলন করতে যে একটা খুব কষ্ট হবে তা নয়। রুচি থাকলেই এতে আনন্দ পাবে সকলে।

এই শ্লোকটি মাস্টারমশাই 'কথামৃতে'র গোড়াতেই উদ্ধৃত করেছেন। বইটির নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কেন রাখলেন, তা যেন ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধার করেই জানিয়ে দিচ্ছেন। যিনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে জগতের কল্যাণের জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণরূপে বহুধা নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন, যার সার আমরা গীতা-ভাগবতে পাই। তিনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সকলের সহজবোধ্য হয়, এমন ক'রে এই 'কথামৃত' এখন বলছেন—এই কথাটুকু আমরা মাস্টারমশায়ের এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দেওয়ার অভিপ্রায় ব'লে মনে করি।

এক

কথামৃত ১।১।২

আমরা রোজ একটু ক'রে 'কথামৃত' গ্রন্থ থেকে প'ড়ব এবং তা বুঝবার চেষ্টা ক'রব। আজ কথামৃতের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে আরম্ভ করছি। অবশ্য যে-কোন জায়গা থেকেই আরম্ভ করা যায়। কারণ, 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে'—আদি, অন্ত, মধ্য সব জায়গায় সেই ভগবানেরই কথা আছে। তবে সাধারণতঃ গোড়া থেকেই আরম্ভ করা হয় এবং তাই স্বাভাবিক, এইজন্য গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি। উপক্রমণিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-চরিত মাস্টারমশাই সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিখেছেন ; আমরা সে অংশটি পড়ছি না। তারপর প্রথম পরিচ্ছেদে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি আর বাগান ইত্যাদির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ; তাও আমরা এখন প'ড়ব না। আমরা প'ড়ব সেখান থেকে, যেখানে বলা হয়েছে মাস্টারমশাই প্রথমে ঠাকুরকে কিভাবে দর্শন করলেন, তাঁর প্রথম কথা কি শুনলেন। সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আমরা এই গ্রন্থের অনুসরণ ক'রব।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, মাস্টারমশাই কেবল যে ঠাকুরের কথাগুলি উল্লেখ করেছেন, তা নয় ; কথাগুলির পটভূমি, যে-অবস্থায় ঠাকুর কথা বলছেন, অল্প কথায় তার একটি চিত্র কথামৃতের প্রতি পরিচ্ছেদের ভিতরই দিয়ে গেছেন।

এর একটু রহস্য আছে। মাস্টারমশাই তাঁর ডায়েরীতে ঠাকুরের কথাগুলি সংক্ষেপে লিখে রাখতেন। এত সংক্ষেপে যে, তিনি ছাড়া আর কারও কাছে তার কোন অর্থ হয় না। খুব সংক্ষিপ্তভাবে খালি কয়েকটি

নোটের মতো শব্দ উল্লেখ করা থাকত। 'কথামৃত' লেখবার আগে এই শব্দগুলি নিয়ে এক-একদিনের চিত্র তিনি ধ্যান করতেন। তিনি বলতেন যে, ধ্যান করতে করতে সেই দিনের সমগ্র চিত্রটি তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠত। যখন এইভাবে সমস্ত দিনের ঘটনাটি তাঁর মানসপটে পরিস্ফুট হয়ে উঠত, তখন তিনি লিখতে আরম্ভ করতেন।

এইজন্য আমরা দেখতে পাব, কথামৃতের প্রত্যেকটি কথার ভিতরে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কেবল যে ঠাকুরের কতকগুলি উপদেশ এক জায়গায় সমাবিষ্ট ক'রে সকলকে পরিবেশন করা হচ্ছে, তা নয় ; এক-একটি দিনের চিত্র মাস্টারমশাই সামনে উপস্থিত ক'রে দিচ্ছেন। ঠাকুর ব'সে আছেন, কোন্ দিকে ব'সে আছেন, সঙ্গে ঘরে কে কে আছেন, সব উল্লেখ ক'রে যাচ্ছেন। এর আগে কালীবাড়ির বর্ণনা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়েছেন ; তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কথামৃতের পাঠকরা যেন গোড়া থেকে ঐ চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ঠাকুরকে ধ্যান ক'রে কথাগুলি বোঝবার চেষ্টা করেন। এই হ'ল 'কথামৃতের' অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

মাস্টারমশাই নিজে ধ্যানের সাহায্যে কথাগুলিকে যেন সত্য শুনে তার পরে লিখতেন, এবং তাঁর অভিপ্রায় ছিল, যারা শুনবে বা যারা পড়বে, তারা যেন সেই চিত্রটিকে চোখের সামনে দেখছে, সাক্ষাৎভাবে ঠাকুরের কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনছে, এইভাবে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি আলোচনা করে। তা যদি করে, তা হ'লে কথাগুলি ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্নরূপে আসবে না ; তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে আসবে, জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে কথাগুলি আমাদের কাছে পৌঁছবে—বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিকরূপে নয়। উপদেশগুলি তখন, যাকে বিমূর্ত (abstract) বলে, তা মনে হবে না ; মনে হবে ঠাকুর সাক্ষাৎ যেন বলছেন এবং বলছেন আমাদেরই মতো লোকের জন্য। এই চিত্রটি সামনে রেখে আমরা তাঁর চিন্তা ক'রে 'কথামৃত' আলোচনা করলে বহু সুফল পাব। তাই মাস্টার-

মশাই এইভাবে কথাগুলি বলছেন, কোন নাটকীয় ফললাভের উদ্দেশ্যে নয়, ধ্যানের বস্তু ক'রে তিনি কথাগুলি আমাদের সামনে দিয়েছেন।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার যে, মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে যাবেন, মনে এ-রকম কোন সংকল্প নিয়ে বেরোননি। বরানগরে গেছেন, অনেক বাগান ছিল তখন সেখানে। এ-বাগানে সে-বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর আত্মীয় সিধু—যিনি ঐ জায়গার সঙ্গে পরিচিত, তিনি বললেন, 'গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।' তারপর এ-বাগানে সে-বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির বাগানে গিয়ে পড়লেন। তাই মাস্টারমশাই দৈবক্রমেই সেখানে গিয়ে পড়েছেন, পরিকল্পনা করে নয়; সাধু দেখতে যে গেছেন, তাও নয়।

তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে মাস্টারমশাই দেখলেন, অপরের সঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন। সেই কথার এখানে উল্লেখমাত্র করেছেন। কথাগুলির সঙ্গে মাস্টারমশায়ের অন্তরের কোন যোগ তখনও হয়নি। তবে কথাগুলি তাঁর ভাল লেগেছে। মনে হয়, তখনও ঠাকুরের আকর্ষণ খুব প্রবলভাবে যে বোধ করেছেন, তা নয়। কারণ, বলছেন, 'একবার দেখি, কোথায় এসেছি, তারপর এখানে এসে ব'সব।'

বাগান দেখতে ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময়ে আরতির কাঁসর-ঘন্টা খোল-করতাল বেজে উঠল। তাই সব মন্দিরে আরতি দেখে আবার এলেন ঠাকুরের ঘরের সামনে। দেখলেন—ঘরের দরজা বন্ধ।

লৌকিক জ্ঞান ও ভগবদ্‌জ্ঞান

প্রথমে বৃন্দে ঝি'র সঙ্গে কথা। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?" বৃন্দে ঝি বলছে, "আর বাবা

বই-টই ! সব ওঁর মুখে !” বৃন্দে ঝি, তার তো পড়াশুনা কিছুই নেই, কিন্তু দেখেছে বড় বড় পণ্ডিতদের ঠাকুরের কাছে আসতে, অনেক সাধুকে সেখানে আসতে দেখেছে, বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট সাধকদেরও আসতে দেখেছে এবং তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা মন দিয়ে না শুনলেও এমনি শুনেছে এবং এইটুকু জানে যে, ঠাকুরের কথায় সকলেই মুগ্ধ। বই-টই যে ঠাকুর পড়েন না, তা জানে। কাজেই তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, ‘বই-টই সব ওঁর মুখে।’

মাস্টারমশায়ের কাছে এটা আশ্চর্য বলে মনে হ’ল, কারণ তাঁর ধারণা ছিল, আধ্যাত্মিক জীবনে অভিজ্ঞ হ’তে হ’লে, গ্রন্থাদি পড়া অপরিহার্য। জ্ঞানের ভাণ্ডার তা না হ’লে ভরবে কি দিয়ে ! সুতরাং ঠাকুর বই পড়েন না শুনে তিনি অবাক হলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা পরে দেখব একটি ভক্ত, মহিমাচরণ, যিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন, বলছেন, ‘অনেক খাটতে হয়, তবে ঈশ্বরলাভ হয় ; পড়তেই কত হয় ! অনন্ত শাস্ত্র !’ আর ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, ‘শাস্ত্র কত পড়বে ? বই প’ড়ে কি জানবে ? বই প’ড়ে ঠিক অনুভব হয় না।’

সাধারণ মানুষের মনে হয় যে, জ্ঞানলাভ করতে হ’লে অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়তে হবে। অনেক না পড়লে জ্ঞান হবে কি ক’রে ! লৌকিক জ্ঞানই মানুষ কিছু না পড়ে নিজে কতটুকু অর্জন করতে পারে, তার ঠিক নেই, আর এ তো লৌকিক জ্ঞান নয়—ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ! শাস্ত্রেই তা লেখা আছে, এবং সাধকদের অনুভূতির কথাও গ্রন্থে লেখা আছে, সে-সব বই না পড়লে সে-জ্ঞান হবে কি ক’রে ! সুতরাং ঈশ্বরলাভ করতে হ’লে অনেক বই পড়তে হয়—এই কথাই সাধারণের মনে হয়, যা মহিমাচরণ বলেছেন,—‘পড়তেই কত হয় !’

মহিমাচরণের বাড়িতে ঘরভর্তি বই ছিল। ঐ রকম ঘরভর্তি বই দেখার পর লোকে যদি শোনে যে এত সব বই পড়তে হয়, তা হ’লে

সেখানেই নমস্কার ক'রে চলে যাবে—ভাববে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরলাভ আর হবে না !

বৃন্দে ঝি'র সঙ্গে কথা হবার পর মাস্টারমশাই যখন ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন, ঘরে তখন আর কেউ নেই। তিনি ঠাকুরের ভাবটি লক্ষ্য করলেন। কি রকম ভাব ? না, ছিপেতে যখন মাছ এসে লাগে, ফাত্না নড়ে, তখন যে ব্যক্তি ছিপ নিয়ে বসে আছে, তার যে-রকম ভাব হয়, ঠাকুরের ভাব ঠিক সেই রকম।

মাস্টারমশাই খুব পর্যবেক্ষণ-শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। অদ্ভুত তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তি। কোনও জায়গায় গেলে প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে পারতেন। ভাসা-ভাসা উড়ো-উড়ো দেখা তাঁর ছিল না। আমরা দেখেছি, তিনি মঠে আসতেন যখন, ঘরে ঘরে যেতেন। আর তাঁর সঙ্গে অনুরাগী ভক্ত যাঁরা আসতেন, তাঁদের বলতেন : 'ত্যাখো, সব জিনিস দেখতে হয়। মঠ দেখা কি খালি জায়গাটা দেখা ? এসে সব দেখবে, সাধুদের সঙ্গে কথা বলবে, তাঁরা কিভাবে থাকেন দেখবে।' উনি দেখতেন ঘরে ঘরে ঢুকে। কারও বিছানার কাছে কিছু বই আছে। কি কি বই আছে তাও উল্টে দেখতেন। আমরা সম্ভবতঃ আর কাউকে এত খুঁটিয়ে দেখতে দেখিনি। বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সব দেখা—এ তাঁর বরাবরের অভ্যাস ছিল। তাই আমরা কথামৃতের ভিতর যখন বর্ণনা পাই, দেখতে পাই কত খুঁটিয়ে তিনি বর্ণনা করছেন।

ঠাকুরের স্বাভাবিক আত্মসংস্থ ভাব

ঠাকুরকে তিনি ঐরকম অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখলেন। তখনও এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। সেই পরিচয় পরে ক্রমশঃ খুব নিবিড়-ভাবে হবে। এখন শুধু দেখলেন ঠাকুর অন্যমনস্ক। সুতরাং ভাবলেন ঠাকুর হয়তো কথা বলতে চান না—সন্ধ্যা-বন্দনাদি করবেন। তাই

বললেন, 'আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।' ঠাকুর বললেন, 'না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়!' ঠাকুরের কথার ভাবটা কি, মাস্টারমশাই তখন বুঝলেন না। পরে বুঝবেন। ঠাকুর বোঝাবেন, সন্ধ্যা-বন্দনাদির কি প্রয়োজন, কতদিন তা করতে হয়, কখন তার প্রয়োজন আর থাকে না। এগুলি সব পরে শিখবেন। এখন দেখলেন ঠাকুরের অন্যমনস্ক ভাব—সকলের সামনে চোখ চেয়ে থেকেও তাঁর মন যেন বাহ্য কোন কিছুতেই নেই। উপমা দিলেন ঐ ছিপে মাছ ধরার মতো। যখন মাছ গেঁথেছে, তখন কি আর রক্ষে আছে! তখন কি আর যে মাছ ধরছে, তার মন অন্য কোন দিকে যায়? ঠাকুরের এখন কোনও দিকে দৃষ্টি নেই—চারে মাছ এসেছে, ছিপে মাছ গাঁথা হয়েছে, এ-রকম অবস্থা।

এই যে অন্যমনস্ক ভাব, এটি সাধনার পরিপক্ক অবস্থাতেই হয়। তার আগে হয় না। ঠাকুরের সন্তানদের, তাঁর সাক্ষাৎ পার্ষদদের কয়েকজনের সংস্রবে আসবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। লক্ষ্য করেছি যে, তাঁদেরও এইরকম একটা অদ্ভুত অন্যমনস্ক ভাব হ'ত, যা অন্য কোথাও আমরা দেখিনি। বড় বড় সাধুদের, নামকরা বিখ্যাত সাধুদের সম্পর্কে এসেছি অন্য জায়গায়। কিন্তু কোথাও এই রকম অবস্থা—জগৎটাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন, এইরকম অবস্থা দেখিনি। এটি সাধনার অনেক পরিপক্ক অবস্থা। আমি সমাধিস্থ অবস্থার কথা বলছি না, সেটা আরও অনেক দূরের কথা। এই যে মাঝে মাঝে যেন জগতের খেই থাকছে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে, জগৎটা যেন মনের উপর রেখাপাত করছে না, আছে জগৎটা, অস্পষ্ট অনুভবও হচ্ছে, কিন্তু মনের উপরে কোন দাগ কাটছে না, এই অবস্থার কথা বলছি। স্বামীজীর রচিত একটি গানে নির্বিকল্প সমাধির প্রাথমিক স্তর হিসাবে ঠিক এই অবস্থারই বর্ণনা আমরা পাই: 'ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর'—'অস্ফুট মন-আকাশে'

বিশ্বচরাচর ছায়ার মতো ভাসছে। ছায়ার মতো—অর্থাৎ তার যেন দেহ নেই, তার যেন বাস্তব সত্তা নেই। আর ছায়া ব'লে তার অস্তিত্ব যেন মনের উপর রেখাপাত করছে না। এ একটা অদ্ভুত অনুভূতি—যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ছায়ার মতো হয়ে যায়। এই অবস্থার মানুষ—'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ'—দেহে থেকেও যেন দেহে নেই। এটি সমাধি-অবস্থা নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সব কাজ যে বন্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। ইন্দ্রিয়াদির কাজ হচ্ছে, কিন্তু কাকে নিয়ে হচ্ছে তার ঠিক নেই। ইন্দ্রিয়াদি মনের কাছে বিষয় উপস্থাপিত করে। মন সেগুলি নিয়ে যিনি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, তাঁর কাছে হাজির করে। এখন তিনি যদি সেগুলি গ্রহণ না করেন, তা হ'লে ইন্দ্রিয়াদির কাজ করা আর না করা সমান। এ অবস্থায় একেবারে যে জগতের সঙ্গে সম্পর্কে নেই, তা নয়, আছে—কিন্তু জগৎটা ছায়ার মতো হয়ে গেছে।

ঠাকুরের এই অবস্থাটি মাস্টারমশাই দেখলেন। এটি আমাদের ভাববার জিনিস। কারণ, এই রকম অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। লৌকিক জীবনে আমরা জানি, কখনও কখনও কোন একটা বিষয়ে মানুষের মন নিবিষ্ট হ'লে সে অন্যমনস্ক হয়। কিন্তু সেখানে তার মনের অভিনিবেশ আছে এমন একটা জিনিসে, যা আমরা ধরতে বুঝতে পারি। যেমন একজনের কথা—তিনি আমাদের বলেছিলেন তিনি ব্যবসাতে নেমেছেন। তা ব্যবসাতে তখন মনটা এমন নিবিষ্ট যে, বাইরে ব্যবহার করছেন. কিন্তু সব ভাসা ভাসা। মনটা ব্যবসাতে—ব্যবসার সমস্যা নিয়ে একেবারে ব্যস্ত। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা ব'লে আমাদের সুখ হয় না, তোমার মন যে কোন্ দিকে থাকে! আমরা কথা বলি, আর তুমি কোন্ দিকে চেয়ে থাকো!' এ অন্যমনস্কতা, এটা আমরা বুঝি। জগতের কোন একটা বিষয়ে অভিনিবেশ হয়ে মনের যে ঐ রকমের বাইরের জিনিসকে গ্রহণ করবার অশক্তি, এটা মানুষের হয়।

কিন্তু এখানে? এখানে মনের বিষয়টি কি, যা তাকে এমনভাবে টেনে রেখেছে যে, বাইরের বস্তুকে অনুভব করতে দিচ্ছে না? সেই বিষয়টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। অভিনিবেশ আমরা বুঝি। অভিনিবেশ এতদূর হতে পারে যে, মানুষ বাইরের জগৎ সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যেতে পারে। এর একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আসছে। স্যার জে. সি. বোসের একজন ছাত্র আমাদের বলেছেন। তিনি নিজে তখন খুব কৃতবিদ্য হয়েছেন। সরকারি বড় কাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গেছেন জে সি. বোসের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর বাড়িতে তাঁর অবাধ প্রবেশ ছিল। শুনলেন, তিনি ছাতের উপরে আছেন। ছাতের উপরে টবে সব গাছ লাগানো আছে, সেখানে তিনি বসে আছেন। উনি গেছেন, সামনে দাঁড়িয়েছেন, স্যার জে. সি. বোসের কোন হুঁশ নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানমগ্ন ঋষির ধ্যানভঙ্গ করবার ইচ্ছে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ পরে তাঁর খেয়াল হ'ল,—'ও তুমি! কখন এসেছ?' "অনেকক্ষণ এসেছি।' 'আমায় ডাকলে না কেন?' আর উত্তর দিলেন না। এ-রকম অভিনিবেশ, আমরা বুঝি; তা গাছেই হোক, জগতের অন্য কোন রহস্যেই হোক বা সংসারী লোকের মন যাতে আকৃষ্ট হয়, সেই অর্থ-উপার্জনেই হোক। এ-সবের আকর্ষণ আমরা বুঝি। কিন্তু এখানে আকর্ষণের বিষয় আমরা জানি না। এখানে আকর্ষণের বিষয় সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। ঠাকুরের এই অবস্থার বর্ণনা 'কথামৃতে' আমরা আরও পাবো। এর নাম অর্ধবাহ্যদশা। মাস্টারমশাই এই অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুরকে দেখলেন, এবং তারপর ঠাকুরের সঙ্গে কথা-বার্তা যা হ'ল, তা অতি অল্প। বোধ হয় ঠাকুর তখন, তাঁর মনকে কথাবার্তা কওয়ার ভূমিতে নামাতে পারছেন না।

ঠাকুরের এই অবস্থা অনেক সময় হ'ত। মনের গতি এক এক সময় এমন হ'য়ে থাকত যে, এই জগতের বিষয়ে মন কিছুতেই নামতে পারত

না। একটা ঘটনার উল্লেখ করছি: ঠাকুর বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করতে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক যুবক-ভক্তের সমাগম হয়েছে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভূতি-প্রসঙ্গে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের কথা এসে প'ড়ল। স্থূল চোখে যা দেখা যায় না, এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস বা জীবাণু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, শুনে ঠাকুর ঐ যন্ত্র দিয়ে দু-একটি জিনিস দেখতে চাইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, যুবক-ভক্তদেরই এক বন্ধুর কাছে একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আছে। তিনি ডাক্তার —সবে মাত্র ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে ঐ যন্ত্রটি মেডিকেল কলেজ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি যন্ত্রটি নিয়ে এলেন এবং ঠিকঠাক ক'রে ঠাকুরকে দেখবার জন্য ডাকলেন। ঠাকুর উঠলেন, দেখতে গেলেন, কিন্তু না দেখেই ফিরে এলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞেস ক'রলে বললেন, 'মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই তাকে নামিয়ে নীচের দিকে দেখতে পারছি না।' অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে দেখতে হ'লে মনকে যে স্তরে নামাতে হবে, তিনি এখন আর সেই স্তরে মনকে নামাতে পারছেন না। মন তাঁর কিছুতেই নামল না, দেখাও হ'ল না।

এই রকম মন তাঁর। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি হ'ল ঊর্ধ্ব দিকে, জগৎ-অতীত তত্ত্বের দিকে। সেই মনকে জোর ক'রে নামিয়ে রাখতে হয়। কি প্রয়োজন? তাঁর নিজের কোন দরকার তো নেই। তবু তাকে নামিয়ে রাখেন কেন?—আমাদের জন্য। তিনি চান ইন্দ্রিয়াতীত যে আনন্দ, তার সন্ধান আমাদের দেবেন এবং সেই জন্য নিজে সমাধির আনন্দকেও উপেক্ষা করছেন। বলছেন, 'মা, আমায় বেহুঁশ করিস না। আমি এদের সঙ্গে কথা ব'লব।' কি প্রয়োজন তাঁর? আত্মানন্দে বিভোর তিনি। 'আত্মরতিঃ' 'আত্মতৃপ্তঃ' 'আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ' যিনি, তিনি আমাদের জন্য এত ব্যস্ত যে, মা'র কাছে প্রার্থনা করছেন, 'মা,

আমায় বেহুঁশ করিস না, আমি এদের সঙ্গে কথা ব'লব।' কথা তিনি বলেছেন। তাই আজ 'কথামৃত' পৃথিবীর সর্বত্র পরিবেশিত হচ্ছে। ঠাকুরের মনের সহজ যে গতি—অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের দিকে তাঁর মনের স্বাভাবিক যে গতি—তাকে যেন ধরে বেঁধে তিনি নামিয়ে আনছেন আমাদের জন্য। মুহুর্মুহুঃ সমাধি হচ্ছে। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন যে, সমাধি তাঁকে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না। যে সমাধির জন্য ঋষি-মুনিরা জন্ম-জন্মান্তর আরাধনা করে যাচ্ছেন, তপস্যা করে যাচ্ছেন, সেই সমাধি বার বার আসছে, তবু তিনি তাকে উপেক্ষা করছেন, বিরক্তিবোধ করছেন—'এ-রকম সমাধিমগ্ন হ'য়ে থাকলে আমার আসার সার্থকতা কি!'

গল্পের মাধ্যমে ঠাকুর বিষয়টি বুঝিয়েছেন : তিন বন্ধু মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে দেখল—উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা, তার ভিতর থেকে গান-বাজনার মধুর আওয়াজ আসছে। তাদের ইচ্ছে হ'ল ভিতরে কি হচ্ছে দেখবে। একজন কোন রকমে একটা মই যোগাড় ক'রে পাঁচিলের উপর উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হ'য়ে হাসতে হাসতে লাফিয়ে প'ড়ল ; কি যে ভিতরে দেখল, তা দু-জন বন্ধুকে বলতে পারল না। দ্বিতীয় বন্ধুও ঐ রকম দেখে নিজেকে সামলাতে পারল না। সেও হাসতে হাসতে ভিতরে লাফিয়ে প'ড়ল। তৃতীয় বন্ধুও ঐ মই বেয়ে উপরে উঠল আর ভিতরের আনন্দের মেলা দেখতে পেল। দেখে প্রথমে তার খুব ইচ্ছে হ'ল—সেও ঐ আনন্দে যোগ দেয়। কিন্তু পরেই ভাবল—আমি যদি ওতে যোগ দিই, তা হ'লে বাইরের দশজনে তো জানতেই পারবে না, এখানে এমন আনন্দের জায়গা আছে। একলা এই আনন্দটা ভোগ ক'রব? এই ভেবে সে জোর ক'রে নিজের মনকে ফিরিয়ে নীচে নেমে এল, আর যাকেই দেখতে পেল তাকেই বলতে লাগল—

ওহে এখানে এমন আনন্দের জায়গা রয়েছে—চল, চল ; সকলে মিলে ঐ আনন্দ ভোগ করি।

ঠাকুরের মানবপ্রেম

এই তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ঠাকুর নিজে—যিনি এসেছেন একলা আনন্দ ভোগ করবার জন্য নয়, সেই অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার সকলের কাছে উন্মুক্ত করবার জন্য, উজাড় ক'রে দেবার জন্য। কাজেই, তাঁর নিজের সমাধি-সুখকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতে হচ্ছে। এই জিনিসটি ঠাকুরের যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

লীলাপ্রসঙ্গের ভিতর ঠাকুরের জীবন বিশ্লেষণ ক'রে অনেক কথা আলোচনা করা হয়েছে। তার ভিতর একটি কথা এই যে, ঠাকুরের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁর নিজের জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্য; জগতের শিক্ষার জন্য। এটি বুঝতে হ'লে খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর জীবন অনুধাবন ক'রে দেখতে হয়। আমরা অত বুঝতে না পারলেও এইটুকু বুঝি যে, যিনি ইচ্ছা করলেই সমাধিতে ডুবে থাকতে পারতেন, তিনি আমাদের জন্য এইভাবে সমাধি-সুখকে উপেক্ষা করেছেন, জগন্মাতার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, 'আমাকে বেহুঁশ করছিস কেন, আমি এদের সঙ্গে কথা ব'লব।' তিনি জানেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিপুল অজ্ঞতা রয়েছে। এই সংসারে সাধারণ সুখ নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে আছি অথবা দুঃখে হাহাকার করছি। এই সুখদুঃখময় সংসারের পারে যাবার পথ দেখাবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল। শুধু নিজের প্রাণ নয়, তাঁর পার্ষদদেরও প্রাণ যাতে অনুরূপভাবে ব্যাকুল হয়, সেজন্য তাঁদের সেইভাবেই তৈরী করেছেন। নরেন্দ্রনাথ সমাধিতে ডুবে থাকতে চাইলে তাঁকে ভর্ৎসনা ক'রে বলছেন, 'ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! কোথায় একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার

লোক আশ্রয় পাবে, তা না হ'য়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিস নি।'

শ্রীশ্রীমাকেও ঠাকুর বলেছিলেন, 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'

তাঁর জীবন সমর্পিত হয়েছে আমাদের জন্য এবং তাঁর যাঁরা সাঙ্গোপাঙ্গ, যাঁরা তাঁর লীলাসহায়ক হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি 'জগদ্ধিতায়' উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, বলেছেন, 'তোমার জীবনের যে আনন্দ, সেই অসীম আধ্যাত্মিক আনন্দ শুধু নিজে ভোগ করার জন্য তুমি জগতে আসনি। এসেছ এই জগৎকে সেই আনন্দের সন্ধান দেবার জন্য।' এই হ'ল ঠাকুরের জীবনের মূল কথা। তিনি তাঁর নিজের জন্য কিছু করছেন না—করছেন জগতের সকলের জন্য। এবং সেই করাটা কি? না, মানুষকে সমস্ত দুঃখকষ্টের পারে নিয়ে যাওয়া, তার অজ্ঞাত যে আনন্দ সেই আনন্দের সন্ধান দেওয়া, শুধু সন্ধান দেওয়া নয়, হাত ধ'রে তাকে ..থানে পৌঁছে দেওয়া। বলছেন, 'যা করবার আমি করেছি, তোমাদের আর বেশী কিছু করতে হবে না, এই আলো দেখে চলে এসো।' বলছেন, 'বাড়া ভাতে বসে যা, রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে।' পাকা গিন্নির মতো রান্না ক'রে তৈরী ক'রে রেখে দিয়েছেন; বাড়া আছে সব। আমাদের শুধু খেতে বসতে হবে—খেতে হবে; আগুন জ্বালা আছে, শুধু পোয়াতে হবে। যার যা প্রয়োজন সমস্ত নিজে যেন আগে থেকে ক'রে রেখে দিয়েছেন। আর আহ্বান করছেন, 'তোমরা এসো, এসে এই আনন্দ উপভোগ করো।' ঐ তিন বন্ধুর তৃতীয় বন্ধুর মতো! এবং শুধু ডাকছেন না, পথ দেখাচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, শক্তি সঞ্চার করছেন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন নিজের হাতে অপসারিত করছেন পথ থেকে। এ সব করছেন শুধু দুচারটির জন্য নয়, তাঁর পার্ষদ যে-কজন সামনে ছিলেন, শুধু তাঁদের জন্য নয়, সকলেরই জন্য। আগেই বলেছি, পার্ষদদের তৈরি

করছেন এমনভাবে যাতে তাঁরা তাঁর এই যে ব্রত (mission), তাঁর জীবনের এই যে উদ্দেশ্য, তা সফল করতে সহায় হন।

তিনি কাজ করছেন, তাঁর স্থূল দেহ থাকতে যতটুকু দেখা গেছে, তার চেয়ে শত সহস্র লক্ষ গুণ বেশী এখন। অশরীরিরূপে তিনি সমস্ত জগতে যে কাজ করছেন, তার প্রভাব আমরা আভাসে মাত্র পাচ্ছি এখন। স্বামীজী বলেছেন, যা কালে পরিণত হবে, তার আভাসমাত্র আমরা পাচ্ছি, পুরো চিত্রটি আমাদের সামনে নেই। ক্রমশঃ যেন সেটি পরিস্ফুট হচ্ছে এবং তার এই ক্রমশঃ পরিস্ফুটনের আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি, আর ভাবছি, কালে না জানি কি হবে!

দুই

কথামৃত ১।১।২-৩

আবার এসো

মাস্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কথামৃতে' যিনি শ্রীম ব'লে পরিচিত, ঠাকুরকে প্রথম দর্শনের পর বিদায় নেবার কালে ঠাকুর বললেন, 'আবার এসো'। এখনো ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের নিবিড় পরিচয় হয়নি। কিন্তু প্রথম দর্শনের পর থেকেই মাস্টারমশায়ের মনে হচ্ছে যে, পোশাক পরিচ্ছদ সাধারণের মতো হলেও এঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ব্যবহারের ভিতর দিয়ে অসাধারণত্ব ফুটে বেরোচ্ছে।

এঁর সম্বন্ধেই বৃন্দে ঝি বলেছিল, "আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে!" মাস্টারমশাই তাই ভাবছেন—লেখাপড়া ছাড়া এ-রকম জ্ঞান হয় কি ক'রে?

আর একটি কথা ; কথাটি খুব ছোট্ট হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাস্টারমশাই বলছেন "কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে।" এই যে আকর্ষণ মাস্টারমশাই বোধ করছেন—এই অজ্ঞাত আকর্ষণের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় নেই।

এই যে আকর্ষণ, যার পরিচয় আমরা 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মধ্যে পাই, তা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত অনেকেই অনুভব করেছেন। সে দুর্বার আকর্ষণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ঠিক এইরকম এক আকর্ষণ অনুভব করছেন মাস্টারমশাই। তাই বলছেন, "ইনিও বলিয়াছেন 'আবার এসো'! কাল কি পরশু সকালে আসিব।" অবশ্য যদি "এসো" নাও বলতেন, তা হলেও মাস্টারমশাইকে আসতেই হ'ত—এমনই দুর্বার সে আকর্ষণ। [১।১।২ সমাপ্ত]

তার পরের দিনের কথা। মাস্টারমশায়ের ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন। সময়, সকাল আটটা। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। তবু মাস্টারমশাইকে দেখে বললেন, "তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বোসো।" ঠাকুর কামাতে যাচ্ছেন আর সেখানে মাস্টারমশায়ের মতো প্রায় অপরিচিত একজন ব'সে থাকবেন, এটা শিষ্ট সমাজে যেন কিছুটা রুচিবহির্ভূত দেখায়। কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে ওরূপ কোন লৌকিকতা নেই। তিনি কামাতে কামাতেই মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

মাস্টারমশাই ঠাকুরের পোশাকের বর্ণনা দিচ্ছেন—'গায়ে মোলস্কিনের র‍্যাপার······পায়ে চটি জুতা।' 'মোলস্কিন' একধরনের গরম কাপড়। বেলুড় মঠে থাকার সময় এর এক টুকরো আমাদের দেখানো হয়েছিল।

ঠাকুর সহাস্যবদন। কথা বলবার সময় কেবল একটু তোতলা। যাঁরা ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা বলতেন যে এই 'একটু তোতলা' মানে কথা একটু আটকায় বটে, তবে তাতে কথাগুলি আরও মিষ্টি লাগে। মাস্টারমশাইকে দেখে ঠাকুর তাঁর বাড়ি কোথায়,

দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে কোথায় উঠেছেন জেনে নিয়ে প্রশ্ন করছেন, 'হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে?'

কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ

কেশবের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের যে পরিচয় আছে, তা ঠাকুরের জানার কথা নয়। তবে এটা হ'তে পারে যে তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজের কেউ কেশবকে জানত না—এ একরকম অসম্ভব ছিল। কেশবের অসাধারণ বাগ্মিতা, তাঁর নতুন ধর্মমত আর সেই ধর্মমতের সপক্ষে তাঁর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা—এই সবকিছু তখনকার নব্য শিক্ষিত সমাজের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঠাকুর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন মাস্টারমশায়ের অন্তরটা, ঠিক যেন কাঁচের মধ্য দিয়ে আলমারির ভিতরের সবকিছু দেখা যায়, সেইভাবে। কাজেই ঠাকুর বুঝেছিলেন যে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কেশবের জানাশুনা আছে।

পরে আমরা পরিচয় পাবো, ঠাকুর ও কেশব পরস্পর পরস্পরকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন। ঠাকুর কেশবকে অতিশয় স্নেহ করতেন, কেশবও ঠাকুরকে অসাধারণ ভক্তি করতেন—নিজেদের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও।

ঠাকুর মূর্তিপূজা করতেন, আর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আন্দোলন। সনাতন ধর্মের সব অনুশাসনই ঠাকুর মানতেন, সেগুলি কাটছাঁট করে মানাই ছিল ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম। কিন্তু সমস্ত মতপার্থক্যকে অতিক্রম ক'রে ঠাকুর ও কেশব পরস্পর পরস্পরের প্রতি ছিলেন অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট।

যে-ঠাকুর কোনদিন কোন পার্থিব বস্তুর জন্য মার কাছে প্রার্থনা জানান-নি, সেই ঠাকুরই আবার কেশবের অসুখের সময় মার কাছে

ডাব-চিনি মেনেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে আমরা তখন বুঝতে পারতাম না যোগসূত্রটা কোন্‌খানে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যে-উদ্দেশ্যে ঠাকুরের আসা কেশব ছিলেন তার সহায়। আমরা পরে দেখতে পাই, কেশবের মাধ্যমেই ঠাকুর তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। এমন কি অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিষ্যদের অনেকেরই ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় এই মাধ্যমেই।

অবশ্য ঐ সমাজের অনেকেই ঠাকুরের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠতা খুব ভাল চোখে দেখেননি। এমন কি নরেন্দ্রনাথের সন্ধানে ঠাকুর একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হয়ে যখন সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, তখন ঐ সমাজের কেউ কেউ আলো নিভিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

আমরা এখন এইসব কথা বলছি, ইতিহাসে ঘটনা যেমন ঘটেছিল, সেই দৃষ্টি থেকে ; কোন সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে নয়। অবশ্য কটাক্ষ করার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না, স্বয়ং ঠাকুর যেখানে 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' ব'লে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছেন। এমনকি নরেন্দ্রনাথের নিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে প্রণাম করেছেন এই ব'লে যে 'যেখানে ভগবানের কথা হয়, সে জায়গা অতি পবিত্র'। যাই হোক যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঠাকুরের এই সম্পর্ক, সেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের যে সম্বন্ধ আছে, সেটা হয় ঠাকুর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন অথবা লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে ধরে নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সন্ন্যাসী ও গৃহীর আদর্শ

এর পর প্রতাপের ভাইএর কথা উঠল। তিনি ঠাকুরের কাছে থাকতে চাইলে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার ক'রে স্ত্রীপুত্রের

দায়িত্ব পালন করতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকম প্রতাপ হাজরাকেও ঠাকুর ভর্ৎসনা করেছিলেন মা ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্তব্যের অবহেলার জন্য। এ-প্রসঙ্গে অনেকে ঠিক বুঝতে পারেন না—যে-ঠাকুর 'ত্যাগের মূর্তিমান বিগ্রহ', যিনি তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের সংসারের হাওয়া থেকে দূরে থাকতে বারবার উপদেশ দিচ্ছেন, তিনিই আবার কি ক'রে কোন কোন সংসার-ত্যাগেচ্ছু ভক্তকে ভর্ৎসনা করছেন। এ-সম্বন্ধে কোন কোন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—যারা সংসার ক'রে ফেলেছে, তাদের সংসারের কর্তব্যে অবহেলা করা উচিত নয়। তারা ত্যাগ করবে মনে। কিন্তু যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা ত্যাগ করবেন অন্তরে বাহিরে।

এখানে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, এই মনে ত্যাগ করতে ব'লে ঠাকুর বোধ হয় তাঁর আদর্শকে ফিকে (dilute) ক'রে ফেললেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা মোটেই নয়।

কারণ ঠাকুরের আসা কেবলমাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় ত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য নয়। আচার্য তিনি, জগৎগুরু তিনি। তাঁর উপদেশ সকলের জন্য উপযোগী হওয়া দরকার। যে যে অবস্থায় আছে, তাকে সেই অবস্থা থেকেই চরম লক্ষ্যে যাবার সন্ধান দিতে হবে। তবেই না তিনি ঈশ্বরাবতার, জীবের কল্যাণের জন্য তবেই না তাঁর দেহধারণ। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ—সকলেরই আদর্শ তিনি, তাঁর মধ্যে সকলেই দেখতে পান নিজের নিজের আদর্শের প্রতিফলন।

কাজেই একদিকে যখন তিনি সংসার স্বীকার করছেন, মায়ের সেবা করেছেন, পত্নীকে সহধর্মিণীরূপে কাছে রেখেছেন, তখনও তিনি সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি। একাধারে এই যে গৃহস্থ ও ত্যাগীর আদর্শ, এটিই ঠাকুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপনিষদ্ বলেছেন "ত্যাগেনৈকে

অমৃতত্বমানশুঃ” —ত্যাগের দ্বারা কেউ কেউ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। স্বামীজী এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বলছেন : “ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ” একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। অন্য উপায়ে নয়। তা হ'লে মনে হ'তে পারে তো—একমাত্র সন্ন্যাসীদেরই অমৃতত্বে অধিকার। ঠাকুর বলছেন “তা কেন ?” দেখতে হবে আসল ‘ত্যাগ’ কোন্‌টা। আসল ত্যাগ হ'ল মনের ত্যাগ, অন্তরের ত্যাগ। সেটা যদি কেউ করতে পারে, তবেই প্রকৃত ত্যাগ হ'ল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সন্ন্যাসীদেরও তো তা হ'লে মনের ত্যাগ হলেই চলে ; তা হলে তাদের আবার বাইরের ত্যাগ কেন ?

এখানে ভুললে চলবে না যে, সন্ন্যাসীর জীবন হচ্ছে আদর্শস্বরূপ—তাই তার অন্তরে ত্যাগ, বাইরে ত্যাগ। তবে গৃহস্থের জন্য এই বিধান দিচ্ছেন না কেন ঠাকুর ? কারণ, সে যে-আশ্রমে আছে (যথা গৃহস্থাশ্রমে) সেই আশ্রমে ‘মনে ত্যাগ’ই আদর্শ ; এটাই তার অনুসরণযোগ্য পথ। এ-কথা ভুলে গিয়ে যদি আমরা আশ্রম-নির্বিশেষে সকলে সন্ন্যাসের আদর্শকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি, তা হ'লে তার কি পরিণাম হ'তে পারে, বৌদ্ধধর্ম তা দেখিয়ে দিয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের দোষ

বৌদ্ধধর্মে সকলের জন্যই সংসার ত্যাগের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছিল যে, সবার মনে হ'ল যে সন্ন্যাস ছাড়া পথ নেই। ফলে নির্বিচারে হাজারে হাজারে সব সন্ন্যাসী হ'ল। আর তার পরিণাম যে কি হ'ল ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রকৃতি-অনুযায়ী যারা সন্ন্যাসের অধিকারী নয়, তারাও পরস্পরের দেখাদেখি ঐ পথের অনুসরণ করতে গিয়ে আদর্শকে ক'রল বিকৃত, অধঃপাতিত। তাই ঠাকুর সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, স্বামীজীও সাবধান ক'রে

দিচ্ছেন যে অধিকারী-নির্বিশেষে সন্ন্যাস আমাদের আদর্শ নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে সন্ন্যাসীর যেমন স্থান আছে, গৃহস্থেরও তেমনি স্থান আছে।

সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ-প্রসঙ্গে কর্মযোগের একটি অধ্যায়ে আলোচনা ক'রে স্বামীজী বলেন যে, মানুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে তার চরমলক্ষ্যে পৌঁছয়, তখন পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্যটি ভিন্ন নয়। 'লক্ষ্য একই, একই জায়গায় উভয়েই পৌঁছয়, কেবল চলবার সময় তাদের পথটা ভিন্ন ভিন্ন দেখায়।

সংসারীর কর্তব্য

একবার স্বামী সারদানন্দজীর কাছে একজন এসে বললেন, তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত, শুনছি।

স্বামী সারদানন্দ বললেন, "বাপু, তুমি তো সংসার ত্যাগ করবে। আমি কিন্তু এখনো পারিনি। দেখ না কতগুলি জড়িয়েছি। এক সময় এক-কাপড়ে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছি, শীতের জায়গাতেও এক কাপড়। এখন দেখ না কতগুলো জড়াচ্ছি। ত্যাগটা কোথায় হ'ল?" তখন শীতকাল, তাই গায়ে কতকগুলো জামা-কাপড় ছিল। তার উপর বাতের অসুখের জন্য তিনি একটু বেশী গরম কাপড় ব্যবহার করতেন।

ভাব এই যে—যতদিন শরীর আছে, ততদিন শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য তার কতকগুলো চাহিদা মেটাতে হয়। তাই শরীরের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। তেমনি কর্তব্য আছে আত্মীয়স্বজনের উপর, দেশের উপর, জগতের উপর। এতগুলি কর্তব্য থাকতে আমরা যে সব ত্যাগ ক'রব বলছি, এটা কি এতই সোজা ব্যাপার? তা হ'লে কর্তব্যের এই বন্ধন থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই? ঠাকুর তারও উত্তর দিয়েছেন, বলেছেন রেহাই আছে যদি কেউ পাগল হয়, তা হ'লে কোন আইন তার উপরে চলে না। গীতায় ভগবান বলেছেন:

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তার কোন কর্তব্য নেই। যতক্ষণ আমি একটি ব্যক্তি, আমি সমাজের একটি একক, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তব্যের হাত থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই। যদি আমি সম্পূর্ণরূপে আমার ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলতে পারি, তা হ'লে আমার আর কোন কর্তব্য নেই।

সন্ন্যাসীরা সবাই কি তাঁদের 'আমি' মুছে ফেলতে পেরেছেন? তা যতক্ষণ না পারছেন, ততক্ষণ তাঁরাও কর্তব্য থেকে মুক্ত নন। কে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে, আমার 'আমি'-কে নিশ্চিহ্ন করেছি।

এটা একটা স্ববিরোধী কথা, যেটা আমার কথার দ্বারাই ব্যাহত হচ্ছে; সুতরাং কর্তব্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। যে কর্তব্যকে সে স্বীকার করেছে বা যে কর্তব্য তার উপর আরোপিত হয়েছে, তা তাকে পালন করতে হবে, নিখুঁতভাবে—নির্লিপ্তভাবে। আর যে যত নিখুঁত-ভাবে ও নির্লিপ্তভাবে তা করতে পারবে, সে তত শীঘ্র এই বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে। ঠাকুরের এই শেষের কথাটি হ'ল প্রতাপের ভাইএর প্রসঙ্গে। এই কথাটির চরম নিকর্ষ হ'ল: কর্তব্যকে অস্বীকার করা চলবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ আমাদের 'আমি' একেবারে লুপ্ত হয়ে না যাচ্ছে। তাই যখন কেউ ভগবানের জন্য পাগল হয়, তার উপর কোন আইন চলে না।

এই অধ্যায় পরিসমাপ্তির সময় আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতাপের ভাইয়ের মতো হ'লে চলবে না, কেননা সে পলাতক, সে কর্তব্যকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই ঠাকুর বলছেন যে "সব 'তাঁর'—এই বুদ্ধিতে কর; সংসারের ভিতর তাঁকে দেখতে চেষ্টা কর; তাঁর সংসার—এটা ভাববার চেষ্টা কর।" তা যদি না পারো তো বড়-

লোকের বাড়ীর দাসীর মতো আমাদের ভাবতে হবে যে, তিনিই আমাকে রেখেছেন এই সব দায়িত্ব দিয়ে। এ সব তাঁরই দেওয়া, এই মনে ক'রে এগুলো বহন করতে হবে।

"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"

—নিজে এইসব কর্ম ক'রে, আমার কর্তব্য ক'রে আমি সিদ্ধিলাভ ক'রব তাঁর কৃপায়, কারণ এগুলির দ্বারা তাঁরই অর্চনা করা হয়।

"যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥"

হে শম্ভু, আমি যা কিছুই করি, সবই তোমার পূজা, তোমার আরাধনা।

তিন

কথামৃত—১।১।৪

ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের প্রথম আলাপের দিনে কথাবার্তা বেশী হয় নি। এবার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ঠাকুর যেন মাস্টারমশায়ের সম্বন্ধে নিজে একটু ভাল ক'রে তলিয়ে দেখতে চাইছেন। মাস্টারমশায়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এমনকি ছেলেও হয়ে গেছে, শুনে ঠাকুর রামলালকে বলছেন, "যাঃ বিয়ে ক'রে ফেলেছে ; যাঃ ছেলে হয়ে গেছে।" কথার ভিতর একটু যেন আক্ষেপের ভাব লক্ষ্য করলেন মাস্টারমশাই। তাই তিনি একটু অপ্রস্তুত বোধ করছেন। কথামৃতের ভিতর আমরা দেখতে পাব—ঠাকুর সকলকে এ-সব প্রশ্ন করতেন না।

এ-রকম প্রশ্ন করতেন কেবল তাঁদের, যাঁদের তাঁর নিজের অন্তরঙ্গ বলে বোধ হ'ত। মাস্টারমশাইকে দেখে প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, এক

বিশেষ কাজের যন্ত্ররূপে তাঁকে তিনি ব্যবহার করবেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন, যন্ত্রটি যেন নিখুঁত হয়। মাস্টারমশাই বিয়ে ক'রে ফেলেছেন, তাঁর সন্তানাদিও হয়েছে—তাই সংসারের কর্তব্যের বোঝা রয়েছে তাঁর মাথায়। এই অবস্থায় তাঁর স্বতন্ত্রতা অনেকাংশে খর্ব হয়েছে। তাই 'বিয়ে হয়েছে' শুনে তাঁর এই খেদোক্তি। এমন নয় যে সংসারে থেকে কারও ধর্মজীবন লাভ হয় না; যার হয় হোক, কিন্তু মাস্টারমশাইকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের হাতের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চাইছিলেন; খানিকটা তাঁর, আর খানিকটা সংসারের—এ-রকমভাবে নয়। ঠাকুরের কথা থেকে এই রকমই মনে হয়। অবশ্য পরে যখন মাস্টারমশাই সংসার থেকে সরে আসতে চাইছেন, ঠাকুর তখন তাঁকে বারণ করছেন। আমরা দেখেছি, ঠাকুর এ সম্বন্ধে অনেককে উপদেশ দিচ্ছেন যে সংসারের দায়িত্ব যদি মাথায় এসে পড়ে, তা হ'লে তা থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ তা আসেনি, ততক্ষণ বিচার কর; নিজের প্রকৃতি যাচাই কর, দেখ কোন্ পথে তোমার সুবিধা। বিচার না ক'রে সংসারের বন্ধনে জড়ানো যেমন ঠাকুর পছন্দ করতেন না, তেমনি পছন্দ করতেন না—বিচার ক'রে সংসারে প্রবেশ করার পর তা থেকে পালানো। তাই হাজরাকে জোর ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন; নরেন্দ্রনাথ হাজরার হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করছেন এবং বাড়ি ফিরে যাবার জন্য হাজরার ওপর জোর না করতে তাঁকে অনুরোধ করছেন। তবুও ঠাকুর শুনছেন না। সংসার যখন রয়েছে, তখন সে কর্তব্যে অবহেলা করা চলবে না। আবার সেই ঠাকুরই তাঁর ত্যাগী-সন্তানরূপে যাঁদের তৈরী করবেন, তাঁদের কারও বিয়ে করার কথা শুনে মাথায় লাঠির ঘা পড়ার মতো বোধ করছেন।

যাদের তিনি নিজের হাতের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করবেন, তাদের নিখুঁত হওয়া চাই, পরিপূর্ণরূপে তাঁর হওয়া চাই। সেখানে ভাগাভাগি হ'লে যন্ত্রটি নিখুঁত হয় না।

শ্রীম-এর শিক্ষা শুরু

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? 'বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?' বিদ্যাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি'— এ-সব কথা মাস্টারমশাই কোনদিন শোনেননি। 'বিদ্যা' কথাটার মানে তিনি জানেন বইপড়া, আর সেই থেকেই ধরে নিলেন যে ঠাকুর জানতে চাইছেন, তাঁর স্ত্রী লেখাপড়া জানেন কি না? সাধারণভাবে 'জ্ঞানী' বলতে আমরা বুঝি যিনি অনেক লেখাপড়া করেছেন আর সেই সূত্রেই যাঁরা লেখাপড়া জানেন না তাঁদের অজ্ঞান' বলি।

এই ভেবেই মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।" ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, "আর তুমি জ্ঞানী?" ঠাকুরের কাছে মাস্টারমশাই জ্ঞান-অজ্ঞানের নতুন অর্থ শিখলেন; শিখলেন ভগবানকে জানার নামই 'জ্ঞান', আর তাঁকে না জানার নাম 'অজ্ঞান'। ঠাকুরের কাছে মাস্টারমশায়ের পাঠের এই হ'ল শুরু।

মাস্টারমশায়ের অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্য ঠাকুর যেন ইচ্ছাকৃতভাবে শ্লেষাত্মক শব্দ প্রয়োগ করলেন। কেন-না যতক্ষণ মানুষের মধ্যে অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ তার মধ্যে কোন উপদেশ কার্যকর হয় না। তার মনে হয় "আমি আবার উপদেশ নেব কি? আমি কি কম জানি?" মাস্টারমশাই তখনকার দিনে ছিলেন উচ্চশিক্ষিত; ছেলেদের শেখানোই ছিল তাঁর কাজ। এ হেন মাস্টারমশাইকে যে এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় শিক্ষার্থিরূপে বসতে হবে, এ-কথা তিনি তখনও ভাবতেই পারেননি। ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল—মাস্টারমশায়ের অহঙ্কার চূর্ণ করা। তাই তাঁর শ্লেষাত্মক প্রশ্ন "আর তুমি জ্ঞানী?" কথাটি মাস্টারমশায়ের অহমিকায় দারুণ আঘাত হানল।

ঈশ্বর—সাকার ও নিরাকার

এরপর এল ঠাকুরের এক মারাত্মক প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে?"

আপাতদৃষ্টিতে এ-রকম প্রশ্ন করার কারণ বোঝা হয়তো একটু কঠিন হবে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ঠাকুরের এই রকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। তখনকার দিনে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মচিন্তাধারার প্রবল প্রভাব। আর সেই সমাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৌত্তলিকতা ছিল চূড়ান্ত অজ্ঞানের লক্ষণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ঠাকুরের এ-রকম প্রশ্ন করার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রশ্ন শুনে মাস্টারমশাই ভাবছেন যে সাকার আর নিরাকার দুইই কি সত্য হ'তে পারে? যদি কারো নিরাকারে বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে কি তার আর সাকারে বিশ্বাস হ'তে পারে? মাস্টারমশায়ের নিরাকারে বিশ্বাস, এ-কথা শুনে ঠাকুর বললেন, "তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে, —এইটিই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য।" ঠাকুর বারবার এই কথা বলেছেন যে ভগবানের ভাবের ইতি করা যায় না, তাঁর অনন্ত ভাব। তিনি এই পর্যন্ত হ'তে পারেন, এর বেশী নয়—এ-কথা যেন আমরা কল্পনা না করি। বরং নাস্তিক হওয়া ভাল, কিন্তু ঐ রকম 'মতুয়ার বুদ্ধি' ভাল নয়। যে নাস্তিক তার হয়তো কোন সময় আস্তিক্য-বুদ্ধি আসবে, কিন্তু একদেশী ভাব কাটানো শক্ত। ঠাকুরের প্রথম উপদেশ এখানেই আরম্ভ হ'ল—মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথাবার্তার আদি পর্বে। কিন্তু ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার—ঠাকুরের এই কথাতেই হ'ল মাস্টারমশায়ের সমস্যা। মাস্টারমশাই তর্কশাস্ত্র পড়েছেন, তর্কশাস্ত্রে এই কথাই বলে যে 'সাকার' আর 'নিরাকার' পরস্পর বিপরীত। এখন

এই দুই বিপরীত ধর্ম এক অধিকরণে থাকতে পারে না। তাই ঠাকুরের এই কথায় মাস্টারমশাই একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন "সাদা জিনিস দুধ কি আবার কালো হ'তে পারে?"

যদি জিনিসটাকে 'সাদা' বলি, তা হ'লে তা 'কালো' হ'তে পারে না—এ কথাটা পরিষ্কার। কিন্তু তাতে যদি আমরা কালি মিশিয়ে দিই? দুধের সঙ্গে কালি মিশিয়ে কালো করতে পারি না কি? পারি। কিন্তু তা হ'লে দাঁড়াল এই যে, সেই কালো রঙটা তার স্বাভাবিক রঙ নয়; অর্থাৎ সেটা তার ধর্ম নয়। অন্য ধর্ম তার সঙ্গে মিশে আছে। দার্শনিকদের তর্কের অবকাশ এইখানে যে, ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তা হ'লে সাকার ভাব তাঁতে আরোপিত, সুতরাং মিথ্যা। আর যদি ঈশ্বর সাকার হন, তা হ'লে নিরাকার ভাব মিথ্যা। এই নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন শাস্ত্র লেখা হয়েছে, তবু আজ পর্যন্ত দার্শনিক মহলে এর মীমাংসা হ'ল না। আর যদি অতীত দেখে ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে হয়, তা হ'লে বলা চলে যে এর সমাধান কোন দিনই হবে না। কারণ মানুষের বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুদ্ধির অতীত যে তত্ত্ব, তা বুঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব! "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"—যে জিনিস চিন্তার অতীত, তাকে কখনো তর্কের সাহায্যে বুঝতে চেও না। এ-কথা বলছেন কারা? যাঁরা তর্ক নিয়ে চরম গবেষণা করেছেন, তর্কের দ্বারা যতদূর দেখবার দেখেছেন। সব দেখে শুনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তর্ক দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেও না; বুঝতে পারবেও না।

ঈশ্বরতত্ত্ব–তর্কাতীত

শ্রুতি বারবার এই কথা বলেছেন, মানুষের মন ততদূর অবধি ক্রিয়াশীল হ'তে পারে, যতদূর তার সাধারণ জ্ঞানের গোচর। যেমন আমি দ্রষ্টা, আমি যা দেখছি, যা অনুভব করছি—সেটি আমার দৃশ্য বস্তু। এই

দৃশ্যের ভিতরে নানা রকমের বৈচিত্র্য আছে। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র এই বৈচিত্র্যের ভিতরে কাজ করে। শুধু ন্যায়শাস্ত্র কেন, বিজ্ঞানের দ্বারা যতদূর আমরা এগোতে পারি, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, তা সবই আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জ্ঞান, তাকে ভিত্তি ক'রে। আর এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকেই আধার ক'রে আমরা সমস্ত বিজ্ঞানের গবেষণা করি। হয়তো আমরা এমন কিছু জিনিস আবিষ্কার করি, যা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পারি না বা কান দিয়ে শুনতে পারি না। কিন্তু সাক্ষাৎ না হলেও পরোক্ষভাবে সেগুলি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় হওয়া চাই। তা না হ'লে বিজ্ঞান তা স্বীকার করবে না। ঠিক এই রকম পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভগবানকে পর্যন্ত বুঝতে চাই। বুঝতে চাই বলে আমরা কল্পনা করি ভগবানকে ; চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তর্কের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করি। যেমন, এই জগৎটা সৃষ্টি হয়েছে, অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, আর ভগবান সেই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু জগৎটা যে সৃষ্টি হয়েছে, কে আমাকে বলে দিয়েছে ?—বলে দিয়েছে আর কেউ নয়, আমারই অনুভব যে, যা কিছু সম্মিলিত হয়ে উৎপন্ন হয়, তাকে উৎপাদিত করবার বা উপাদানগুলির সম্মেলন ঘটাবার কোন একটি শক্তি থাকা দরকার। সেই শক্তিকে আমরা "ঈশ্বর" বলছি। সেই শক্তি, সেই ঈশ্বর পরমাণুগুলিকে বা তার থেকেও সূক্ষ্ম যদি কিছু বস্তু থাকে, তাকে বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন প্রণালীতে সম্মিলিত ক'রে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন—এইটুকু আমরা কল্পনা করতে পারি। এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কিছু নেই। সংসার মহীরুহ। ন্যায়শাস্ত্র বলেছেন, সংসার-মহীরুহের বীজ সেই তিনি যাঁর থেকে এই জগৎটা উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা এই বীজের স্বরূপ সম্বন্ধে কি কিছু জানা যায় ? সে-স্বরূপ সম্বন্ধে কত রকমের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। পরস্পরবিরোধী এইসব সিদ্ধান্ত কখনই সত্য হ'তে পারে না। এর যে-কোন একটির সত্যতা

সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই যুক্তিতর্কের এলাকায় ধর্ম সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান কোথায়? ভগবান সম্বন্ধে তো দূরের কথা, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই নিশ্চিত জ্ঞান আমাদের নেই। 'আমি' বলতে যে কি বোঝায়, তা-ই আমরা জানি না। এ-বিষয়েও তর্ক কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারে না, কাজেই ভগবান সম্বন্ধে যে আসতে পারবে না, এ আর বেশী কথা কি? তবে কি আমরা বিচার ক'রব না? অধিকারিভেদে কাকেও কাকেও ঠাকুর বলছেন বিচার করার কথা, আবার কাকেও বিচার করতে বারণ করছেন। মাস্টারমশাইকে "তিন সত্যি" করিয়ে নিয়ে বলছেন, "বলো, আর বিচার ক'রব না।" কারণ ঠাকুর চাইতেন যে মাস্টারমশাই তাঁর ভাব কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন না ক'রে পরিবেশন করুন। তাই মাস্টারমশায়ের জন্য কাজ—নির্বিচারে গ্রহণ ও ঠিক সেইভাবে বিনা ব্যাখ্যায় সেই ভাব পরিবেশন। ঠিক সেই রকম তারক যখন একবার তাঁর কথা লিখে রাখছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে ওই কাজ থেকে নিবৃত্ত ক'রে বলেছিলেন যে, "ওরে ও কাজ তোর জন্য নয়।" যার জন্য যে কাজ নির্দিষ্ট, তাকে সেই কাজের উপযোগী ক'রে তৈরী করছেন তিনি। তাই মাস্টারমশাইকে বিনা বিচারে অবিকৃত-ভাবে তাঁর ভাব পরিবেশন করতে বলছেন, না হ'লে মাস্টারমশায়ের মধ্যে সুপ্তভাবে যে তর্ক করার মনোবৃত্তি লুকিয়ে আছে, তা তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রে দেবে। মাস্টারমশায়ের অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে হবে এবং তা করতে হবে গোড়া থেকেই। এটি একটি কথা। আর একটি কথা এই যে, মানুষের কাছে পরস্পর-বিরোধী ভাবের একত্র সমাবেশ অসম্ভব ব'লে মনে হলেও ঈশ্বরের কাছে তা মোটেই অসম্ভব নয়। সেইজন্য লাল জবাফুলের গাছের একটি ডাল ভেঙে ঠাকুর যখন তাতে লাল ও সাদা দু-রকমের ফুল দেখালেন, মথুরবাবু স্বীকার করলেন যে যিনি এই নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছে করলে সব নিয়মের বাইরে যেতে পারেন—

যে কোন সময়। এখন এই যে তর্কের অতীত তত্ত্ব, তা আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারি না—এ কথা অপরকে বোঝানো তো দূরের কথা, নিজেকেই বোঝাতে পারি না ; বিশেষ ক'রে বুদ্ধিমানদের এ-কথা বোঝানো রীতিমত কঠিন।

আমরা অনেক সময় বলি, "ভগবান সব করতে পারেন।" কিন্তু এ কেবল কথার কথা। এর সঙ্গে অন্তরের কোন যোগ নেই। তাই পরমুহূর্তে যদি আমাদের অপছন্দ কিছু ঘটে তো আমরা বলে উঠি "ভগবান এ কি করলে!" অর্থাৎ ভগবানের এ-রকম করা উচিত হয় নি। আমরা যা বলি, তা খুব বিচার ক'রে, তলিয়ে দেখে বা ওজন ক'রে বলি না। কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি প্রত্যেকটি খুব ওজন ক'রে বলা। ওজন করা এইজন্য যে, না হ'লে কথাগুলি থেকে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আমাদের একজন প্রাচীন স্বামীজী বিশেষ ক'রে বলতেন যে ঠাকুরের কথাগুলি যেন পরিবেশন করবার সময় একটুও এদিক ওদিক না হয়। আমরা অনেক সময় ঠাকুরের কথা আধুনিক ভাষায় বলবার জন্য বা সভায় পরিবেশন করবার উপযোগী করবার জন্য, এগুলির ওপর একটু প্রসাধন চড়াই। যেমন ঠাকুর যেখানে বলেছেন "কামিনী-কাঞ্চন", আমরা অনেক সময় তাকে বলি "কাম-কাঞ্চন"। এই প্রসঙ্গে ঐ স্বামীজী বলতেন, "গ্যাখো, ঠাকুরের কথাগুলি হচ্ছে মন্ত্র, আর সেই মন্ত্রগুলি কেন যে তিনি ঐ-ভাবে ব্যবহার করেছেন, খুঁজলে তারও এক বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া যাবে। আমরা হয়তো মায়েদের অসন্তুষ্টির কারণ না হবার জন্য কথাটা 'কাম-কাঞ্চন' ব'লে উল্লেখ করলাম। কিন্তু ঠাকুর যে কথাগুলি বলতেন, তা ঐ ভাবে অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ও-রকম ক'রে বলতেন না, সুস্পষ্টভাবে বলতেন, কথাগুলি যেন তখনই তখনই আমাদের সামনে মূর্তিমান্ হয়ে ওঠে। মনের ভিতরে বাসনার সৃষ্টি হয় যেখানে, সেই রকম ক্ষেত্রে তিনি 'কামিনী'

শব্দ উল্লেখ করেছেন, স্ত্রীজাতিকে অবমাননা করবার জন্য নয়।" ঠাকুর জানতেন যে, এই মেয়েদের মধ্যে সেই জগন্মাতাই রয়েছেন ; তা সত্ত্বেও বলছেন শক্তির তারতম্য আছে, তারতম্য আছে প্রকাশের।

কোথাও তিনি "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী"—সেই বিদ্যামায়া, পরমা বিদ্যা যা মুক্তির কারণ ; আবার কোথাও "সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী"—তিনিই আবার সংসার-বন্ধের কারণ।

ক্ষেত্র হিসাবে, পাত্র হিসাবে একই শক্তির দুভাবে প্রকাশ। কোথাও বন্ধন সৃষ্টি করছেন, কোথাও আবার বন্ধন মোচন করছেন। কোথাও অভয় দিচ্ছেন, কোথাও আবার সংহার করছেন। মানুষের কাছে এই দুটি ভাব আপাতবিরোধী হলেও তাঁর কাছে বিরুদ্ধ নয়। "ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুধ্যতে"। ভাগবত বলছেন "তুমি ঈশ্বর, ব্রহ্ম ; তোমাতে এই দুটি বিরুদ্ধ নয়"। ঠিক সেই রকম সাকার আর নিরাকার আমাদের দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হলেও তাঁর কাছে মোটেই বিরুদ্ধ নয়।

ঠাকুর বলছেন "নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য।"

বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ

সাধারণতঃ কোন বেদান্তবাদী—তা তিনি দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বা অদ্বৈতবাদী যা কিছু হোন না কেন, এ-কথা স্বীকার করতে চান না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর বা স্রষ্টা, জগতের আদি যিনি, তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিরাকার, নিরবয়ব। উপনিষদের ভাষায় "অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অচ্ছায়ম্"—কতকগুলি নেতি-বাচক শব্দের সমষ্টি। আবার তাঁরই সম্বন্ধে ঐ উপনিষদই বলছেন, তিনি "সর্বকামঃ সর্বরসঃ, সর্বগন্ধঃ", অর্থাৎ সর্বপ্রকারতা তাঁর ভিতরে রয়েছে। পরস্পর-বিরোধী এই দুই প্রকারের ধর্ম তাঁতে থাকা সত্ত্বেও শ্রুতি বলছেন, ব্রহ্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এখন মীমাংসা করতে গিয়ে দার্শনিক তাঁর সীমিত

বুদ্ধির সাহায্যে স্থির করলেনঃ একটি হ'ল সত্য, আর অপরটি হ'ল আরোপিত বা মিথ্যা। সুতরাং একদল বললেন, ঐ যে বহু-প্রকারতা, বিশিষ্টতা ঐগুলি হ'ল মিথ্যা। সকল প্রকারের অতীত যিনি, তিনি সত্য; আর তাঁর যত রকমের বৈশিষ্ট্য, ঠাকুর যাকে 'রং পরং' বলতেন—সে-সব মিথ্যা। আর একদল বলছেন যে তাঁর ভিতরেই রং পরং সব আছে। তোমরা কাছে যাও, তবে তো বুঝতে পারবে। দূর থেকে দেখলে কি ক'রে বুঝবে। সূর্যকে দূর থেকে দেখা যায় পুঞ্জীভূত তেজ ব'লে। কাছে গেলে দেখা যাবে রকমারি সব বৈচিত্র্য আছে সেখানে। জ্ঞানীরা দূর থেকে একটা আভাস দেখে মনে করেন, এই বুঝি সব। এইভাবে একদল জ্ঞানীদের খেলো ক'রে দিচ্ছেন, জ্ঞানীরা আবার যাঁরা ভগবানের বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখছেন, তাঁরা ভ্রান্ত ব'লে ধরে নিচ্ছেন। অদ্বৈতবাদীরা বললেন যে, তাঁরা মীমাংসা ক'রে নিয়েছেন। কি মীমাংসা ক'রে নিয়েছেন?— 'এই দ্বৈতবাদী যাঁরা, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করেন, ভগবানের চার হাত না দশ হাত, ইত্যাদি ব'লে। আমরা বলি, বাপু, এ সবগুলিই হ'ল মিথ্যা। সুতরাং তাঁদের কারো সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। কারণ তাঁদের সকলকেই জানি, ভ্রান্ত ব'লে। বড় সুন্দর মীমাংসা হ'ল! সকলকে ভ্রান্তের দলে ফেলে দিয়ে আমরা একটা উচ্চতর মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেদের তাদের থেকে পৃথক্ ক'রে বললুম, 'একটা মীমাংসা হ'ল।' ঠিক সেইরকম মীমাংসা দ্বৈতবাদীরাও করেন; বলেন 'জগৎকে একটা অদ্বৈতমত দিয়ে মোহগ্রস্ত করার জন্যই শঙ্করাচার্যকে ভগবান পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, কারণ এই জগৎটা মায়া দিয়ে আচ্ছন্ন না করলে সকলে যে "হরি হরি" ব'লে মুক্ত হয়ে যাবে।' ঠাকুর বলতে চাইছেন, 'যে-সিদ্ধান্তে তুমি পৌঁছতে চাইছ, তার সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকু?'

ঠাকুর উপমা দিয়ে বললেন পদ্মলোচনের কথা। পণ্ডিতরা বিচার করতে বসেছেন 'শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?' আমরা যখন পুরাণাদি

পড়ি, আমাদের মনেও তখন এই বিচার উঠেছে। কে বড় ? এক এক জায়গায় এক এক দেবতার দুরবস্থার একশেষ ; বুদ্ধির বিভ্রম ; সমস্যা। সুতরাং মীমাংসা হ'ক তরবারির সাহায্যে। ঠিক এইরকম তরবারির সাহায্যে মীমাংসা এ জগতে অনেকবার হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, গোড়ায় গোড়ায় কোথাও অনেক দেবতা ছিলেন। তাদের মধ্যে কে প্রধান, অস্ত্রের সাহায্যে হ'ত তার মীমাংসা। এক এক গোষ্ঠীর এক এক দেবতা। যে গোষ্ঠী প্রধান, তার দেবতাও প্রধান হবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ত দেবতার প্রাধান্য। আর এটাই ছিল তখনকার সাধারণ নিয়ম। যাই হ'ক, এই 'শিব বড়, না বিষ্ণু বড়' প্রশ্নের মীমাংসা পণ্ডিতরা করতে পারলেন না। তাই পদ্মলোচনের কাছে মীমাংসার জন্য যাওয়া হ'ল। পদ্মলোচন বললেন "বাপু, আমার চোদ্দপুরুষে কেউ শিবকেও দেখেনি, বিষ্ণুকেও দেখেনি ; সুতরাং কে বড়, কে ছোট—কি ক'রে ব'লব।" এই কথাটাই বলবার সাহস আমাদের থাকা চাই। নিজের মনে এ-ধারণা স্পষ্ট হওয়া চাই যে, আমি এ-সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

কাজেই আমরা যখন বলি যে, ঈশ্বর হয় সাকার, নয় নিরাকার, তিনি একাধারে সাকার আবার নিরাকার হ'তে পারেন না, তখন আমরা আমাদের নিজেদের সীমিত ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মতসমন্বয়

এখন হয়তো ভাবছি এটা কি পাগলামি ! কিন্তু এটা যে পাগলামি, এ কথাটা মনে হ'ত না, ঠাকুর আসবার আগে। শ্রীরামকৃষ্ণের আসার আগে সাধারণের মধ্যে উদার ভাবের এত প্রসার জগৎ আর দেখেনি। যেখানে কিছুটা উদার ভাবের কথা থাকত, সেখানেও সে উদারতা অবাধ নয়, অর্থাৎ সেখানেও একটুখানি খোঁচ, একটুখানি সন্দেহ থেকে যেত। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে আছে :

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

বিভিন্ন পথ দিয়ে যেমন জলপ্রবাহ সমুদ্রে পৌঁছয়, তেমনি সকল মানুষ তোমারই কাছে পৌঁছয়। কিন্তু ঐ যে "ঋজুকুটিল" ঐটুকু রয়েছে সঙ্গে। আমারটা কুটিল, তোমারটা ঋজু—এ কেউ বলবে না। তোমারটাই কুটিল, আমারটা ঋজু। ঠাকুরের কাছে কিন্তু ঋজু কুটিল কিছু নেই। তিনি তাই বলেছেন "ও তোমাদের কি এক পোঁ ধরে থাকা।"

কত রং পরং, কত বৈচিত্র্য আছে সেখানে, সে-সব আস্বাদন করতে হবে। পরিপূর্ণ অনুভূতি সেইখানে হবে, যেখানে দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় হবে। তাই এই সমন্বয়াচার্যের গোড়া থেকে সেই একই কথা 'তিনি সাকারও বটেন, আবার নিরাকারও বটেন।' সেই বহুরূপীর কথা। সে কোন সময় লাল, কোন সময় নীল, কোন সময় হলদে, আরো কত কি! আবার কোন সময় তার কোন রং নেই। এই সবগুলি ধরলে তবে বহুরূপীকে ধরা যায়; তা না হ'লে দৃষ্টি হয় আংশিক, পরিচ্ছিন্ন। আর এই পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি নিয়ে যদি আমরা অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে বুঝতে চাই, তাহলে পরিণাম যা হয়, আমাদের তাই হয়েছে।

তাই সেই অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে জানতে গেলে আমাদের দৃষ্টিকে করতে হবে উদার। অপরের ভাব যদি আমরা বুঝতে না পারি, তো আমাদের নিজেদের এই কথা বোঝাতে হবে যে, এ আমাদেরই অপূর্ণতা, তাঁর ভাবের ক্ষুদ্রতা নয়। এ আপস নয়, সহ্য করা নয়; স্বামীজী বলেছেন শুধু সহন (toleration) নয়; এ হ'ল গ্রহণ (acceptance)। এ হ'ল স্বীকার ক'রে নেওয়া যে ভগবানের কোন ইতি নেই। আমরা যে-সব রূপে তাঁকে বুঝতে পারি, তাও তিনি; আবার আমাদের বোঝার অতীত রূপেও তিনি,—আর এটাই হ'ল ঠাকুরের শিক্ষার গোড়ার কথা, যা প্রথম থেকেই তিনি মাস্টারমশাইকে শেখাচ্ছেন; শেখাচ্ছেন এইজন্য

যে, তিনি চান যে এই মাস্টারমশাই হবেন তাঁর ভাবের পরিবেশক। আজ ঘরে ঘরে তাঁর বাণী প্রচারিত হ'ক, দূর হয়ে যাক অজ্ঞানের অন্ধ তমিস্রা, জ্বলে উঠুক জ্ঞানের আলো হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রবাহিত হ'ক দিকে দিকে তাঁর 'কথামৃতে'র অমৃতময়ী মন্দাকিনী।

চার

কথামৃত—১।১।৪

প্রথম দর্শনের দিন ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের বেশী কথা হয়নি। দ্বিতীয় দর্শনে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। সেই প্রসঙ্গ এখন চলছে।

মাস্টারমশাই বললেন যে, যাঁরা মাটির প্রতিমা পূজো করেন, তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ভগবান নন।

এই কথায় ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন যে "তোমাদের কলকাতার লোকের ঐ এক! কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া।"

ঠাকুরের এই কথাগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট উপদেশ আমরা খুঁজে পাচ্ছি। তিনি বলছেন, অন্তরে উপলব্ধি যদি না থাকে তো কথার কোন মূল্য থাকে না, সে কেবল শব্দমাত্র হয়ে যায়।

তাই বলছেন 'তোমাদের কলকাতার লোকের খালি লেকচার দেওয়া।' এখানে অবশ্য 'কলকাতার লোক' বলতে ইংরেজীশিক্ষিত তৎকালীন মানুষদেরই বোঝাচ্ছে, যারা নিজেরা না বুঝেই অপরকে বোঝাবার চেষ্টা করে। যে-বিষয় আমরা কিছুই জানি না, সেই সম্বন্ধেই আমরা আরও জোর গলায় তর্ক করি। ধীরে ধীরে জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু।

প্রতিমা-পূজার প্রয়োজনীয়তা

ঠাকুর আরও বলছেন, মাটির প্রতিমাকে ভগবান ভেবে পূজা করা যদি ভুলই হয়ে থাকে তো যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, তিনি কি এটুকু জানেন না যে এই পূজার লক্ষ্য তিনি। ভগবান এই বিভিন্ন রকমের পূজার প্রচলন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকদের উপযোগী হবে ব'লে। মা যেমন জানেন তাঁর কোন্ ছেলের কোন্ খাবার উপযোগী, ঠিক তেমনি ভগবান জানেন—কার পক্ষে কোন্‌টি উপযুক্ত পথ। তাই তাঁকে চিন্তা করবার এই ভিন্ন ভিন্ন সাধনপদ্ধতি তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

এ কথাটা কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারি না, কেন না ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের নেই। বড় বড় দার্শনিক কথা উচ্চারণ ক'রে আমরা আমাদের এই নির্বুদ্ধিতা ঢাকবার জন্য শব্দজালের সৃষ্টি করি, যার ভিতর সার যতটা না থাকে, তার থেকে বেশী থাকে ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে এমন একটিও কথা নেই যা অস্পষ্ট, যা বোঝা যায় না, যা আমাদের কোন কাজে লাগে না।

একবার ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্বামীজী বললেন "অন্ধবিশ্বাস" কথাটা। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন "হ্যাঁরে, বিশ্বাস আবার দু-রকমের আছে নাকি, কতকগুলো চোখওলা, আর কতকগুলো অন্ধ?" স্বামীজী বিপদে পড়লেন। ঠাকুর আরও বললেন "হয় বল্ বিশ্বাস, নয় বল্ জ্ঞান"। স্বামীজী তাঁর প্রখর বুদ্ধি সত্ত্বেও ঠাকুরের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন।

ঈশ্বর—বাক্যমনের অতীত

ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝাতে ঠিক সেই রকম আমরা বলি "তিনি চৈতন্য-স্বরূপ; সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ"—কত কি গালভরা শব্দ। যদি কেউ প্রশ্ন

করে 'সচ্চিদানন্দ বলতে কি বোঝ?' তখন বড় জোর বলতে পারি 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'; কিন্তু তখনও যদি কেউ প্রশ্ন করেন 'সৎ-চিৎ-আনন্দ মানেটা কি?' তখন আর এগোনো যায় না।

শ্রুতি বলেছেন 'তিনি বাক্য-মনের অগোচর'। সুতরাং এই শব্দগুলি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে—এ-রকম প্রগল্‌ভতা শ্রুতিও সহ্য করবেন না। বাক্যমনের অগোচর যিনি, তাঁকে যে নামই দিই, তাতে কি তাঁকে প্রকাশ করা যায়? যায় না। এই কথাটাই আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না; আর যত বুঝতে পারি না, তত বেশী তর্ক বিচার করি। হয়তো বললাম, "সৎ মানে চিরস্থায়ী", কিন্তু চিরস্থায়ী কোনও জিনিস কি আমরা দেখেছি? দেখিনি। যা আমরা কখনও দেখিনি, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি ক'রে আমাদের ধারণা হবে?"

দার্শনিকরা বলেন, "সৎ মানে কি?—না, তিনি অসৎ নন। অসৎ মানে কি?—না, অনস্তি, সত্তাশূন্য। চিৎ মানে কি?—না, তিনি অপ্রকাশ নন। আনন্দ মানে কি?—না, তিনি দুঃখরূপ নন।" শাস্ত্রও এই রকম ক'রে বলেছেন: অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অচ্ছায়ম্ ইত্যাদি। কিন্তু এর দ্বারা তিনি কি, তা কি বলা হ'ল?

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন বোঝাচ্ছেন, ব্রহ্ম বস্তুটি কি, তখন এই রকম হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন: তিনি দূরে থেকেও কাছে; তাঁর গতি আছে, আবার নেই। তখন একজন ঋষি বললেন, "এই রকম হেঁয়ালির মধ্যে দিয়ে বললে চলবে না। এটা একটা 'গরু', এটা একটা 'ঘোড়া' এই ভাবে বললে যেমন বস্তুকে স্পষ্ট বোঝা যায়; সেইভাবে বোঝাতে হবে।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ"—দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁকে তুমি দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে জানতে চেও না; শ্রুতির যিনি শ্রোতা, তাঁকে শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে জানতে চেও না; সেই রকম মনের পিছনে যিনি মন্তা, তাঁকে মনের সাহায্যে

জানতে চেও না। তা হ'লে আমরা সেই বস্তুকে জানব কি ক'রে? অথচ তাঁকে না জেনে ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লিখছি তাঁকে নিয়ে।

বিদ্যাসাগর-মশাই মহাপণ্ডিত হয়েও ভগবান সম্বন্ধে কোন কথাই বলতেন না। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, "আপনি এত বিদ্যা অর্জন করেছেন, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে কোন জায়গায় কিছু বলেন না কেন?" তিনি উত্তর দিলেন "বাপু, আমার চাবুক খাবার ভয় আছে।" অর্থাৎ যে বস্তু নিজে বুঝি না, সেই বস্তু সম্বন্ধে বলতে গেলে চাবুক খেতে হবে।

কিন্তু তবু বন্ধু-বান্ধবরা ছাড়েন না। তখন নেহাত ধরাধরির জন্য "বোধোদয়" বই-এর গোড়াতেই লিখলেন "ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ"। এখন এই 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর' লিখে তিনি ছাত্রদের কি উপকার করলেন জানি না, কিন্তু মাস্টারদের একেবারে বিপর্যস্ত করলেন।

বিভিন্ন উপাসনা ও উপাসক

উপলব্ধি না থাকলে কথা কেবল কয়েকটা শব্দ মাত্র সৃষ্টি করে, যার পরিণামে হয় চিত্তবিভ্রম। এর পর ঠাকুর বলছেন যে ভগবান এই বিচিত্র রকম উপাসনাপদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন—"তিনিই করেছেন, তুমি খোদার উপর খোদকারি করতে যাচ্ছ কেন? দরকার হয়, তিনি বোঝাবেন।" অন্য জায়গায় বলছেন, 'ছেলে বাপকে ডাকছে। কি ভাবে ডাকতে হবে, হয়তো সে ভালো ক'রে জানে না; নামও জানে না, বাপের মহিমাও সে জানে না। কিন্তু বাবা কি তার ডাকে সাড়া দেন না?' বাবা কি বোঝেন না যে ছেলে তাঁকেই ডাকছে। ভগবান্ কি জানেন না যে, মাটির মূর্তির ভিতর দিয়ে লোকে তাঁকেই পূজো করছে।

ভাগবতে তিন রকমের আরাধনার কথা বলা আছে। প্রারম্ভিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষ প্রথম যা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সাধনা করতে

করতে সে একটু উচ্চ অবস্থায় পৌঁছয়, আর তৃতীয় অবস্থায় সে চরম লক্ষ্যে পৌঁছয়। এই তিনটি স্তরকে যথাক্রমে প্রবর্তক মধ্যম ও উত্তম বলা হয়েছে ভাগবতে, কাকেও কিন্তু 'অধম' বলা হয় নি। প্রবর্তক ভক্ত কি রকম?

অর্চায়াম্ এব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

ভগবানের পূজা কেবল অর্চা অর্থাৎ বিগ্রহেই করে; একটি মূর্তি করেছে, সেই মূর্তিকে সে খুব শ্রদ্ধাসহকারে সাজাচ্ছে গোজাচ্ছে, তাতে ভোগ দিচ্ছে। কিন্তু এই সব কিছুই করছে খুব শ্রদ্ধাসহকারে। এদের 'প্রাকৃত' ভক্ত বলে। প্রাকৃত বলা হয়েছে এ জন্য যে, সে প্রকৃতির প্রভাব অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে মুক্ত নয়। অবশ্য কে যে মুক্ত সে কথা বলা মুস্কিল।

দ্বিতীয় স্তরে বলেছেন

ঈশ্বরে তদ্-অধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

এইরূপ ভক্তের ভগবানের প্রতি প্রেমভাব; ভগবানের অধীন ভক্তদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা; ভগবান সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ তাদের প্রতি তাঁর কৃপা, আর ভগবদ্‌বিদ্বেষী যারা, তাদের দ্বেষভাবের প্রতি তাঁর উপেক্ষা। এই মধ্যম ভক্তের কাছে হেয় কেউ নেই, অবজ্ঞার পাত্র কেউ নেই, সকলের সঙ্গে তাঁর এমন এক সম্বন্ধ, যাতে সকলকে তিনি সাহায্য করতে চান, কাকেও উপেক্ষা করেন না। শ্লোকের মধ্যে যে উপেক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা বিদ্বেষীর দ্বেষভাবের প্রতি, কোন ব্যক্তির প্রতি নয়।

তা হ'লে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে পূজা আরম্ভ হয়েছিল ভগবানের একটি মূর্তি নিয়ে, ধীরে ধীরে সেই

দৃষ্টি প্রসারিত হ'তে থাকল ভক্তদের ভিতরে এবং পরে সর্বভূতে—যেখান থেকে কেউ বাদ প'ড়ল না। তাঁর নিজের ভিতরে যে আত্মা, সর্বভূতেই সেই আত্মাকে দেখছেন তিনি, আর এই সর্বভূত বলতে কেবল প্রাণীই নয়, জড়বস্তুকে পর্যন্ত তিনি সেই ভাবেই দেখছেন।

শ্রেষ্ঠ ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে ভাগবত আরও বলেছেন (১১।২।৩৯)—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

সব জায়গায় তিনি ভগবানের সত্তা দেখেন, সবই ভগবানের শরীর দেখেন। তিনি দেখেন শরীর আর শরীরী যেমন অভিন্ন, সেইরকম জগৎ আর ভগবানও অভিন্ন। এই হ'ল শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ। বিচার ক'রে নয়, ভক্তির ভিতর দিয়ে গেছেন তিনি এবং যেতে যেতে এমন জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না। অনন্য সেই ভক্ত—'অনন্য' মানে ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই সে ভক্তের দৃষ্টিতে ; তখন সর্বত্র প্রণাম করছেন তিনি। তাই তাঁর ব্যবহারও তেমনই হবে। ঐ বিগ্রহের সঙ্গে যেমন শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার তাঁর ছিল, জগতের প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে তাঁর সেই রকম ব্যবহার হবে। এই হ'ল শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ।

শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ দেখে যদি আমরা বিগ্রহ-পূজককে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি, তা হ'লে আমরা আমাদের নিজেদের এগোবার পথই বন্ধ ক'রে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অপরের এগোবার পথও রাখলাম না। সিঁড়ির সবচেয়ে নীচুধাপ যেটি, সেটিতে যদি আমি পা দিতে সঙ্কোচ বোধ করি, কারণ সেটি খুব নীচে, তা হ'লে ছাদে ওঠা কি আমার কোনদিন সম্ভব হবে? এ হ'ল নিতান্ত শিশুসুলভ মনোবৃত্তি। ছোট ছেলের স্বভাব হচ্ছে : ছোট জিনিসে তার সন্তোষ নেই। দাদার জুতাটা, বাবার জুতাটা পায়ে দিয়ে চলতেই তার ভাল লাগে। সে জানে না যে, সে এখনো

ঐ জুতা পরবার উপযুক্ত হয়নি। আমাদেরও ঠিক ঐরূপ শিশুসুলভ ভাব। যা আমরা গ্রহণ করতে পারি, যা আমাদের পক্ষে উপযোগী, তাকে উপেক্ষা ক'রে যা ধরতে পারি না, এমন জিনিসের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ। সোজাসুজি শেষ ধাপে লাফিয়ে ওঠা যায় না; উঠতে হ'লে আস্তে আস্তে এক ধাপ এক ধাপ ক'রে এগোতে হবে।

প্রতীক ও পথ

প্রতীকের সাহায্য ছাড়া কেউ সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে না। তা সে মাটির প্রতীক না হয়ে হয়তো শব্দের প্রতীক বা অন্য কিছুর। কিন্তু শব্দ-প্রতীকও তো প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতীক বস্তু নয়, তবু বস্তু লাভ করতে হ'লে প্রতীকের সাহায্যেই এগিয়ে যেতে হবে, সুতরাং যাকে আমরা বলছি নিম্নস্তরের উপাসনা, তাও বাস্তবিকপক্ষে উপেক্ষার নয়, কেননা সেই উপাসনাও কিছু না কিছু লোককে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

বিভিন্ন ধর্মসাধনা ও উপলব্ধি

নিজে যখন আমরা পথ চলতে চাই না, তখন আমাদের যথেষ্ট অবকাশ থাকে অপরের পথের নিন্দা করবার। আর যদি নিজের পথ সম্বন্ধে অবহিত হই এবং সে পথে চলবার জন্য যদি ব্যাকুলতা থাকে, তাহলে অপরের পথের দিকে তাকিয়ে তার সমালোচনা করার অবকাশ আমাদের থাকে না। কেননা তখন আমার সমস্ত মন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এই চিন্তায় যে কি ক'রে আমি আমার পথে এগিয়ে যাব। ঠাকুর আরও বলছেন, 'তুমি কি সব পথগুলোকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছ?' সব পথ তো দূরের কথা, যে পথ আমি আমার ব'লে গ্রহণ করেছি, তাকেও তো পরীক্ষা ক'রে দেখিনি। আমরা অনেকে বলি ওগুলো হচ্ছে—শিশু-

বিদ্যালয়ের পদ্ধতি (Kindergarten method)। আমরা বড় হয়েছি, কাজেই ঐ-রকম ছোটদের মতো খেলনা নিয়ে থাকতে আমরা রাজী নই। ভাল কথা! আমরা কি নিয়ে থাকতে রাজী? গালভরা কথা বললাম—'তিনি হচ্ছেন নিত্য, শুদ্ধ ইত্যাদি'; কিন্তু না জানি আমরা 'নিত্য' কি, না জানি আমরা 'শুদ্ধ' বলতে কি বোঝায়।—এই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অবস্থা। তাই ঠাকুর বলছেন যে "তুমি ও-সম্বন্ধে বলতে যাও কেন?" তিনি ভিন্ন ভিন্ন মানুষ করেছেন আর এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য করেছেন ভিন্ন ভিন্ন পথ। আমরা যদি নিজের নিজের পথ ধ'রে চলতে থাকি তো ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারব। ঠাকুর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই পরীক্ষিত সত্য সকলকে বলছেন যে, সব পথের ভিতর দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তিনিই হলেন একমাত্র গন্তব্যস্থল। শাস্ত্রে আছে ব'লে ঠাকুর এ-কথা বলছেন না; শোনা কথা বলেও এ-কথা বলছেন না; তাঁর পক্ষে এটা পরীক্ষিত সত্য।

'সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্'—সব জলেরই গতি যেমন সমুদ্রের দিকে, তেমনি সকল জীবের আধার তিনি; তাঁতেই জীবের অধিষ্ঠান, তাঁতেই জীবের লয়। এটি যেমন প্রত্যেক জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য প্রতিটি ধর্মমতের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ধর্মমতের অনুশীলন ক'রে ঠাকুরের অভিজ্ঞতা এই যে, তাদের পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অন্তে সকলে একই সত্যে উপনীত হয়।

ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের মূল কথা হ'ল এইটি। একজন বলেছিলেন যে "ধর্মের আবার সমন্বয় কি? ধর্ম কি ভিন্ন ভিন্ন? ধর্ম তো একই।" —কথাটা লেকচার দেবার সময় শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু 'ধর্ম একই' কথাটার মানেটা কি? যাঁরা বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ ক'রে চলেছেন, তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা বলবেন 'তা কি ক'রে হয়? তোমার ধর্ম আমার ধর্ম নয়; আবার আমার ধর্মও তোমার ধর্ম নয়।'

আমাদের প্রকৃতি ভিন্ন ; আমাদের পিছনে ইতিহাস ভিন্ন ; আমরা শৈশব থেকে এক এক ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছি ; বুদ্ধি আমাদের এক এক রকমের সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রে চলেছে—এই ভেদকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই যে ভেদ সামনে দেখছি আমরা, এই ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা যে সমস্ত ভেদের অতীত অবস্থায় পৌঁছতে পারব না, এ-কথা বলা যায় না। যেমন একটি বৃত্তের পরিধি থেকে তার কেন্দ্রের দিকে যাবার জন্য বিভিন্ন ব্যাসার্ধ-পথ আছে। এই পথগুলি দিয়ে কেন্দ্রাভিমুখী গতি যাদের আরম্ভ হচ্ছে, তাদের একটির থেকে আর একটির দূরত্ব অনেক বেশী। কিন্তু যত তারা কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই তাদের মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে। শেষে যখন তারা কেন্দ্রে পৌঁছয়, তখন তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। অবশ্য এটা একটা উপমা ; এ-রকমভাবে ধর্ম জিনিসটাকে এত সহজ ক'রে বোঝানো যায় না। কারণ যাকে এই কেন্দ্র বলছি, তার সম্বন্ধে তো পরস্পরের কোন জ্ঞান নেই। পরস্পর আমরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, দূরত্বের অনুভব নিয়ে চলছি, তাই আমরা যে শেষকালে একই জায়গায় পৌঁছব—এ-কথা প্রথম থেকে তো আর বিশ্বাস হয় না। যদি কেউ এ-কথা বলেন, তো তাঁকে আমরা অবিশ্বাস করি। সম্প্রতি আমাদের লণ্ডন কেন্দ্রের একটি সাধুর কাছে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি—একজন লেখক বলেছেন যে 'রামকৃষ্ণদেব যে খ্রীষ্টান মতে সাধনা করেছেন, বা ইসলাম পথে চলেছেন বলা হয়—এ তো তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনা।' অর্থাৎ প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, যে-ঐতিহ্য (tradition) তাঁদের রয়েছে রামকৃষ্ণদেব কি তার সবটাই গ্রহণ করেছেন? এখন এই ঐতিহ্যের মধ্যে কতকটা থাকে মুখ্য, আর কতকটা থাকে গৌণ অর্থাৎ তার ডালপালা।

কাজেই যখন ঠাকুর খ্রীষ্ট-ধর্মমতে সাধন করেছিলেন বলছি, তখন তিনি কি একেবারে খ্রীষ্টীয় মতে দীক্ষিত (baptised) হয়েছিলেন, বা

তিনি সেই মৌলিক পাপ (original sin) বিশ্বাস করতেন কিনা— এ সব প্রশ্ন অবান্তর। ডালপালাসদৃশ গৌণ বিষয়ের মধ্যে না গিয়ে তিনি তাদের মুখ্য নীতিগুলি মেনে অগ্রসর হয়েছিলেন কিনা, এটুকু দেখতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী সাধু হয়ে নতুন এসেছেন বেলুড় মঠে। আমার সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন তিনি কি রকম হাতে ক'রে খেতে শিখেছেন, দেখাতে গিয়ে থালাটা নিয়ে আমার সামনে রেখে হাতে ক'রে একটু খেয়ে চলে গেলেন থালাটা তুলে নিয়ে। আর একজন পাশে ছিলেন তিনি বললেন "তুমি ওকে বললে না এঁটো হয়ে গেল জায়গাটা", আমি বললাম "দেখুন, এঁটো হয়ে গেল বটে ; কিন্তু ও তো এ-কথাটা বুঝবে না ; কারণ ওর ভিতরে এঁটো সম্বন্ধে কোন সংস্কারই নেই।" তিনি বললেন "তা না থাক। তবুও ও যখন হিন্দুভাবে সাধনা করছে, তখন এটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।" আমি বলেছিলাম যে "এই যদি হিন্দুত্ব হয় তো এ-রকম হিন্দুত্ব না হলেও ওর চলবে"। ভাব এই যে, গৌণ জিনিসকে মুখ্য ক'রে অনেক সময় আমরা ধর্মের প্রহসন করি। স্বামীজী বলেছেন "আমাদের দিন কেটে গেল এই ভাবতে যে জলের গ্লাসটা ডান হাতে ধ'রব কি বাঁ হাতে।" এটা যে মুখ্য জিনিস নয় এবং ভগবান লাভের সঙ্গে এর যে কোন সম্বন্ধ নেই, এ-কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। কাজেই যখন আমরা বলি যে ঠাকুর অন্য ধর্মপথেও সাধন করেছিলেন—তখন এই কথাই আমরা বুঝি যে, সেই সেই ধর্মের মুখ্য পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন। এটা আমরা বলতে পারি তাঁর কথা থেকে, তাঁর আচরণ থেকে, তাঁর স্বভাব থেকে।

যখনই তিনি যেটা ধরেছেন, যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে তার অনুসরণ করেছেন। এই খুঁটিয়ে অনুসরণ করার একটা সার্থকতা আছে। যুক্তিবাদী হয়ে অনেক জিনিসকে আমরা গৌণ বলে কেটে ছেঁটে দিতে চাই। যেমন

আমরা বলি শস্যটাই হ'ল আসল, আর তার আবরণটা হ'ল গৌণ ; তাই সেটাকে ফেলে দিয়ে শস্যটাকে নাও। তার উত্তরে ঠাকুর আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন যে, 'ওগুলোও নিতে হয়।' শস্যের আবরণটি যদি বাদ দেওয়া যায় তো আর শস্যকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। চাল পুঁতলে গাছ হয় না ; সুতরাং ধানই পুঁততে হবে। যা প্রথা রয়েছে, তার সবটাই বৃথা নয়। তবে এর ভিতরেও প্রচলিত প্রবাদে 'বেড়াল বাঁধা' যেমন বলে, সে-রকম না করলেও হয়। আমরা যেন সকলকে অতদূর বিভ্রান্ত না করি। তার মূল তত্ত্ব খানিকটা আমরা যেন বুঝিয়ে দিই এবং নিজেরা অনুসরণ করি। তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যখন তত্ত্বে পৌঁছব, তখন এই সত্য নিজেরা অনুভব দ্বারা বুঝতে পারব। ঠাকুর এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যে বৈজ্ঞানিকের মতো পরীক্ষা করেছেন তা নয়। আমরা অনেক সময় বলি ঠাকুরের পরীক্ষাটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মতো। ঠাকুরের প্রণালী ঠিক তা নয়। তিনি বলছেন "মা, তোকে অমুক ভক্তেরা কি রকম ক'রে দেখে, আমি দেখব।"

তিনি এটা ধরেই নিয়েছেন যে অপর ভক্তেরা তাঁর 'মা'কেই দেখেন। তাঁদের সাধন-পদ্ধতি তিনি জানতে চান, অনুভব করতে চান। সুতরাং মা সব ব্যবস্থা করছেন, সব যোগাযোগ ক'রে দিচ্ছেন, সব অনুভূতি তাঁকে করাচ্ছেন। এরপর তিনি অনুভবের ভূমির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বলছেন যে, সব রকম ক'রে আমরা তাঁকেই পাই। 'যত মত তত পথ'—সত্যটি এইভাবে পরীক্ষিত হ'ল তাঁর জীবনে। প্রশ্ন হ'তে পারে সব মতই কি তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন ?—না, তা নয়। সব মত তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখেন নি। যাকে বলে নমুনা সমীক্ষা (sample survey), ঠাকুরের পদ্ধতিকে অনেকটা সে রকম বলতে পারি।

কতকগুলো মত যা তখন প্রচলিত ছিল, সেগুলি তিনি দেখেছেন এবং এর ওপর ছিল তাঁর লোকোত্তর দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে তত্ত্ব স্ব-স্বরূপে

প্রতিভাত হ'ত, তাঁকে গবেষণা ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে বার করতে হ'ত না। তাঁর শুদ্ধ মনের কাছে অজ্ঞানের আবরণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে, তিনি দেখতে পেয়েছেন বিভিন্ন মানুষের গন্তব্যস্থল এক। সর্ব উপায়ে তিনি দেখেছেন যে বিভিন্ন পথ দিয়ে তাঁর 'মা'কেই সকলে দেখছে।

তিনি তাঁকেই 'মা' বলছেন, যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কর্ত্রী। আমরা যেন আবার এই বলে না বিবাদ করি—তিনি কালীর উপাসক না বিষ্ণুর উপাসক, অদ্বৈত-বেদান্তী না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনি এ সব তো বটেই, আবার এর পরেও অনেক কিছু। স্বামীজী এক কথায় তাঁকে "সর্বধর্মস্বরূপিণে" বলে প্রণাম জানিয়েছেন। সর্বধর্ম-স্বরূপ কেন না, বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বর উপলব্ধি ক'রে তিনি তৎস্বরূপ হয়েছেন। ধর্ম যা হবে, যা আছে, যা ছিল—সবগুলিই যেন তাঁর জীবনে ফুটে উঠেছিল, যখনই এর প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছিল ; সব সময় সকলের কাছে তা প্রকাশিত হয়নি।

খ্রীষ্টান এসে তাঁর ভিতর যীশুখ্রীষ্টের প্রকাশ উপলব্ধি করেছে, বলেছে 'আপনিই যীশু।' এ রকম আরও অনেকে বলেছিলেন। তাঁর ভিতর এমন একটি তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে, এমন একটি বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে, এমন এক আলো জ্বলছে, যার সাহায্যে আমরা যে দিকেই তাকাই না কেন, অন্ধকার দূর হয়ে যায়। ঠাকুরের ধর্মসমন্বয়কে যদি আমরা এইভাবে দেখি, তাহলে হয়তো কতকটা ধারণা করতে পারব।

পাঁচ

কথামৃত—১।১।৬-৭

অধিকারিভেদে উপদেশ দান

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে উচ্চতম আদর্শের কথাও যেমন আছে, তেমনি ব্যাবহারিক জগতের উপযোগী কথাও আছে।

জগতের সকলের কল্যাণের জন্য যাঁর আসা, তাঁর শিক্ষা কি কখনও কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের উপযোগী হ'তে পারে? তা হ'লে তো তাঁর শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে অধিকাংশ লোকই বাদ পড়ে যায়। তাই একদিকে তিনি যেমন উপদেশ দিচ্ছেন সর্বংসহ হ'তে, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন হ'লে গৃহস্থকে 'ফোঁস' করতেও বলছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী ও সাপের আখ্যানটির উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন যে গৃহস্থের নিজের বাঁচার প্রয়োজনে এই ফোঁস করা দরকার। তবে ত্যাগীর জন্য অন্য বিধান; নিজেকে বাঁচানোর জন্যও তাঁর এই ফোঁস করার বিধান নেই। এত কড়াকড়ি তাঁর জন্য। এই ফোঁস করার অর্থ আদর্শের সঙ্গে আপস করা নয়; আদর্শকে জীবনে ব্যবহারোপযোগী করবার জন্য তার খানিকটা পরিবর্তন ক'রে নিতে হয়, যাতে সাধারণ মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে সেটা কাজে লাগে। ঠাকুর অনেক সময় তাঁর ভাবী ত্যাগী সন্তানদের লক্ষ্য ক'রে ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন। উপদেশ দিতে দিতে যখন মনে প'ড়ত যে সেখানে এমন অনেকে উপস্থিত আছেন, যাঁরা অত উচ্চ ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করতে পারবেন না, তখন বলতেন "আমরা ও একটা বললাম, এর ভিতর থেকে তোমরা ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।" অর্থাৎ তোমাদের যতটা সয়

ততটা গ্রহণ ক'রো। এই যে অধিকারী বিচার করা—এটি হ'ল আচার্যের কাজ। এক রকম আদর্শ সকলের জন্য নয়, তাই এক রকম উপদেশও সকলের পক্ষে নয়। আমাদের শাস্ত্রে তাই বিভিন্ন প্রকার আদর্শের উল্লেখ আছে ; সকলের জন্য এক আদর্শের বিধান করা হয়নি। যেখানেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই তার ফল সমাজের পক্ষে বিষময় হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন, বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সময় সন্ন্যাসের আদর্শকে এত জোর দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ যাঁরা সন্ন্যাস জীবনের উপযোগী নন, তাঁরাও দলে দলে সন্ন্যাসী হ'তে চেষ্টা করেছিলেন। পরিণামে অনধিকারীর হাতে পড়ে সন্ন্যাসের আদর্শ তার মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল। গীতার যুগে কিন্তু আমরা অন্যরকম চিত্র দেখি। গীতায় অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ রয়েছে। অবশ্য সাধারণ কতকগুলি নিয়ম সকলের জন্য উপযোগী হ'তে পারে, কিন্তু সেগুলি সমাজে চালাবার জন্য তাদের কোন অনমনীয়, অপরিবর্তনশীল রূপ দেওয়া চলে না। এর ব্যতিক্রম হলেই আদর্শের অবনতি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান পথ

এই রকম এক যুগে নয়, বহুযুগে হয়েছে। তাইতো ভগবানকে বারবার এসে পুরানো কথা নতুন ক'রে বলতে হয়। গীতায় তাই ভগবান বলেছেন "স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ"—প্রাচীন যোগই তোমাকে আবার বলছি। ঠাকুর বহুবার এই কথা বলেছেন যে, ধর্ম সনাতন। নতুন জিনিস সেখানে দেবার মতো থাকে না, তবে পুরানো সত্যকে নতুন ভাবে পরিবেশন করা হয় ; সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে প্রাচীন শিক্ষাই একটু ভিন্ন রূপ নেয় মাত্র ; তবে মূল তত্ত্বে কোন প্রভেদ থাকে না। ভগবান যেমন সনাতন, ভগবানকে পাবার পথও তেমনি সনাতন। তবে এই সনাতন তত্ত্ব বা পথের অনন্ত

প্রকারের বৈচিত্র্য আছে। অবতার যখন আসেন, তখন তিনি ঐ তত্ত্ব ও পথকে সেই যুগের উপযোগী ক'রে সমাজে প্রচার করেন। সুতরাং তাঁর শিক্ষার ভিতরেও দুটো দিক থাকে। একটি হচ্ছে সনাতন তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা, প্রাণবন্ত করা, অপরটি হ'ল সেই তত্ত্বগুলিকে যুগোপযোগী করা। ঠাকুরের জীবনেও আমরা দেখি যে তিনি ধর্মের সনাতন তত্ত্বগুলি সকলের কাছে প্রাণবন্ত ক'রে, সকলের বোধগম্য ক'রে সহজ সরলভাবে পরিবেশন করছেন; তাঁর দর্শনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস দূর হয়ে যাচ্ছে, মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হচ্ছে। শুধু এইটুকুই নয়, ধর্মকে নানাভাবে যুগোপযোগীও করেছেন তিনি। বলছেন, "দেখ, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। আজকাল মানুষের আর অত সময়-সামর্থ্য নেই যে যাগ-যজ্ঞ বা সন্ধ্যাবন্দনাদি ক'রে দীর্ঘ সময় কাটাতে পারে। এখন কেবল গায়ত্রী করলেই হয়। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়; গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।"

তাঁর নাম করার কথায় বলছেন "তাঁর নাম করবে বনে কোণে মনে।" যে যেভাবে পারুক, মনে বনে কোণে তাঁর চিন্তা করুক। মাঝে মাঝে নির্জনবাস সকলের পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন, এ-কথা ঠাকুর বারবার বলেছেন। তবে কারও পক্ষে যদি তা সম্ভবপর না হয় তো তারও ব্যবস্থা আছে। সে নাম করবে কোণে; তাও যদি সম্ভব না হয় তো সে শুধু মনে মনেই তাঁর নাম করবে।

শিবজ্ঞানে জীবসেবা

ধর্মকে যুগোপযোগী করবার জন্য ঠাকুরের অজস্র উপদেশ আছে; তার ভিতর একটা কথা যা স্বামীজী বিশেষ ক'রে জোর দিয়ে বলেছেন, তা হ'ল 'জীবে দয়া নয়; ঈশ্বরবুদ্ধিতে জীবসেবা।' দয়া করলে দয়ার পাত্র থেকে নিজেকে বড় মনে হয়। তাই ঠাকুর বলছেন, "দয়া কিরে?

তুই দয়া করবার কে ? তুই সেবা করবি। সর্বভূতে তিনি আছেন—এই বুঝে শিব-বুদ্ধিতে জীবের সেবা করবি।”

এই কথা শুনেই স্বামীজী বলেছিলেন, “আজ এমন একটা অপূর্ব কথা শুনলাম, যদি ভগবান দিন দেন তো এই কথা কার্যে পরিণত ক’রব।” ঠাকুরের এই কথা থেকেই সূত্রটি তিনি পাচ্ছেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি ঠাকুরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক’রে দেননি, বরং প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর সাধ্য নেই যে ঠাকুরের কথার তিনি অন্যথা করেন এবং শেষকালে তাঁকে বলতে হ’ল যে “এই পাগলা বামুনের পায়ে এবারের মতো মাথাটা বিক্রি হ’য়ে গেল।” স্বামীজীর সেবাধর্মের—শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে ভাব, এখানেই তার সূত্রপাত। আর এই হ’ল ঠাকুরের যুগোপযোগী শিক্ষার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ-রকম দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা থেকে, তাঁর অনেক উপদেশ থেকে আমরা পাব ; যত দিন যাবে, মানুষ সেগুলির ভিতর থেকে তাঁর নতুন নতুন শিক্ষার সূত্র বার করবে।

পাত্রানুযায়ী উপদেশ

সাপ ও ব্রহ্মচারীর গল্পে আমরা দেখছি যে ব্রহ্মচারী সাপকে কামড়াতে বারণ করছেন, কিন্তু ফোঁস করতে বারণ করেননি। কারও অনিষ্ট করতে বারণ করছেন, কিন্তু সব অন্যায় নির্বিচারে সহ্য করতে বলেননি।

আবার অধিকারিভেদে তাঁর শিক্ষারও তারতম্য আছে। যখন শুনলেন যে তাঁর ‘নিরঞ্জন’ (পরে নিরঞ্জনানন্দ), নৌকো ক’রে আসার সময় ঠাকুরের নিন্দে হচ্ছে শুনে নৌকোসুদ্ধ ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁকে ভর্ৎসনা ক’রে বললেন, “সে কিরে! লোকে কত কি

বলে, তার জন্য তুই নৌকো ডুবোতে গেলি!" আবার এর ঠিক বিপরীত চিত্র পাই স্বামী যোগানন্দের জীবনে। ঠিক এই রকমই একদিন নৌকো ক'রে আসবার সময় ঠাকুরের সম্বন্ধে কটাক্ষ করা হচ্ছে শুনে তিনি একটি প্রতিবাদও করলেন না—এ কথা শুনে ঠাকুর তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন বিনা প্রতিবাদে গুরুনিন্দা সহ্য করবার জন্য। এ আর এক রকমের শিক্ষা। কত রকমের বৈচিত্র্য তাঁর শিক্ষার মধ্যে। একবার তাঁর এক শিষ্যকে তিনি তাঁর জামা কাপড় রাখার বাক্সের মধ্যে আরসোলা বাসা বাঁধতে দেখে, সেই আরসোলাটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে বলেছিলেন। ঐ শিষ্য ছিলেন অতিশয় কোমল প্রকৃতির। তিনি আরসোলাটি বাইরে নিয়ে গিয়ে না মেরে ছেড়ে দিলেন। এ-কথা শুনে ঠাকুর সেই শিষ্যকে ভর্ৎসনা করলেন। শিষ্যটি তো অবাক হলেন। তিনি ভাবলেন কোথায় অহিংসার পরাকাষ্ঠার জন্য ঠাকুর তাঁর উপর খুশীই হবেন, তা না হয়ে উল্টোটা হ'ল। কিন্তু ঠাকুরের ভর্ৎসনার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, শিষ্যেরা যদি তাঁর কথামত কাজ না ক'রে নিজেদের খুশীমত কাজ করতে থাকেন, তা হ'লে সাধনপথে তাঁদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

বদ্ধজীব ও মুক্তির উপায়

এর পর ঠাকুর বিভিন্ন প্রকারের জীবের কথা বলছেন। চার প্রকারের জীব আছে—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। বদ্ধজীব যারা তারা সব সময়ে বন্ধনেই থাকে, আর এই বন্ধনেই তাদের আনন্দ। মুমুক্ষুজীব এই বন্ধন থেকে মুক্তির চেষ্টা করে, আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে বন্ধন কেটে বেরিয়ে যায়, তখন তাদের বলা হয় মুক্তজীব। আর নিত্যজীব কখনও মহামায়ার জালে পড়েন না।

বদ্ধজীব সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন "বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে

বদ্ধ রয়েছে, হাত-পা বাঁধা।……হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।" সকলে স্তব্ধ! শ্রোতাদের স্তব্ধ হওয়ারই কথা। কারণ এ দৃশ্য তো তাঁরা সকলে দেখেছেন; কিন্তু এ-রকম ক'রে তো তাঁরা কোনদিন ভাবেন না। সংসারে কর্ম থেকে যাঁরা অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ঠাকুর কি রকম হুবহু ছবি এঁকেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে অমূল্য, সেই সময়টা কোন রকমে কাটিয়ে দেবার কি প্রাণান্তকর প্রয়াস। সময়ের এই সীমিত গণ্ডির মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা কত কঠিন; কোথায় এর জন্য থাকবে একটা উৎকণ্ঠা, একটা তীব্র ব্যাকুলতা, তা না উল্টে ভাবছে কি ক'রে সময় কাটাবো। যদি আমরা এই বন্ধনকে বন্ধন ব'লে সত্যি সত্যি বোধ করতাম, তা হ'লে বন্ধনটা আমাদের কাছে দুর্বিষহ ব'লে বোধ হ'ত; যেখানে বন্ধনেরই বোধ নেই, সেখানে তা কাটাবার চেষ্টাই বা থাকবে কি ক'রে? উল্টে কেউ যদি আমাদের সেই বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন তো আমরা প্রশ্ন করি, সে মুক্তিতে আমাদের কি সুখ? কয়েকদিন আগে কথা হচ্ছিল "সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।" 'বন্ধন মাঝে' কেন? ওর উপর বড় আকর্ষণ আছে ব'লে না কি? মুক্তির স্বাদ চাই, সে তো খুবই ভাল কথা, কিন্তু তা আবার বন্ধনের মাঝে কেন?

আমরা অনেক সময় কল্পনা করি যে, মৃত্যুর পর আমরা যে স্বর্গে যাব, সেখানে প্রয়াত আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে হবে মিলন, একটা—পারিবারিক সম্মিলনের মতো হবে। সেখানে আমাদের শত্রুরা কেউই যাবে না; সেখানে কেবল তারাই থাকবে, যাদের আমরা পছন্দ করি। আমরা যারা শাস্ত্র মানি, ভগবানকে মানি, শুদ্ধাচারী—তা সে আচার যেমনই হ'ক না কেন—এই আমাদেরই থাকবে স্বর্গে একচেটিয়া অধিকার। সাক্ষাতে এই জগৎ ভোগ করছি, আর মৃত্যুর পর কল্পিত পরজগতের

এক সোনালী স্বপ্ন দেখছি যে-জগতে এ-জগতের সব বন্ধনই সঙ্গে থাকবে।—জীবের বদ্ধাবস্থার এই হ'ল এক চরম দৃষ্টান্ত। তাই অনেক সময় আমরা ভাবি আমরা সংসারী জীব বদ্ধজীব—আমাদের কি আর কোন উপায় আছে!

ঠাকুর কিন্তু এ রকম নিরাশার কথা শুনতে ভালবাসতেন না। তাই তিনি বলছেন, "উপায় অবশ্য আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ, আর নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়, আর বিচার করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়—আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।" এই উপায়গুলির কোনটাই এমন কঠিন নয়, যে নিতান্ত সংসারী জীব তা করতে পারে না। আমাদের যে দুরবস্থা তা আমরা বুঝি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও থাকা দরকার যে, এই বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়ও আছে এবং তা আছে আমাদের হাতেরই মধ্যে। তা না হ'লে জীব তো হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

বৌদ্ধধর্ম ও গীতামত

বৌদ্ধধর্মের প্রধান কথা হ'ল 'চতুরার্য সত্য' অর্থাৎ চারটি আর্য সত্য। এর প্রথম কথা হ'ল: "সর্বং ক্ষণিকম্ ক্ষণিকম্ দুঃখম্" এই সব কিছুই অনিত্য, ক্ষণিক এবং দুঃখময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন: "অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" এই জগৎটা অনিত্য। এখন মিলিয়ে দেখি,—বুদ্ধের কথা: "ক্ষণিক", ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন 'অনিত্য'। বুদ্ধের কথা, 'সর্বং দুঃখম্', দুঃখময়; কৃষ্ণ বলছেন, 'অসুখম্'। এঁদের কথাগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই সংসার অনিত্য, আর এই অনিত্য সংসার দুঃখময়।

এখন এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? ঠাকুর বলছেন "উপায় অবশ্যই আছে।" বুদ্ধও বলছেন এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে

এবং সে নিবৃত্তির উপায় আছে মানুষেরই হাতে। এখন কেউ যদি সে উপায় গ্রহণ না করে, তা হ'লে তার জন্য দায়ী সে নিজে। এখানে 'সংসারী জীবে'র অর্থ এ নয় যে যারা বিয়ে-থা ক'রে ফেলেছে। "সংসরতি ইতি সংসারঃ!"—অর্থাৎ যারা জন্ম-মৃত্যু-পরম্পরার মধ্য দিয়ে চলেছে, তারাই সংসারী। যাদের এই চলা থেকে নিবৃত্তির কোনও চেষ্টাই নেই, তারা সংসারী জীব। ঠাকুর বলছেন, এ হেন সংসারী জীবেরও উপায় আছে। আর সেই উপায়গুলি হ'ল সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরচিন্তা, বিচার আর প্রার্থনা। প্রথম চাই সাধুসঙ্গ অর্থাৎ এমন একজনের সঙ্গ যিনি এই সংসারের জালে জড়ান-নি। বুদ্ধের জীবনে বৈরাগ্যের উদয় ঠিক এইভাবে। সিদ্ধার্থ যখন রোগ শোক জরা মৃত্যু দেখে ভাবছেন, 'এ জগতে সুখ তা হ'লে কোথায়?' ঠিক সেই সময় তাঁর চোখে প'ড়ল এক সন্ন্যাসী—এক আনন্দময় পুরুষ। এই আনন্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে তিনি এই দুঃখের হাত থেকে নিবৃত্তির সন্ধান পেলেন; আবিষ্কার করলেন 'চতুরার্য-সত্য'। তাই প্রয়োজন সাধুসঙ্গের। সাধু যিনি, তাঁর মধ্যে থাকে এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রবাহ। তাই তাঁর সংস্পর্শে যারা আসে তাদেরও জীবনে সেই ভাবের কিছুটা ছোঁয়াচ লাগে। বুদ্ধদেব এমন অজ্ঞ ছিলেন না যে, রোগ শোকের কথা তিনি কোথাও শোনেন নি। কিন্তু চোখের সামনে যখন এগুলো দেখলেন, তখন তার প্রতিক্রিয়া হ'ল অন্য রকম। ঠিক সেই রকম এ জীবন অনিত্য, দুঃখময়—এ আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গের ফলে আমাদের মনে পড়ে যায়, যে-গতানুগতিক জীবন আমরা যাপন করছি, তার বাইরে আছে এক আনন্দময় জগৎ, যার সন্ধান করাই আমাদের প্রকৃত কাম্য। তাই প্রয়োজন মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গের; 'মাঝে মাঝে' এই জন্য বলা যে আমাদের জীবনে সংসারের সংস্কার এমন বদ্ধমূল যে এক আধবার সাধুসঙ্গে সে মূলটাকে সরানো যায় না। তাই মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করতে হয়;

করতে করতে মনের ভিতর একটা চেতনার সৃষ্টি হয়, নবজাগরণ আসে, আমরা বুঝতে পারি—আমরা জেগেও কি ভয়ানকভাবে ঘুমন্ত ; আর তখনি জাগে একটা আকাঙ্ক্ষা, তীব্র ব্যাকুলতা, নতুন আনন্দময় জগতে চোখ মেলে চাইবার জন্য।

ছয়

কথামৃত—১।১।৯-১০

ঠাকুরের সহজ ও গভীর ভাব

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করছেন। মাস্টারমশায়ের ঠাকুরকে এই চতুর্থবার দর্শন। কাজেই ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হয়েছে ; কিন্তু ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে তখনও তাঁর সম্যক্ পরিচয় হয়ে ওঠেনি। তিনি ঠাকুরকে সমাধিস্থ অবস্থায় দেখেছেন, দেখেছেন ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে, গভীর তত্ত্বকথা সরলভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলতে—সে এক-রকম দৃশ্য। আবার মাস্টারমশাই ঠাকুরকে দেখছেন ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি করতে, যেন তাদের সমবয়সী। সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। তাই মাস্টারমশাই ভাবছেন যে, আগের তিনবারের দর্শনে যে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, ইনি যেন সে রামকৃষ্ণ নন। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছিল—"ইনিই কি তিনি ?" আমাদের অনেকের ধারণা যে, যাঁরা ধর্মকথা বলেন, তাঁরা থাকবেন সবসময় গভীর চিন্তামগ্ন, আর তাঁদের ভিতরে এমন একটা গাম্ভীর্য থাকবে, যা ভেদ ক'রে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁদের কাছে পৌঁছানো দুঃসাধ্য।

এ হ'ল সব জায়গায়, সব দেশে সাধকদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণা। যেখানে এর ব্যতিক্রম হয়, সেখানে লোকে ভাবে 'এ আবার কি!' পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজীকে সাধারণ মানুষের মতো হাসিতামাসা করতে দেখে কোনও ভক্ত অবাক হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন এ সম্বন্ধে। উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন "We are the children of Bliss. Why should we be morose and gloomy ?"—আমরা হচ্ছি আনন্দের সন্তান; আমরা বিমর্ষ হবো কেন? স্বামীজী এ-কথা বলতে পেরেছেন, কেননা ঠাকুরের গড়া 'বিবেকানন্দ' তিনি।

ঠাকুর যখন সাধারণ ভূমিতে থাকতেন, তখনও তিনি ছিলেন সদানন্দময় পুরুষ। আনন্দ তাঁর চারদিকে যেন প্রবাহিত হ'ত। আর সেই আনন্দ তিনি করতেন সাধারণ ভূমিতে নেমে এসে সামান্য সাধারণ কথা নিয়েও। যেমন এখানে মাস্টারমশাই দেখলেন ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি-ক'রে আনন্দ করতে। ঠিক এই রকম ভাবের এক দৃষ্টান্ত আমরা পাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন থেকে। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে। সেখানে তাঁকে দর্শন করবার জন্য এক ভক্ত তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে গেছেন, মহাপুরুষ দেখাবেন ব'লে। তাঁরা এসে দেখেন মহারাজ ছোকরাদের নিয়ে হাসি-তামাসা করছেন। ভক্তটি ভাবছেন হায়! মহারাজ কিছুই সৎ-প্রসঙ্গ করছেন না। তাঁর বন্ধুটি না জানি কি ভাবছেন। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁরা বিদায় নেবেন, তখন মহারাজ তাঁদের বললেন হাসতে হাসতে, "ওগো, আমাদের আবার ভাল কথাও হয়।" রাস্তায় নেমে ভক্তটি ভাবলেন যে, বন্ধুটি বোধহয় খুব হতাশ হয়েছেন। কিন্তু বন্ধুটি বললেন "ভাই, আধ্যাত্মিক জীবনে মহাপুরুষেরা কি বোধ করেন, তা আমরা জানি না। কিন্তু আজ কএ নতুন জিনিস দেখলাম, দেখলাম এক আনন্দময় পুরুষকে।" মহারাজ

কোন উপদেশ না দিয়েও সেই নবাগত বন্ধুটির মন যে কি ক'রে জয় করলেন, তা তিনিই জানেন।

যে ছক-বাঁধা রাস্তায় মহাপুরুষেরা চলবেন ব'লে আমরা মনে করি, সে রাস্তায় তাঁরা সব সময় চলেন না। তাঁদের ধারা আলাদা। ঠাকুরের জীবনেও এই ধারা দেখে কে বলবে যে ইনি এত সৎপ্রসঙ্গ করেন। ঠাকুর ছেলেদের সঙ্গে যে ফচকিমি করতেন, কোন সময় তা হয়তো শ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। ঠাকুর হেসে বলতেন "মাঝে মাঝে একটু আঁশজল দিতে হয়।" তা সে তিনিই জানেন বৈদ্য তিনি, কি দিতে পারেন, কি দেওয়া উচিত, কতখানি দেওয়া উচিত—তিনিই বোঝেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ধারণা করা কঠিন। মাস্টারমশাইও তাই তাঁকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও চিহ্নিত ভক্তগণ

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে দেখে বলছেন "ঐরে! আবার এসেছে!" তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের চিনতেন। মাস্টারের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ঠাকুর নানাভাবে তাঁদের পরীক্ষা করতেন। মাস্টার-মশাইকে বলছেন "আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? আমাকে তোমার কি রকম মনে হয়?" এ প্রশ্ন তাঁর সব অন্তরঙ্গদের ক'রে তিনি জেনে নিতেন; তাঁরা তাঁকে কতখানি ধারণা করতে পারলেন। ঠাকুর আবার কাকেও কাকেও দেখে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে বলেছেন "এ কি রকম জানো, যেন অনেকদিন পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এক নিকট আত্মীর সামনে এসে পড়লে মানুষ অবাক হয়ে যায়···ঠিক সেই রকম যখন দেখি, কোন অন্তরঙ্গ পার্ষদ আসছে, যাকে আর পূর্বে দেখিনি; প্রথম দর্শন, সে জানে না, আমিও যেন তার সম্বন্ধে জানতুম না, হঠাৎ তাকে দেখে অবাক হয়ে

ও-রকম লাফিয়ে উঠি।” এ-কথাটা তিনি বললেন ব’লে লোকে জানল, না জানালে জানবার কোন উপায় ছিল না। তিনি সব সময় নবাগত ভক্তদের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ, তা প্রকাশ করতেন না। হয়তো পরে প্রসঙ্গক্রমে বলতেন। যেমন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে তাঁর যে-সম্বন্ধ এই কয়দিন দর্শনেও ঠাকুর তার উল্লেখ করেননি। এখনও পর্যন্ত মাস্টার-মশাইকে বলেননি যে তিনি তাঁর পার্ষদ, অর্থাৎ তিনি এসেছেন তাঁর কাজের সহকারী হবার জন্য।

অবশ্য স্বামীজীর সম্বন্ধে অন্য কথা। স্বামীজীর জন্য তিনি কতদিন ধ’রে প্রতীক্ষা ক’রে রয়েছেন। তাই দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন আর নিজেকে আবৃত ক’রে রাখতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করছেন। স্বামীজী কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই যে তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে সম্বন্ধ, এ-সম্বন্ধ তাঁর জানা আছে, কিন্তু যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাদেরও জানা দরকার। যেমন ভগবান অর্জুনকে বলছেন ঃ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।

—হে অর্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হয়ে গেছে—তোমার, আমার কথা দুটি পাশাপাশি ক’রে বললেন যে, “সংবদ্ধভাবে তুমি আমার সহকারীরূপে বহুবার এসেছ।” “তানি অহং বেদ সর্বাণি”—আমি সেগুলি সব জানি ; কিন্তু তুমি তা জানো না। ঠিক এইরকমভাবে তাঁর পার্ষদদেরও তিনি চিনে নিয়েছেন, জেনেছেন যে অন্যের মতো কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তারা আসেনি, তারা এসেছে তাঁর এই বিশ্ব-কল্যাণ-কার্যে সহায় হবার জন্য, ভগবানের লীলা-সহচররূপে। ঠাকুর বলেছেন “তোমাদের এটুকু জানা দরকার, তোমরা কে, আমি কে, আমার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ”—এই হলেই হয়ে গেল। এই দিব্য

জন্ম এবং কর্ম। এটুকু জানলেই তাদের হয়ে গেল। তাদের আর কিছুই জানতে হবে না। যদি কিছু সাধনা তিনি করিয়ে নেন, সে কেবল এই জ্ঞানটুকুর উন্মেষের জন্য যে তাঁদের সামনে যিনি তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর, দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন জীবের কল্যাণের জন্য, আর ঈশ্বরের সেই কাজের সহকারী হিসাবে এসেছে তারা।

এরপর আমরা দেখি পট পরিবর্তন হচ্ছে। এত যে হাসি-তামাসা হচ্ছিল, সব বন্ধ হ'ল। কথা উঠল হনুমানের রামদাস হনুমান। বললেন "দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধনমান দেহসুখ কিছুই চায় না কেবল ভগবানকে চায়। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে যাচ্ছেন হনুমান, মন্দোদরী কত প্রলোভন দেখাচ্ছেন অস্ত্রটি ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু কোন প্রলোভনই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারল না। রামের কাজের জন্য তাঁর আসা; রাম ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। এই গান গাইতে গাইতে আবার সমাধি, নিশ্চল, নিস্পন্দ। মাস্টারমশাই আগে যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক সেই রকমটি দেখছেন। তখন ভাবছেন যে "এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি করছিলেন।"

শ্রীম-কে যন্ত্ররূপে গঠন

সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত দৃশ্য, দুটি বিপরীত স্বভাব; দেখে মাস্টারমশাই অবাক হচ্ছেন। এর পর ঠাকুর মাস্টারমশাই ও স্বামীজীকে ইংরেজীতে একটু তর্ক করতে বললেন। কিন্তু মাস্টারমশাই বলছেন, "তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় একরকম বন্ধ।" ঠাকুর এক সময় মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন "বলো, আর বিচার ক'রব না।" এইভাবে তিনবার বলিয়ে নিলেন। কারণ এ-পথ মাস্টারের জন্য নয়। তিনি ঠাকুরের ভাব যেমন দেখছেন, কোন রকম পরিবর্তন না ক'রে পরিবেশন করবেন। তার ভিতর একটুখানিও অদল বদল করা চলবে না। মাস্টারকে পরীক্ষা

ক'রে দেখেছেন। বলেছেন, "আচ্ছা, আমি কি বলেছিলাম?" মাস্টারমশাই জানালেন। ঠাকুর বললেন "হ'ল না। ও-কথা নয়, এই বলেছিলাম।" এইরকমভাবে সংশোধন ক'রে দিচ্ছেন, যাতে তাঁর কথাগুলি ঠিক ঠিকভাবে পরিবেশিত হয়। তাই ঠাকুর মাস্টারমশাইকে দিয়ে 'তিন সত্যি' করিয়ে নিলেন। তাই মাস্টারমশায়ের তর্কের ঘর বন্ধ। ঠাকুর একবার এক বালকভক্ত সুবোধকে মাস্টারমশায়ের কাছে যেতে বলেছিলেন। তিনি ভাবলেন মাস্টার তো গৃহস্থ লোক। তাঁর কাছে আর ধর্মোপদেশ নিতে যাব কি? ত্যাগময় জীবন গ্রহণ করবেন ব'লে বোধহয় সুবোধের একটু অভিমান ছিল। তাই ঠাকুর যখন আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ব'লে উঠলেন, "তিনি গৃহস্থ লোক; তাঁর কাছে আবার ধর্মকথা শুনতে যাব কি?" ঠাকুর হেসে বললেন, "না রে, যাস"। ঠাকুরের কথা রাখার জন্য তিনি মাস্টারমশায়ের কাছে গেছেন। মাস্টারমশাই শুনলেন যে, সুবোধ তাঁর কাছে এসেছেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে। শুনে মাস্টারমশাই বললেন "আমার কাছে একটা জালাতে আমি গঙ্গাজল ভরে রাখি। যখন কেউ আসে, তখন সেই জালা থেকে একটু একটু ক'রে পরিবেশন করি!" ভাব এই যে, এই উপদেশের মধ্যে তাঁর নিজস্ব কিছু নেই। ঠাকুরের কথা তাঁর মনেতে ভরে রেখে দিয়েছেন সেই জালা ভরে রাখার মতো। এই থেকে বোঝা যায়, কেন ঠাকুর মাস্টারমশাইকে এত ক'রে বিচার করতে বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন, বিচারের ঘর তাঁর নয়।

ঠাকুরের গান শুনে মাস্টারমশাই মুগ্ধ। যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরা বলতেন, একবার তাঁর গান শুনলে আর অন্যের সুর ভাল লাগে না। কাজেই ঠাকুরের গানে মুগ্ধ মাস্টারমশাই আবার গান হবে কিনা খোঁজ নিচ্ছেন। ঠাকুর তাঁকে বলরামবাবুর বাড়ীতে যেতে বললেন, সেখানে গান হবে। মাস্টারকে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দেওয়ার এ যেন এক উপলক্ষ। এর মধ্যে আমরা ঠাকুরের প্রচারকার্যের ধারার একটু পরিচয় পাই। তিনি যখন যেখানে গেছেন, যাঁদের জন্য গেছেন, তাঁদের ঠিকই খবর দিয়েছেন। যে বিশিষ্ট ভাবধারা তিনি জগৎকে দিয়ে যাচ্ছেন, তাকে অবিকৃত ভাবে ধ'রে রাখার জন্য কতকগুলি শুদ্ধ আধার তাঁর চাই। সেই শুদ্ধ আধারগুলিকে তিনি একসূত্রে গেঁথে রেখে যেতে চান যা পরবর্তীকালে গড়ে তুলবে এক সঙ্ঘ। তিনি স্পষ্ট ক'রে এ-কথা না বললেও তাঁর ব্যবহারে স্পষ্ট বোঝা যেত যে, একটা সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে তাঁর কাজ হচ্ছে। 'লীলাপ্রসঙ্গে' তাঁর জীবনের পর্যালোচনা ক'রে স্বামী সারদানন্দ দেখিয়েছেন যে ঠাকুরের জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে আমরা হয়তো সবসময় তার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারব না, কিন্তু ভাল ক'রে তলিয়ে দেখলে বেশ বুঝতে পারব যে বিশেষ যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য তিনি একটা সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছেন ; যদিও তিনি তা ক'রে গেছেন এ বিষয়ে অবহিত না হয়ে, কেবল মায়ের হাতের যন্ত্র হিসাবে।

ভাবের প্রচার

কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ ধর্মান্বেষীর কাছেই নয়, যাঁরা তথাকথিত ধর্মবিমুখ তাঁদের কাছেও তিনি যাচ্ছেন এবং যাচ্ছেন অনাহূতভাবেই। তখনকার দিনে যাঁরা বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে দেখা করা তাঁর চাইই। এই আগ্রহ যাঁর তিনি নিজে হয়তো জানেন না এর কারণ, কিন্তু এ ছিল তাঁর যুগোপযোগী ভাবধারা সঞ্চারিত করার এক পন্থা। তিনি চাইতেন, তাঁর ভক্তেরা সকলে মিলে একত্র হয়ে ভগবৎ-প্রসঙ্গ নিয়ে নাচে গানে আনন্দের হাট বসাক, আর তৈরী করুক এক উচ্চ আধ্যাত্মিক সুর, যা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে ছড়াবে চারদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের এমনভাবে তৈরী করছেন যাতে তাদের ভিতর দিয়ে তাঁর ভাবধারা অবিকৃতভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকে। তাঁদের তিনি বলছেন, "দেখ তোমরা অন্য কোথাও যেও না, তোমরা কেবল এখানেই আসবে।" আশ্চর্য কথা। আকাশের মতো সীমাহীন যাঁর উদারতা, তাঁর মুখে এ-রকম কথা কেন? তার কারণ, তা না হ'লে তাঁরা অবিকৃতভাবে তাঁর ভাবধারা প্রকাশ করতে সমর্থ হবেন না।

তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর অজ্ঞাতসারে জগন্মাতার বিধানে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, আর তা হচ্ছে এক সুনির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধভাবে। তিনি নিজে হয়তো এ-সবের কিছুই জানেন না; আর জানেন না বলেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেত এক শিশুসুলভ সরলতা। অথচ আর এক দিক দিয়ে তিনি সকলের গুরু-স্থানীয়, সকলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দেখছেন ও নিয়ন্ত্রিত করছেন। অথচ এই মানুষটিই আবার কত সহজ, সরল, শিশুর মতো অসহায়, যেন আমাদের সাহায্য ছাড়া তিনি দাঁড়াতেও পারেন না। মথুরবাবু তাই মনে করতেন যে তাঁর মতো অভিভাবক একজন বাবার বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে কে এই অসহায় শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণ করবে? আবার এই অসহায় শিশুর কাছেই মথুরের মতো দুর্দান্ত জমিদার আত্মনিবেদন ক'রে বলছেন, "বাবা রক্ষা করো।" এই দুটি বিপরীত ভাবে আমরা অনেক সময় সামঞ্জস্য করতে পারি না, যেমন সামঞ্জস্য করতে পারি না মাস্টারমশায়ের দেখা ঠাকুরের দুটি চিত্রের। এক দিকে গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, অপরদিকে ছোটছেলেদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই মতো হাসি-তামাসা করছেন। একদিকে সকলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ন্ত্রণ করছেন, অন্যদিকে নিতান্ত অসহায় শিশুর মতো ব্যবহার করছেন। এই বিপরীত ভাবের সম্মিলন যা মাস্টার-মশাই দেখলেন, এ হ'ল লোকোত্তর পুরুষ, অবতার-পুরুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য।

সাত

কথামৃত—১।২।১-৩

এই খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদটি বর্ণনা-বহুল।

ঠাকুরকে ষ্টীমারে নিয়ে বেড়াবার জন্য কেশব সেন এসেছেন। ঠাকুরও যাচ্ছেন নৌকোয়। মাস্টারমশাই এই দৃশ্যটির বর্ণনা দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছেন গঙ্গার বর্ণনা, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বর্ণনা, নীল আকাশের বর্ণনা, সর্বোপরি সকল সৌন্দর্যের উৎস যিনি সেই শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা। এই পরিবেশে কেশবের সঙ্গে ঠাকুরের মিলন হবে, মাস্টারমশাই তাই দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব—উভয়ের বিপরীত ভাব

বাংলার শিক্ষিত যুবসমাজ তখনকার দিনে ছিল কেশবের গুণমুগ্ধ। কেশব তাঁর বিদ্যাবত্তা, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা এবং সর্বোপরি তাঁর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার মধ্য দিয়ে যে নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন—এই সব কিছু দিয়ে তিনি তখনকার নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই শিক্ষিত যুব সমাজেরই একজন ছিলেন মাস্টারমশাই। তাই খুবই স্বাভাবিক-ভাবে তিনি কেশবের সঙ্গে ঠাকুরের তুলনা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, এই দুটি মহাপুরুষের ভিতর মিলনের যোগসূত্রটি কোথায়। তিনি ভাবছেন, কেশব ঠাকুরকে কি দেখে ভক্তি করছেন; আর ঠাকুরই বা কি দেখে কেশবের প্রতি এত আকৃষ্ট। দুজনের জীবনধারা তো সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত। কেশব শিক্ষিত, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দৃষ্টিতে দেখলে প্রায় নিরক্ষর; ঠাকুর মূর্তিপূজা করেন আর এই

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই কেশবের প্রচার ; ঠাকুর সনাতন-পন্থী, তিনি তিথি নক্ষত্র প্রাচীন পূজা-পদ্ধতি সবকিছুই মানেন, যা না মানাই হ'ল কেশবের অনুসৃত ধর্মের রীতিনীতি। কেশব গৃহস্থ আর ঠাকুর— সন্ন্যাসের কোন চিহ্ন ধারণ না করেও সন্ন্যাসীদের আদর্শ। আবার ঠাকুর প্রাচীন সন্ন্যাসী যাকে বলে তাও নন, কারণ তাঁর জটা-জূট নেই গায়ে ভস্ম নেই, উপরন্তু পায়ে জুতো আছে, এমন কি মোজাও মাঝে মাঝে পায়ে দেন। সুতরাং প্রাচীন দৃষ্টিতে ঠাকুর হয় অত্যন্ত শৃঙ্খলাবিহীন, নয় অত্যন্ত প্রগতিশীল। মোট কথা প্রাচীনপন্থীদের কাছে তিনি মোটেই আকর্ষণীয় নন ; আবার নবীনদের কাছেও তিনি বড় পিছিয়ে রয়েছেন। শিক্ষায় পিছিয়ে, ভাষার পারিপাট্যে পিছিয়ে, বেশভূষায় পিছিয়ে। জামা পরেন বটে, তবে কিরকমভাবে পরবেন তার ঠিক নেই ; কাপড় যদিও পরেন তো সেই কাপড় কোমরে থাকবে কি বগলে থাকবে, তার ঠিক নেই ; কাজেই এ-রকম লোককে নিয়ে সমাজে সকলের সঙ্গে চলাফেরা করা যায় না। আর এই জন্যই তো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেও খবর পাঠিয়ে তাঁকে আসতে বারণ করেছিলেন। এই তো হ'ল তাঁর তখনকার সমাজে স্বীকৃতি। এ হেন ঠাকুরের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কেশব কি এমন দেখলেন আর ঠাকুরই বা কেশবের প্রতি, যিনি তখনকার দিনে সনাতনপন্থীদের দৃষ্টিতে প্রায় বিধর্মী, কি দেখেই বা এত আকৃষ্ট হচ্ছেন। যাই হ'ক কেশব সেনের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা আমরা জানি ; এবং এই ঘনিষ্ঠতা এত নিকট যে তিনি ওঁদের জাহাজে সাদরে গৃহীত হয়েছেন। এখন তিনি ব্রাহ্মভক্তদের দৃষ্টিতে ঠাকুরকে দেখবেন, আবার ঠাকুরের দৃষ্টিতেও দেখবেন ব্রাহ্মভক্তদের কি-রকম দেখায়। এই কৌতূহল নিয়ে তিনি এসেছেন, দেখছেন, বর্ণনা করছেন।

এদিকে ঠাকুর নৌকোয় উঠেই সমাধিস্থ। ঠাকুরের মনের কথা

তিনি খুলে বলেননি, তাই আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি যে, তাঁর হয়তো সেইসময় মনে পড়েছিল কেশবের কথা ; ধর্মাত্মা কেশব, ভক্ত কেশব, ঈশ্বরানুরাগী কেশবের কথা, আর সেই পথ অনুসরণ ক'রে মনে পড়েছে শ্রীভগবানের কথা, তাই তিনি সমাধিস্থ। ব্রাহ্মভক্তেরা উপভোগ করছেন এই দেব-দুর্লভ দৃশ্যটি। ভগবানের কথা চিন্তা ক'রে মানুষ কতদূর তন্ময় হয়ে যেতে পারে যে তার দেহজ্ঞান ভুল হয়ে যায়—এটা হয়তো বইএ লেখা থাকতে পারে, কিন্তু কজন মানুষ দেখেছে এই দৃশ্য! এ তো 'দশায় পাওয়া' নয়, যা হ'ল মূর্ছা বা অজ্ঞানের অবস্থা। আমাদের বন্ধু একাধিকজন এই দশার অনুভব করেছেন ; অনেক সময় কীর্তন করতে করতে এঁদের জ্ঞানলোপ হ'ত। এঁদের যেমন বাহ্য কোন জ্ঞান থাকত না, তেমনি আন্তর জ্ঞানও থাকত না। এটা কোন অনুভূতির লোপ। সব ভাব-সমাধির সম্বন্ধে এ-কথা বলছি না, সাধারণতঃ আমাদের চোখে যা পড়ে, তার কথাই বলছি। এত কথা বললাম এইজন্য যে, আমাদের এ-সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকা দরকার, কারণ তা না হ'লে আমরা একটা বাহ্য সাদৃশ্য দেখে সাধনপথের এক অনুন্নত অবস্থাকে একটা উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা ব'লে ভুল করতে পারি। কিন্তু ঠাকুরের অবস্থা অন্য রকম। আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত তিনি ; আনন্দ তাঁর চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর তাঁর মুখে সেই আনন্দেরই প্রতিফলন।

যাই হ'ক অতি সন্তর্পণে তাঁকে জাহাজে তোলা হ'ল। চলতে পারছেন না ; ইন্দ্রিয়েরা কোনও কাজ করছে না। কোন রকমে তাঁকে কেবিনে বসানো হ'ল, চারদিকে লোকের হুড়োহুড়ি। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হ'য়ে তাঁর প্রথম কথা হ'ল—"মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব।"

ঠাকুর এই রকম কশাঘাত ক'রে কথা আরও অনেকবার বলেছেন,

অনেক জায়গায়। কিন্তু এই কশাঘাতে আমাদের দ্বেষভাব উৎপন্ন হয় না, কারণ যিনি এই কশাঘাত করছেন, তিনি আমাদের প্রতি অপার করুণাসম্পন্ন। আমরা যে-রকম ভয়ানকভাবে ঘুমন্ত, এই রকম কশাঘাত না করলে আমাদের ঘুম ভাঙবে কি ক'রে? আমরা জানি একদিকে তিনি তিক্ত সমালোচনা করছেন, অন্যদিকে আবার আমাদের জন্য রয়েছে তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি আর কল্যাণ-চিন্তা, যে কল্যাণ-চিন্তায় তিনি নিজের মুক্তি পর্যন্ত তুচ্ছ ক'রে দিয়ে মাকে বলছেন, 'মা আমায় বেহুঁশ ক'রে দিসনি, আমি এদের সঙ্গে কথা ব'লব।" যে সমাধি-অবস্থা লাভের জন্য মুনি ঋষি যোগীরা জন্মজন্মান্তর ধরে সাধনা ক'রে চলেছেন, সেই অবস্থাকে তিনি তুচ্ছ করছেন জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য। তাই ঠাকুর যখন বলছেন যে, "মা, আমি কি এদের বেড়ার মধ্য থেকে রক্ষা ক'রতে পারব?" তখন তাঁর ভাব এই যে 'মা আমায় শক্তি দে, সামর্থ্য দে, যাতে আমি এদের এই বেড়া ভেঙে মুক্ত করতে পারি।'

এরপর একজন ভক্ত বললেন, "পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।"

ঠাকুর হেসে বললেন "খোলটা?"

ঠাকুরের সমাধি-মূর্তি ও ফটো

ফটোগ্রাফ যাঁর, তাঁর আদর্শের স্মারক হিসাবে যদি ফটোগ্রাফ থাকে তো অন্য কথা; আর যদি এটা ঘরের অন্যান্য সরঞ্জামের একটা হয়ে দাঁড়ায় তো সে-ফটোগ্রাফ রাখার কোন সার্থকতা নেই। এ-কথা তিনি পওহারী বাবাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলছেন না, এ-কথা বলছেন সাধারণকে উদ্দেশ্য ক'রে। ফটোগ্রাফের পেছনে যে তত্ত্ব আছে, যে আদর্শ আছে, আমরা যদি সেই তত্ত্বকে, সেই আদর্শকে গ্রহণ ক'রে ফটোগ্রাফকে সেই দৃষ্টিতে দেখি তবেই তাতে ফুল দেওয়া, তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো সার্থক

হয় ; নচেৎ ওটা মাত্র একটা ছবি হয়েই থাকবে, যা আমাদের কোন দিনই কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

আমরা জানি, এক সময় তাঁর যে-ছবি এখন ঘরে ঘরে পূজো হচ্ছে, সেই ফটোগ্রাফ দেখে ঠাকুর নিজেই প্রণাম করেছিলেন। বলেছিলেন যে, "একদিন এই ছবির ঘরে ঘরে পূজো হবে।" এটি একটি উচ্চ যোগের অবস্থা। তিনি চিনেছিলেন। আমরা কি সেই দৃষ্টিতে দেখে, চিন্তা ক'রে ঐ ফটোগ্রাফকে আমাদের আধ্যাত্মিক পথে এগোবার উপায় ব'লে পূজো করি? যদি তা করি, তবেই সে পূজো হবে সার্থক, নচেৎ সব বৃথা। "এই খোলটা" বলার মধ্য দিয়ে ঠাকুর যেন সেই ভাবই প্রকাশ করতে চাইছেন। তাই তো আমরা দেখি যে, যে-ঠাকুরের কাছে সমস্ত শরীর অতি তুচ্ছ ছিল, সেই ঠাকুর তাঁর সমাধিস্থ অবস্থার ছবি দেখে নিজে অভিভূত হ'য়ে প্রণাম করেছেন—এই ব'লে যে, কালে "ঘরে ঘরে এর পূজো হবে।" তাঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী যে কতদূর সফল হয়েছে, আজ তার প্রমাণ আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থল

ঠাকুর বলেছেন, "তবে একটি কথা আছে, ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান, তাঁর বৈঠকখানা"। ঠাকুর এই কথাটি খুব জোর দিয়ে বলছেন যে, সংসারে সব অনিত্য, সন্দেহ নেই ; আবার সেই অনিত্য বস্তুর ভিতরেও কোথাও কোথাও দেখা যায়—তাঁর বিশেষ প্রকাশ। অনিত্য বস্তু ব'লে সমস্ত জগৎকে যদি তুচ্ছ ক'রে দিই, তা হ'লে আমাদের তাঁকে ধরবার যে যোগসূত্র, তা ছিন্ন হ'য়ে যাবে। তাঁকে আমরা এই জগতের ভিতরে না ভেবে বাইরে কোথাও ভাবব—এ কথা আমরা ভাবতে পারি না। আমাদের চিন্তার রাজ্যে আমরা তাঁকে ভাবি যে, তিনি এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন অথবা তিনি আমাদের হৃদয় মধ্যে

বিরাজ করছেন। জগৎকে আমরা অনুভবের বিষয়রূপে দেখেছি, বলছি এই জগতে তিনি নিজে ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছেন। আবার আমরা এও বলছি যে তিনি অন্তরে রয়েছেন, 'তদন্তরস্য সর্বস্য'—তিনি এই সমস্তের ভিতরে রয়েছেন, আবার তিনি "বাহ্যতঃ" বাইরেও রয়েছেন। এখন এই বাইরে বলতে কতদূর? তার সীমা আমরা জানি না। বাহির আর ভিতর তবে কি দৃষ্টিতে? একটা কোন সীমাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে পারি, তার ভিতর আর বাহির। দেহটাকে একটা সীমা ধরলাম; ধ'রে বললাম তিনি এই দেহের ভিতরে আছেন, আবার বাইরেও আছেন। এই জন্য সাধকেরা বলেছেন, ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর প্রকাশ। তিনি সর্বত্র আছেন, কিন্তু "ভক্ত-হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা" অর্থাৎ সেখানে তিনি বিশেষভাবে আছেন। এখন এই বিশেষভাবে আছেন মানে কি? তিনি কি সেখানে আরও জমাটভাবে রয়েছেন? ভগবান এ-রকম কোন বস্তু নন, যাঁকে জমাট ক'রে দেওয়া যায় এক জায়গায়, আর তরল ক'রে দেওয়া যায় অন্য জায়গায়। সর্বত্র তিনি আছেন; সমস্ত বিশ্ব বা তার বাইরে তিনি যেমনভাবে আছেন একটি ধূলিকণার মধ্যেও তিনি তেমনিভাবে আছেন। কিন্তু তবু আমাদের প্রশ্ন হয়, কোথায় তাঁকে ধ'রব? তাই আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য বলছেন যে, যদি ধরতে হয় তো এমন স্থান আছে, যেখানে তাঁর প্রকাশ বেশী। তাঁর 'সত্তা' বেশী, এ-কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে তাঁর 'প্রকাশ' বেশী, আর তা হ'ল ভক্ত-হৃদয়ে। তাই তাঁকে অনুভব করতে হ'লে আমাদের সেই ভক্ত-হৃদয়েই অন্বেষণ করতে হবে, যেখানে তাঁর সান্নিধ্য আমরা সহজে বুঝতে পারি। তা না হ'লে তিনি সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে থাকলে. সেই বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি সেই আমার কি লাভ হবে সেই বিশ্বব্যাপীকে নিয়ে, যাকে আমরা না পারি ধরতে, না পারি ছুঁতে, না পারি ধারণা করতে। আমার প্রয়োজন এমন কিছু, যাকে আমি ধরতে পারি, ছুঁতে

পারি, অনুভব করতে পারি। তাই ঠাকুর আমাদের নাগালের মধ্যে তাঁর সন্ধান দিয়েছেন, আর তা হ'ল ভক্ত-হৃদয়।

জ্ঞানী ও ভক্ত

এর পর ঠাকুর বলছেন ভাগবতের কথা—"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলেন।" বলা বাহুল্য, কথামৃতে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলতে অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজের ভক্তদের বোঝায়, তাঁরা কিন্তু ঠিক জ্ঞানীর পর্যায়ে পড়েন না। তাঁরা ভক্ত। ঠাকুর এ-কথা অন্যত্র অন্যভাবে বলেছেন যে, জ্ঞানী মানে যাঁরা বিচার ক'রে তত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করেন, আর ব্রাহ্মভক্তেরা ভগবানকে আস্বাদন করবার চেষ্টা করেন তাঁর গুণের ভিতর দিয়ে। সুতরাং তাঁরা নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। তাঁরা চান এমন ভগবানকে যে-ভগবানের ভিতর দয়া আছে, স্নেহ আছে, আছে মায়া মমতা, যাঁকে আমরা পিতা বা মাতা ব'লে সম্বোধন ক'রে তৃপ্তি পাই। আমরা এ-রকম ভগবানকে চাই, যিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, আমাদের মুক্তির পথে নিয়ে যান। ব্রহ্ম এ-সব কিছুই করেন না। তা হ'লে ব্রহ্মকে ভাবা কেন? অদ্বৈত বেদান্তবাদী যাঁরা, তাঁরা তা হ'লে ব্রহ্মের কথা কেন বলেন? ব্রহ্ম তাঁদের কি কাজে লাগবে? তাঁরা বলেন, ব্রহ্মকে কাজে লাগানো নয়, প্রয়োজন হ'ল ব্রহ্মকে জানা। এই জানা যদি হয়, তখন আমরা বুঝতে পারব, এই যে সুখদুঃখাদি আমরা ভোগ করছি, এটা আমাদের অজ্ঞানবশতঃ হচ্ছে। আমাদের স্বরূপ হ'ল সেই পরব্রহ্ম, যিনি সকল প্রকার সুখদুঃখের অতীত। মানুষ সেখানে ব্রহ্ম হবে, অর্থাৎ যা কিছু তার ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধক, তা দূর হ'য়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, ভক্তের ভাব কিন্তু এ-রকম নয়। সে চিনি হ'তে চায় না, চিনি

খেতে ভালবাসে। সে তাঁকে আস্বাদন করতে চায়—মাতারূপে, পিতা-রূপে, বন্ধুরূপে, আত্মীয়-পরিজন প্রভৃতি বিভিন্নরূপে। এখন সেই আস্বাদনের জন্য তাঁর রূপ কল্পনা করা হবে কিনা, সেটা এখানে গৌণ। ব্রাহ্মভক্তেরা রূপ কল্পনা করছেন না, কিন্তু আস্বাদন আকাঙ্ক্ষা করছেন। সুতরাং তাঁরা ভক্ত। এই দৃষ্টিতে দেখে ঠাকুর কেশব সেনের মধ্যে দেখছেন একটি ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়, যেখানে ভগবানের জন্য আছে ব্যাকুলতা, আছে আন্তরিকতা। আর এই হ'ল কেশবের সঙ্গে ঠাকুরের মিলনের সেই যোগসূত্র, মাস্টারমশাই যার খোঁজ করছিলেন এই খণ্ডের প্রথমাংশে।

আট

কথামৃত—১।২।৪

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব

কেশব সেন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে স্টীমারে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যেতে এসেছেন। সঙ্গে বহু ভক্ত। ঠাকুর নৌকোয় ক'রে স্টীমারে উঠবেন। নৌকোয় উঠেই সমাধিস্থ! অনেক কষ্টে একটু হুঁশ এনে তারপর তাঁকে স্টীমারে তোলা হ'ল। তখনও ভাবস্থ। ক্রমে তাঁকে নিয়ে ক্যাবিনের মধ্যে বসানো হ'ল। ভক্তেরা সকলেই তাঁর কাছে থাকতে চান, যাতে তাঁর প্রত্যেকটি কথা তাঁরা শুনতে পান। যিনি যেমন পারলেন ভিতরে বসলেন। সকলের স্থান হ'ল না। অনেকেই বাইরে থেকে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাঁর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ—সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য!

সমাধি ভঙ্গ হ'লে ভাবস্থ ঠাকুর অস্ফুটস্বরে বললেন, 'মা, আমায়

এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?' ঠাকুর কি ভাবে এ-কথা বললেন, তা তিনিই জানেন। মাস্টারমশাই সেখানে মন্তব্য করছেন যে, সম্ভবতঃ ঠাকুর এই বলছেন যে, এই সব জীবেরা মায়ার বেড়ার ভিতরে আবদ্ধ; তাদের কি সেখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে?—যেন জগন্মাতার কাছে তাঁর এই প্রশ্ন, এই আকুতি। তারপর ঠাকুর একই বস্তুকে যে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বলেন, সে-কথা সবিস্তারে বললেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেগুলি আমরা আলোচনা করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ করছেন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ—অবিরল ধারায়। ভক্তেরা শুনছেন। শ্রীম বলছেন, ভক্তেরা সেই অমৃত-পানে এতই তন্ময় যে, স্টীমার যে চলছে, তা তাঁদের খেয়ালই হচ্ছে না। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের যে কথামৃত-ধারা বইছে, তা পানেই মত্ত!

বেদান্তমত, ব্রাহ্মমত ও তন্ত্রমত

ঠাকুর প্রথমেই বলছেন, 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জীব-জগৎ—এ সব শক্তির খেলা।' ব্রাহ্মভক্তদের সামনে তিনি রয়েছেন, কাজেই উল্লেখ করলেন, 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা' ব'লে। আগে ব্রাহ্মদের 'ব্রহ্মজ্ঞানী' শব্দে অভিহিত করা হয়েছে; তাই 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা' বললেন। কেশবের যাঁরা অনুচর, 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে খ্যাত, তাঁরা কিন্তু 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী' নন, অর্থাৎ তাঁরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক নন। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে তাঁরা স্বীকারও করেন না। তাঁরা নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের ভজনা করেন। নিরাকার নির্গুণ তত্ত্বকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। যখনি তা সগুণ, তা সাকারই হোক বা নিরাকারই হোক, তাকে আর 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় না, বলা হয়, 'ঈশ্বর'। ব্রাহ্ম ব্রহ্মবাদীরা সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আর

বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী। তাই বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীদের ব্রাহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানীদের থেকে পৃথক্ ক'রে ঠাকুর বলছেন, 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জীবজগৎ— এ-সব শক্তির খেলা। বিচার ক'রতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু ; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।'

এইখানেই বেদান্তমত এবং তন্ত্রমতের পার্থক্য। তন্ত্রমতে শক্তিকে মিথ্যা বলে না। ব্রহ্ম যেমন সত্য, শক্তিও তেমনি সত্য। ব্রহ্ম আর শক্তি—দুটি পৃথক্ বস্তু বলেও বলা হয় না। একই তত্ত্ব—দুই রূপে অভিব্যক্ত। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তখন তাঁকে 'শক্তি' বলা হয়। আর যখন সৃষ্টি-স্থিতি আদি ক্রিয়া করছেন না, তখন তাঁকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়। সুতরাং তন্ত্রমতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, শক্তিও তেমনি সত্য। তবে দুটি সত্য হওয়ায় দ্বৈতাপত্তি হ'ল কিনা ? তন্ত্র বলেন, দ্বৈতাপত্তি হয় না। কারণ, ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন—একই তত্ত্ব। কিন্তু বেদান্তবাদীরা বলেন, 'শক্তি মিথ্যা (অনির্বাচ্যা) ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।' এই হ'ল বেদান্তমত আর শাক্তমতের পার্থক্য।

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ

তারপর ঠাকুর বলছেন, 'কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।' যে-অবস্থায় কোন ক্রিয়ার বোধ থাকে না, জগতের বোধ থাকে না, সেই অবস্থাকে বলছেন 'সমাধিস্থ' অবস্থা। সেই অবস্থায় সাধক শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যান বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জগতের বোধ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি'-বোধ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই। ঠাকুর এই কথাই বলছেন, "···হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা

করছি'—এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়।" —এই ব'লে ঠাকুর এই দুটি অভিন্ন বস্তুরই গ্রহণ যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, এ-কথা বলেছেন। ঠাকুরের এই কথাটি বেদান্ত-দর্শনের দিক দিয়ে যেন একটি নতুন ধারার কথা। যদিও ঠিক নতুন বলা চলে না, বলা যায়—বেদান্ত-দর্শনে শক্তির আপেক্ষিক সত্তা মাত্র স্বীকৃত, কিন্তু ঠাকুর সেই শক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যতক্ষণ আমরা শরীর-মনে আবদ্ধ ততক্ষণ শক্তির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়—দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয় —এ-কথা তিনি বারংবার বলেছেন।

আপেক্ষিক সত্তা বলার উদ্দেশ্য : যতক্ষণ আমরা ব্রহ্মকে কারণ-রূপ বলছি, ততক্ষণ তিনি শক্তিস্বরূপ। কারণ-রূপ যিনি, তিনিই হলেন শক্তির স্বরূপ ; আর যখন তাঁকে কার্য-কারণের অতীত বলি, তখনই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। যখন তাঁকে জগৎ-কারণ বলি, অর্থাৎ 'ঈশ্বর' বলি, সেও শক্তিরই রাজ্যের কথা। বেদান্তশাস্ত্রে যেখানে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তাকে ব্রহ্মরূপে বলা হয়েছে, মনে রাখতে হবে—সেই ব্রহ্ম কিন্তু শুদ্ধব্রহ্ম নন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।' (তৈ. উ. ৩।১)—যাঁর থেকে এই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাঁর দ্বারা এই সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাঁতে এই সকলের লয়, তাঁকে বিশেষভাবে জানতে চাও, তিনিই ব্রহ্ম। এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মের কথা বলা হ'ল, ইনি শক্তিরূপী ব্রহ্ম। এখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিরাকার সত্তা ব'লে বলা হ'ল না। নির্গুণ যখন, তখন আর সৃষ্টি আদি ক্রিয়া হয় না। ত্রিগুণাত্মিকা যে প্রকৃতি, যে প্রকৃতি ব্রহ্মাভিন্না—সাংখ্যের [illegible] নন, কারণ তন্ত্রে তাঁকে 'জড়া' বলা হয় না—এমন যে প্রকৃতি, [illegible] ন শক্তি, তিনিই

আদ্যাশক্তি, তিনিই কালী। তিনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী। তাঁকেই পরমেশ্বরী বা পরমেশ্বর বা জগৎকারণ ব্রহ্ম বলা হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিতে মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর পর্যন্ত শক্তির মধ্যে, শক্তির বাইরে নন। ঠাকুর বলছেন যে, "আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি— এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।"

তোতাপুরীর নতুন দৃষ্টি

আমাদের মনে রাখতে হবে তোতাপুরী ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, সাক্ষাৎ অদ্বৈত তত্ত্বের তিনি অপরোক্ষ অনুভব করেছিলেন। এই সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ ঠাকুর বার বার এ-কথা বলেছেন। সেই তোতাপুরীও এই ভ্রমে পড়েছিলেন যে, শক্তি মিথ্যা। শক্তির সত্যতা তিনি স্বীকার করেননি দীর্ঘকাল ধ'রে। পরে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষকালে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে সেই জগন্মাতাকে, আদ্যাশক্তিকে। বুঝতে পারা যায়, ঠাকুরের একটি অপূর্ব শক্তি ক্রিয়া করেছিল এই ব্যাপারে, যার ফলে চূড়ান্ত অদ্বৈত-বাদী যে তোতাপুরী, তিনিও শক্তিকে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠাকুরেরও তাতে কতই না আনন্দ—তোতাপুরী অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও শক্তিকে মেনেছেন! এই যে শক্তিকে মানা—এটি হচ্ছে যেন অদ্বৈতবেদান্তী যে তোতাপুরী, তাঁরও জ্ঞানের পূর্ণতা। প্রশ্ন হবে, তোতাপুরীর কি তা হ'লে জ্ঞানের অভাব ছিল? না, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন তিনি। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর পূর্ণ ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রহ্মের যে কত রকমের বৈচিত্র্য হ'তে পারে, তাঁর স্বরূপের ভিতর যে বৈচিত্র্য কল্পনা করা যায় শাস্ত্র বলেছেন, সে-সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন না, এ-কথা বোঝা যায়। তিনি তাঁর সাধনের ধারায় এই ভাবটিকে একেবারে যেন উপেক্ষা করেই সিদ্ধি

লাভ করেছেন। সুতরাং শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সচেতন থাকার কোন কারণ ছিল না। যখন কোন একটি সাধন-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তখন সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে যে-রকম অবহিত হওয়া সম্ভব হয়, মাত্র শাস্ত্রের সাহায্যে সে-রকম অবহিত হওয়া যায় না। তাই তোতা-পুরীর শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ হ'ল ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে।

প্রথমে কিন্তু ঠাকুরের এই ভাবটি যেন তিনি বুঝতেই পারছেন না। আমরা জানি, তিনি ঠাকুরকে যখন সন্ন্যাস দিতে চেয়েছেন, ঠাকুর বলছেন, 'দাঁড়াও আমি মাকে জিজ্ঞেস্ করি।' মন্দিরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস ক'রে এলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বেদান্ত সাধন ক'রব।' তোতাপুরী একটু হাসলেন—বেদান্ত সাধন করবেন, তার জন্য তিনি গেলেন মাকে বলতে, মন্দিরের ভিতর পাষাণময়ী প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করতে! তোতাপুরীর কাছে দেবী পাষাণময়ী মাত্র। তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব তিনি জানতেন না, জানার প্রয়োজনও কখনও বোধ করেননি। সেই তোতাপুরী ক্রমশঃ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে অনেক বিষয় ঠাকুরের কাছ থেকে শিখেছেন। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, একদিন বিকালে পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর কাছে বসে ধর্মপ্রসঙ্গে ক্রমে সন্ধ্যা হওয়ায় ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে লাগলেন। তোতাপুরী অবাক—উপহাস ক'রে বললেন, 'আরে কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো?' ঠাকুর হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন, তোতাপুরী ঠাট্টা করছেন, হাত চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে রুটি তৈরী ক'রছ কেন?—যদিও তিনি জানেন ঠাকুর অসাধারণ দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মেছেন, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে; তবু তোতাপুরী ভাবছেন, ঠাকুর তাঁর পূর্বের সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পারছেন না, এখনও সেই সংস্কারের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তাই হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন। ঠাকুর

হেসে বলছেন, 'দূর শালা, আমি ভগবানের নাম করছি, আর তুমি কিনা ব'লছ রুটি ঠুকছি।' তোতাপুরী উপহাস করলেও ঠাকুর জানতেন, সময় আসবে যখন তোতাপুরী এ-সব সাধনকে স্বীকার করবেন। ঠাকুর তাই ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছিলেন, যেমন তাঁর সন্তানদেরও ধৈর্য ধ'রে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যখন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছায় অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থ প'ড়ে বলেছিলেন, 'মুনিঋষিদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, তা না হ'লে এমন সব কথা লিখলেন কি ক'রে?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুই ঐ কথা এখন নাই বা নিলি, তা ব'লে মুনি-ঋষিদের নিন্দে করিস্ কেন?' ঠাকুর ধৈর্য ধ'রে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছিলেন। তারপর একদিন যখন নরেন্দ্রনাথ 'ঘটি বাটি ঈশ্বর!' ব'লে ব্যঙ্গ করছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ ক'রে অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সব সন্দেহ নিরসন ক'রে দেন। তোতাপুরীর ক্ষেত্রেও ঠাকুর জানতেন; তিনি দ্বৈতভাবে উপাসনার কথা পরে বুঝবেন; এবং বাস্তবিকই তোতাপুরীকে তা পরে বুঝতে হয়েছে।

এই যে বিভিন্ন প্রকারে ভগবানের সত্তার উপলব্ধি, এ জিনিসটি সম্বন্ধে আমরা গোড়া থেকে অবহিত না হ'লে পরে আমাদের অবহিত হ'তে হবে, অন্ততঃ যাঁরা আচার্য হবেন, তাঁদের এবং যাঁর জীবনে এ-রকমের বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে আসে, তাঁর জীবনই আচার্য হিসাবে পূর্ণ বলতে হবে। 'আচার্য হিসাবে' এই জন্য বলছি যে, সব সাধকদেরই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে যাবার দরকার হয় না। একজন সাধক কোন একটি প্রণালী অবলম্বন ক'রে যদি চরম তত্ত্বে পৌঁছতে পারেন, তাঁর জীবনের পক্ষে তাই যথেষ্ট, তাতেই তাঁর পূর্ণ সার্থকতা। কিন্তু যাঁরা আচার্য হবেন, যাঁরা জগতের সকলকে পথ দেখাতে এসেছেন, তাঁদের ঐভাবে আংশিক দৃষ্টি নিয়ে চললে হবে না। কারণ তা হ'লে তাঁরা মাত্র ঐ রকম মনোভাব-সম্পন্ন কতকগুলি লোককেই সাধন-জগতে

সাহায্য করতে পারবেন। বহু লোক তাঁদের পরিধির বাইরে প'ড়ে থাকবে। এইজন্য ঠাকুর বলেছেন, নিজেকে মারতে হ'লে একটা নরুনই যথেষ্ট; কিন্তু অপরকে মারতে গেলে অর্থাৎ অপরের সঙ্গে যদি লড়তে হয়, তা হ'লে ঢাল তরোয়াল দরকার হয়। ঠিক সেই রকম যাঁদের আচার্য হ'তে হবে তাঁদের ঠাকুর যেমন বলেছেন, সব ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে তবে ঘুঁটিকে পাকাতে হবে। তাঁদের একদিক দিয়ে চলে গেলে হবে না; পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা পেতে হবে। সেই পূর্ণ অভিজ্ঞতা দেবার জন্য, তোতাপুরীর ঐ যে অনভিজ্ঞতা ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে, তা দূর করবার জন্য ঠাকুর হেসে বললেন, আমি ভগবানের নাম করছি আর তুমি কিনা উপহাস ক'রে ব'লছ আমি রুটি ঠুকছি। ক্রমশঃ তোতাপুরী সেই ভাব পেলেন এবং তারপরে আমরা জানি, কিভাবে তিনি জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর গুরু

আমাদের এখানে জানতে হবে যে, অবতারপুরুষ যদিও তাঁর সাধন-পথে কোন কোন ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করেন, সেই গুরুরা কিন্তু তাঁর মতো পূর্ণ হন না। অবতারের সান্নিধ্যে এসে, তাঁর সহায়তায় তাঁরা ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, এ-কথা মনে রাখতে হবে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এ-কথা তোতাপুরীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একদিকে যেমন তোতাপুরী শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, তেমনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীও আবার অদ্বৈত-বেদান্ত সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। আমরা জানি ঠাকুর যখন তোতাপুরীর সহায়তায় অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা করতে যাচ্ছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, 'বাবা, ও-সব অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে অতো মেশামিশি ক'র না; তোমার ভাব ভক্তি তা হ'লে শুকিয়ে যাবে, ওদের

সঙ্গে মিশলে ভক্তির হানি হবে।' সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর যেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তেমনি তোতাপুরীরও দ্বৈতভাবে সাধনা সম্বন্ধে, শক্তি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ভৈরবীও তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ঠাকুরের সম্পর্কে এসে বাড়িয়েছিলেন এবং তোতাপুরীও তাঁর জ্ঞান আরো বেশী সমৃদ্ধ করেছিলেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে, শক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে।

ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নতা সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন ঃ "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ;—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না ; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

'শক্তি-শক্তিমতোঃ অভেদঃ' এই কথা বলা হয়। শক্তি এবং শক্তিমান্—এ দুটি অভিন্ন। একই বস্তু—তার একটি দিককে লক্ষ্য ক'রে আমরা বলি 'শক্তি' ; তারই আর একটি দিককে লক্ষ্য ক'রে বলি 'শক্তিমান্'। শক্তির যে বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের পশ্চাতে একটি নিরপেক্ষ সত্তা আছে, যে সত্তার ভিতর কোন পরিবর্তন ঘটছে না। এ-রকম একটি সত্তা যদি না মানা যায়, তা হ'লে শক্তির যে বৈচিত্র্য, তাও বোঝা যায় না। একটি স্থায়ী সত্তাকে মানতে হয়। সেই স্থায়ী সত্তার বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্তিগুলিকেও স্বীকার করতে হয়।

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

দার্শনিকেরা অভিব্যক্তিগুলিকে দু-রকমের ব'লে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, ব্রহ্মের পরিণাম ; অন্যেরা বলেন, ব্রহ্মের বিবর্ত। আসল

কথা এই যে, পরিণামই বলি বা বিবর্তই বলি, এগুলি কথার কথা মাত্র। কারণ পরিণাম যাঁরা বলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ পার্থক্য দেখে পরিণাম বলছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিবর্তিত হচ্ছেন, বলছেন। অপরপক্ষে অদ্বৈত-বেদান্তবাদীরা বলেন, যা কিছু পরিণাম প্রাপ্ত হয় তা নশ্বর, তা নিত্য হ'তে পারে না। ব্রহ্মের যদি পরিণাম হয়, তো ব্রহ্ম কখনও নিত্য হ'তে পারেন না, অনিত্য হ'য়ে যান। সুতরাং তাঁতে আর ব্রহ্মত্ব থাকে না। এই দোষের জন্য যে পরিণামের প্রতীতি হচ্ছে, সেই পরিণামকে বাস্তব না ব'লে তা প্রতীতি মাত্র, তাঁরা এই কথা বলেন ; এবং তার জন্য একটি দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ করেন, যাকে বলে 'বিবর্ত'। বিবর্তবাদে তত্ত্ব পরিবর্তিত হয় না। পরিণামবাদে তত্ত্ব পরিবর্তিত হয়। যেমন একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

'সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদীর্যতে॥

অর্থাৎ তত্ত্ব পরিবর্তিত না হ'য়ে—তত্ত্ব এক থেকে যদি তার বহুধা প্রতীতি হয়, তা হ'লে তাকে বলে 'বিবর্ত'; আর যদি তত্ত্ব পর্যন্ত পরিবর্তিত হ'য়ে যায়, তাকে বলে বিকার বা পরিণাম। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, দুধ পরিবর্তিত হ'য়ে, পরিণাম প্রাপ্ত হ'য়ে দই হয়। দুধটা আর দুধ থাকে না, দই হ'য়ে যায়। একে বলা হয় বিকার বা পরিণাম। আর বিবর্তের দৃষ্টান্ত : একটি দড়ি আছে। সে দড়িটি কখনো সাপ কখনো লাঠি, কখনো মালা, কখনো জলধারা, কখনো বা জমিতে ফাটল ব'লে মনে হচ্ছে। এই যে বহু প্রকারে তার প্রতীতি, সেই প্রতীতিগুলির ফলে দড়িটি বাস্তবিক বদলে যায় না। দড়িটি যেমন দড়ি, তেমনি থাকে। একে বলে বিবর্ত।

আমাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মের এই বৈচিত্র্য—তা বিবর্তই হোক বা পরিণামই হোক, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, কারণ আসল কথা

হচ্ছে, শব্দের অতীত বস্তুর শব্দ দিয়ে আমরা একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছি মাত্র, কিন্তু সমর্থ হচ্ছি না।

শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হয়েও বহুরূপে প্রতীত হচ্ছেন ; তাঁর সেই বহুরূপে প্রতীত হবার যে শক্তি, তাকেই বলা হয় অচিন্ত্য-শক্তি ; তাকেই বলা হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী শক্তি। ব্রহ্ম যেমন অচিন্ত্য, তাঁর শক্তিও তেমন অচিন্ত্য ; কারণ এই শক্তিকে আমাদের বুদ্ধির দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। যেমন ব্রহ্মকে পরিমাপ করতে পারি না আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, তেমনি তাঁর শক্তিকেও পরিমাপ করতে পারি না। এই জন্য দুই-ই আমাদের তর্কের অতীত হ'য়ে যায় এবং সেখানে আমরা এই দুটি তত্ত্বের পার্থক্য ভাবতে পারি না। কাজেই বলি দুটি এক, অভেদ। যেমন ব্রহ্ম তর্কাতীত, তেমনি তাঁর শক্তিও তর্কাতীত। সুতরাং দুটি তর্কাতীত বস্তুকে আমাদের তর্কের সাহায্যে বিভিন্ন করা সম্ভব নয় ব'লে তাঁদের আমরা অভিন্ন বলছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ও ব্যাখ্যা

সেই ব্রহ্মাভিন্ন ব্রহ্মশক্তি কখনও সক্রিয়, কখনও নিষ্ক্রিয়। 'কখনও' বলতে সময়ের কথা নয় ; কারো কাছে কোন অবস্থায়, এই বুঝতে হবে। 'কখনও' নিষ্ক্রিয় বলতে কারো কাছে, কারো কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি নিষ্ক্রিয়। আবার সেই ব্যক্তিরই কাছে অন্য অবস্থায় তিনি সক্রিয়। এই দুটি অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়, ব্রহ্ম অথবা শক্তি— ঠাকুর এই কথাই বুঝাচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন, যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তখন তাঁকে 'শক্তি' বলি, আর যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি আদি কিছুই করছেন না, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। এই 'যখন' আর 'তখন' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। এদের তাৎপর্য কিসে? সময়েতে তাৎপর্য কি? তা যদি হয়, তা হ'লে ব্রহ্মের এই যে শক্তির প্রকাশ, তা কালের দ্বারা

অবচ্ছিন্ন, কালের দ্বারা পরিমেয় হ'য়ে যাবে। কিন্তু কালের দ্বারা এর পরিমাপ হয় না। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে সাধকের অবস্থাবিশেষে প্রতীতির তারতম্যের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ 'যখন' মানে—যে অবস্থায়; 'তখন' মানে—সে অবস্থায়। এই ভাবে বললে বোধ হয় স্পষ্ট হবে।

কেন এই কথা বলছি আমরা? জগতের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে, জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, স্থিতি হচ্ছে, লয় হচ্ছে। কিন্তু এই ধারণা অতিশয় সীমিত। যে জগৎটাকে আমরা উপলব্ধি করছি, সেই জগৎ সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা। কিন্তু এই রকমের অনন্ত জগৎ যে নেই, তা আমরা কি ক'রে বলতে পারি! ঠাকুর বলেছিলেন, 'জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয়, জানো? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে।' তাই আমাদের কাছে দেশ-কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে জগতের প্রতীতি হচ্ছে, সে-রকম অনন্ত জগৎ আছে। যখন এক জগতে প্রলয় হচ্ছে, অন্য জগতে তখন হয়তো সৃষ্টির ধারা চলছে, যদিও একে বলা হয় খণ্ড প্রলয়, আর এর থেকে তফাৎ করা হয় মহাপ্রলয়কে। মহাপ্রলয় মানে যখন কোথাও সৃষ্টি থাকে না। কি ক'রে জানব, কোথাও সৃষ্টি থাকে কিনা? কে বলতে পারে, সমস্ত সৃষ্টির লোপ হয়েছে কিনা? কেউ পারে না। সুতরাং ঐ দিক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা না ক'রে সাধকের অনুভবের ভিতর দিয়ে এই জিনিসটিকে বুঝতে হবে।

সাধক শক্তির এলাকাধীন

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অর্থ কি? না, কার্য কারণে লয় হয়। কার্য স্থূল বস্তু, তা সূক্ষ্মে লয় হয়; সূক্ষ্ম—কারণে লয় হয়। কারণ—মহাকারণে লয় হয়। এই যে লয় হওয়া, এটা কোন কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যাপার নয়। এটা অবস্থার পরিচ্ছেদ মানলে, বলতে পারি, যে অবস্থায়

আমাদের কাছে স্থূল জগতের প্রতীতি হচ্ছে না, সে অবস্থায় স্থূল জগৎ সূক্ষ্মে লয় পেয়েছে। মনের যে অবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের প্রতীতি হচ্ছে না, সে অবস্থায় সূক্ষ্ম জগৎ কারণে লয় পেয়েছে। মনের যে অবস্থায় কারণেরও সত্তার প্রতীতি হচ্ছে না, সে অবস্থায় কারণ মহাকারণে অর্থাৎ কারণাতীত সত্তায়, যাকে 'তুরীয়' বলা হয়, তাতে লয় পেয়েছে। কারণাতীত সত্তা আছে বলেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের ক্রমবিকাশ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং আমাদের বাদ দিয়ে, অর্থাৎ দ্রষ্টা বা অনুভব-কর্তাকে বাদ দিয়ে, স্বতন্ত্ররূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অবস্থাকে লক্ষ্য করবার দরকার নেই। সেইজন্য বেদান্ত বলেন যে, এ-সব সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কথা যা শাস্ত্রে রয়েছে, তা কেবল আমাদের অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছে দেবার উপায় মাত্র। 'মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টি র্যা চোদিতান্যথা। উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥' (মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।১৫) এই যে মৃত্তিকা (ছা. উ. ৬।১।৪), লোহমণি (ছা. উ. ৬।১।৫) বা বিস্ফুলিঙ্গের (মু. উ. ২।১।১) দৃষ্টান্ত দিয়ে সৃষ্টির কথা নানাভাবে বলা হয়েছে, এ কেবল সেই ব্রহ্মজ্ঞানের অবতারণা করবার জন্য, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বুদ্ধিতে আরূঢ় করাবার জন্য, এর আর অন্য কোন তাৎপর্য নেই; আসলে ব্রহ্মে কোন ভেদই নেই। কারণ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় অথবা স্থূল সূক্ষ্ম কারণাবস্থার কোন বাস্তব সত্তা নেই। এ-কথা ঐ মাণ্ডুক্যকারিকায় বলা হয়েছে। তা যদি হয়, তা হ'লে জগৎকারণতা পর্যন্ত আমাদের এই জগৎ-অনুভূতিকে অপেক্ষা ক'রে, একে আধাররূপে ধ'রে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জগৎ-স্রষ্টা অবধি কল্পনা রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'শক্তির এলাকা'র মধ্যে। যতদূর পর্যন্ত সাধনার স্তর চলতে পারে, ততদূর পর্যন্ত শক্তির এলাকা। আর যদি কেউ সাধনার সমস্ত স্তর অতিক্রম ক'রে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, ব্রহ্মসংস্থ হন, তিনি শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যান।

আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সেই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন স্তরের অপেক্ষা আছে। বিভিন্ন ধাপ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা শেষে লক্ষ্যে উপনীত হই। প্রত্যেকটি ধাপ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। তা না হ'লে ছাতে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যখন ছাতে উঠেছি, তখন সিঁড়িগুলিকে অবাস্তব বলারও কোন সার্থকতা নেই। সেগুলি ছিল ব'লে আমাদের ছাতে ওঠা সম্ভব হয়েছে। শক্তির এলাকা আছে ব'লে আমরা শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারি, হওয়া সম্ভব। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে শুদ্ধ ব্রহ্মের আর কোন সার্থকতা থাকত না। কে তাঁকে জানত? তিনি স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত থাকতেন। আর আমরা তাঁর যে সব ব্যাখ্যা করছি, জগৎ-কারণ ইত্যাদি ব'লে, সে সবই অর্থহীন হ'য়ে যেত। কারণ, আমাদের এই সব কথা নির্ভর করছে শক্তির উপরে।

ঠাকুর বলছেন: 'ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।'

ব্রহ্ম ও শক্তি ; নিত্য ও লীলা

'শক্তি' আর 'ব্রহ্ম' শব্দ দুটি বললেন, তার পরেই শব্দ পরিবর্তন ক'রে বলছেন, 'লীলা' আর 'নিত্য'। লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না, নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে ভাবা যায় না। লীলা মানে পরিবর্তন। পরিবর্তন মানেই তার পিছনে একটি অপরিবর্তিত সত্তা আছে, তা না হ'লে কার অপেক্ষায় পরিবর্তন হবে? এইজন্য 'পরিবর্তন' শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আসছে আর একটি তত্ত্ব, যা অপরিবর্তনশীল। সেটি পটভূমিকাতে রেখে তার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা পরিবর্তনকে অনুভব করি। তা না হ'লে পরিবর্তন ব'লে কোন বস্তু থাকত না। আমরা একটি ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি। সেই ট্রেনটা যেমন চলছে, ঠিক তেমনি যদি

চারিপাশের মাটি, গাছপালা, ঘরবাড়ি চলতে থাকত তা হ'লে ট্রেনটার চলা বোঝা যেত না। 'ট্রেনটা চলছে', এই বাক্যেরও প্রয়োগ হ'ত না। কারণ, সব দৃশ্যটি একই রকম থাকত। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, আমরা ট্রেনে বসে আছি, গাছপালাগুলোকে দেখছি স্থান পরিবর্তন করছে, ঘরবাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে, তখনি আমরা বুঝতে পারি একটা পরিবর্তন। পরিবর্তনের ভিতর কোন্‌টা স্থায়ী, কোন্‌টা অস্থায়ী, সেটা পরের কথা। আমরা বলছি যে, কোন একটা স্থায়ী বস্তুকে লক্ষ্য না ক'রে, অস্থায়ী বস্তুকে, পরিবর্তনকে আমরা ভাবতে পারি না। আবার অস্থায়ী বস্তুকে লক্ষ্য না ক'রে কোন একটা স্থায়ী বস্তুকেও কল্পনা করতে পারি না। কারণ, স্থায়ী আর অস্থায়ী এমন দুটি শব্দ— অর্থসঙ্গতির জন্য পরস্পর এমন ভাবে জড়িত যে, একটিকে ছেড়ে আর একটিকে ভাবা যায় না। অস্থায়ীকে ছেড়ে স্থায়ীকে ভাবা যায় না, স্থায়ীকে ছেড়ে অস্থায়ীকে ভাবা যায় না।

নিত্য আর লীলাও ঠিক সেই রকম। ভগবানের এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-লীলা চলছে, এই লীলার মানে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কল্পনাই করতে পারব না, যদি একটি স্থায়ী বস্তুকে—নিত্য বস্তুকে লক্ষ্য না করি। কাজেই নিত্যকে বাদ দিয়ে লীলাকে ভাবা যায় না। আবার লীলাকে বাদ দিয়ে নিত্যকে ভাবা যায় না, যেমন আগে বলেছি। সুতরাং শক্তিকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না ; ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে শক্তিকেও ভাবা যায় না। দুটি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ—এমন অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন এই দৃষ্টিতে।

তবে অনেক সময়ে আমরা ঐ দৃষ্টির একটুখানি যেন দার্শনিক সামঞ্জস্য না রেখে বলি যে, এই যে পরিবর্তন, এটি মিথ্যা ; অপরিবর্তনীয় যেটি, সেইটিই সত্য। কারণ, আমাদের জাগতিক অনুভব থেকে আমরা

জানি, যা কিছু পরিবর্তনশীল, তাই অনিত্য। কিন্তু এই পরিবর্তন, এই লীলা যদি প্রবাহাকারে নিত্য হয়, তাতে আমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে! সেটা যে অসম্ভব, এমনও আমরা বলতে পারি না। আসল কথা, যে সীমিত গণ্ডীর ভিতর আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আমাদের যুক্তি তার উপরেই আধারিত ; তার বেশী আমরা ভাবতে পারি না। সেইজন্য শাস্ত্র বলছেন, 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ'—যে সব বিষয় চিন্তার অতীত, তাদের তর্কের সাহায্যে তুমি নির্ণয় করতে যেও না ; কারণ, তাতে বিভ্রান্ত হবে। তর্ক যেখানে পৌঁছতে পারে না, সেখানে আমরা তর্ককে প্রয়োগ করি। এটা তর্কের অপপ্রয়োগ। তর্ককে আমরা অস্থানে প্রয়োগ করছি। ফলে তর্ক সেখানে ব্যাহত হয়। শাস্ত্র তাই বলছেন যা অচিন্ত্য, তাকে তর্কের দ্বারা সংযুক্ত করতে যেও না। ব্রহ্ম এবং শক্তি দুই-ই অচিন্ত্য, কারণ জগতের সূক্ষ্মতম যে তত্ত্ব, তাকেই যদি শক্তি বলি, সেই শক্তির স্বরূপকে আমরা ভাবতে পারি না। আবার দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত যে বস্তু, তাকেও আমরা চিন্তা করতে পারি না। কাজেই তর্কের দ্বারা যদি তত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করি—তা সম্ভব হবে না। সুতরাং যুক্তির সাহায্যে শক্তিকে মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত করার প্রয়াস অপপ্রয়াস মাত্র।

শক্তি সত্য কি মিথ্যা?—এই প্রশ্ন একটি কূট দার্শনিক প্রশ্ন মাত্র। তর্কের দ্বারা এর মীমাংসা হয় না। অনুভবের ভিত্তিতেই এর মীমাংসা হ'তে পারে। ঠাকুর অনুভবের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বলছেন, শক্তি আর ব্রহ্ম—দুই-ই সত্য। বলছেন, আসলে দুটি বস্তু নয়। শক্তি যাঁকে বলি, ব্রহ্ম তাঁকেই বলি। কেবল দুটি বিভিন্ন অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে আমরা দুটি নাম দিচ্ছি, আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য। আসলে এ দুটি পৃথক্ বস্তু নয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি ; যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। এই দুয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। এই দুয়ে দ্বৈতসৃষ্টি হচ্ছে না।

দুটি আলাদা জিনিস নয়। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বুদ্ধিতে যেমন প্রতিভাত হয়, সেই রকম ক'রে বলি ব্রহ্ম অথবা শক্তি। যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তখন বলি 'শক্তি'। আর যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন না, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। ঠাকুর এই কথা বললেন এখানে এমন সহজ ক'রে যাতে আমাদের অনায়াসে বোধগম্য হয়। তিনি এভাবে না বললে ঝুড়ি ঝুড়ি শাস্ত্র পড়েও এই সাধারণ কথা ধারণা করা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

কালীতত্ত্ব

ঐ কথাই ঠাকুর আবার বলছেন: "আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি",—'এই কথা যখন ভাবি' শব্দগুলি লক্ষণীয়, এর ব্যাখ্যা আমরা আগেই করেছি—"তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন", অর্থাৎ করেন ব'লে ভাবি—"তখন তাঁকে 'কালী' বলি, 'শক্তি' বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ। যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'।"

যেমন যেমন আমাদের অভিজ্ঞতা, তেমন তেমন আমরা এক-একটি নাম দিই। 'কালী' বলি বা 'আদ্যাশক্তি' বলি বা 'ব্রহ্ম' বলি, যখন যে-রকম আমাদের বুদ্ধির দৌড় বা দৃষ্টিকোণ সেই অনুসারে বলি মাত্র। তাতে তত্ত্বের প্রভেদ হ'য়ে যায় না। এ-কথাটি এখানে বোঝালেন, 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'র দৃষ্টান্ত দিয়ে। জলকে যদি 'ওয়াটার' বলা হয়, বস্তুটি ভিন্ন হ'য়ে যায় না। আমাদের ভাষার পার্থক্য হয় মাত্র। কেউ জল বলি, কেউ ওয়াটার বলি, কেউ পানি বলি। কেন বলি?—না, আমরা যেমন শিখেছি, আমাদের যেমন সংস্কার, যেমন আমরা অভ্যস্ত, তেমনি

ভাবে শব্দ প্রয়োগ করি। যখন আমাদের সংস্কার অনুযায়ী আমরা দেখি তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন, তখন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁকে বলছি 'শক্তি'। আর যে অবস্থায় আমরা নিষ্ক্রিয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সেই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে বলছি 'ব্রহ্ম'। শব্দগত ভেদ মাত্র। তত্ত্বগত কোনই ভেদ নেই। এ-কথা খুব জোর দিয়ে ঠাকুর বলছেন এখানে।

তার পরের কথা। কেশব বলছেন—"কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।"

কেশব শুনেছেন সে-সব কথা ঠাকুরের কাছে। তারই পুনরাবৃত্তি করাতে চান, আবার শুনবেন, অপর ভক্তদের শোনাবেন, কথাটি আরও আস্বাদন করবেন—এই উদ্দেশ্যে। আগেই আমরা মনে রাখব, ঠাকুর কালী বলতে কি বলছেন। রামপ্রসাদেরও এই ভাবের একটি কথা আছে—'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'—কালী আর ব্রহ্ম, এ দুটি ভিন্ন নয়, এই জেনেছি। জেনে 'ধর্মাধর্ম' অর্থাৎ সব রকমের উপাধি পরিত্যাগ ক'রে আমি নির্বিশেষ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। অথবা আর এক জায়গায় বলছেন,…'মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে / সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে'—যাঁকে আমি মাতৃভাবে আরাধনা করি, তাঁকে আর ব্যাখ্যা ক'রে সকলের সামনে কি প্রকাশ ক'রব? ইঙ্গিতে বলছি, বুঝে নাও। ভাব হচ্ছে এই, যাঁকে আমি 'মা' বলি, 'কালী' বলি, 'শক্তি' বলি বা বিভিন্ন দেবদেবীরূপে বর্ণনা করি, আসলে তিনি সেই ব্রহ্ম—এ-কথা কি আর বেশী খুলে বলতে হবে!

শক্তি-এলাকার পারে

তা'হলে আমরা দেখলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাধনা করছেন, ততক্ষণ অর্থাৎ সেই চরম তত্ত্বে ওঠবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, তিনি শক্তির এলাকায়।

যখন তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিত, তখনই বলা যায়—তিনি শক্তির এলাকার অতীত। কিন্তু আবার যখন তিনি সাধারণ ভূমিতে ফিরে আসছেন, তখনও তিনি শক্তির এলাকায়! তাই তোতাপুরী ব্রহ্মজ্ঞ হয়েও ইচ্ছামাত্রেই নিজেকে সেই সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না, কারণ আদ্যাশক্তি মহামায়া পথ ছেড়ে দিচ্ছেন না। তোতাপুরী এ-কথা বুঝতেন না। বুঝতেন না যে শক্তিরই কৃপায় তাঁর নির্বিকল্প সমাধি। তিনি এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাই শক্তিকে মানা দরকার ব'লে তিনি মনে করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন—তাঁর ব্রহ্মাবগাহী মন বারবার চেষ্টা করেও এই ত্রিগুণের রাজ্য ছাড়িয়ে সেই তুরীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারছে না, তখন তিনি বিস্মিত হ'য়ে ভাবলেন, এ কি ব্যাপার! আমার মন তো কখনও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি। কেন এ-রকম হ'ল? যাই হোক শরীরটাই যত নষ্টের মূল মনে ক'রে স্থির করলেন শরীরটাকে ছাড়তে হবে। তখনও তিনি বুঝছেন না, শরীরটা ছাড়া বা রাখা—এতেও তাঁর স্বতন্ত্রতা নেই, এখানেও মহামায়ার রাজত্ব, শক্তির রাজত্ব। শরীর ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। বর্ণনা রয়েছে; গভীর রাত্রিতে চলেছেন গঙ্গায় রুগ্‌ণ দেহটি বিসর্জন দিতে। ধীরে ধীরে গঙ্গায় নামলেন এবং ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হলেন, কিন্তু ডুব-জল আর পাচ্ছেন না। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় অপর পারে চলে এসেছেন, তবু ডুব-জল পেলেন না। তখন তিনি অবাক হ'য়ে ভাবলেন, 'এ কি দৈবী মায়া! ডুবে মরবার জলও আজ গঙ্গায় নেই! এ কি অপূর্ব লীলা!' যখনই এই কথা মনে উঠেছে—এটা শেষ ধাপ—তখনই তাঁর জগন্মাতার সত্তার অনুভূতি হ'ল। তিনি জলে, স্থলে, দেহে, মনে—সর্বত্র সেই আদ্যাশক্তির লীলা উপলব্ধি করলেন। বুঝলেন, শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি ইচ্ছা না করলে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সামর্থ্য কারও নেই—মরবারও সামর্থ্য নেই। এবং তখনই তিনি সেই আদ্যাশক্তির বশ্যতা স্বীকার

করলেন। তাঁকে জগন্মাতারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু হ'য়ে আসার যে সার্থকতা, তা তাঁর লাভ হ'ল পরিপূর্ণরূপে। আমরা আগেই বলেছি, যাঁরা তাঁর গুরুরূপে এসেছিলেন, তাঁরাও এসে তাঁর কাছ থেকে কোন না কোন রকমে অপূর্ণতা দূর ক'রে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তোতাপুরীর এই পূর্ণতা লাভ আমরা এখানে দেখছি। 'জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা / বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।' (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৫৫-৫৬)—দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। 'জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি'—কাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। শরীরধারী মাত্রকে, তা তিনি যত বড় জ্ঞানীই হ'ন না কেন, মহামায়া ইচ্ছামতো নিজের হাতের পুতুল ক'রে ব্যবহার করতে পারেন। 'আমি উন্নত সাধক' ব'লে গর্ব করবার কিছু নেই। অভিমান ক'রে মাথা তোলবার কিছু নেই।

নয়

কথামৃত—১।২।৪-৫

গঙ্গাবক্ষে জাহাজে কেশব ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের অবিরাম ঈশ্বরপ্রসঙ্গ চলছে। কেশব ঠাকুরের কাছে জানতে চাইছেন মা কালী কত ভাবে লীলা করেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে—কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। তাই তাঁর নিরাকারের উপর অনুরাগ ও মূর্তিপূজার উপর বিতৃষ্ণা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর সেই একদেশী ভাব ধীরে ধীরে দূর হ'য়ে যাচ্ছে। তিনি ঠাকুরের কাছে জানতে চাইছেন—মা কালী নানাভাবে কি রকম লীলা করেন। ঠাকুর তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মহাকালী ও নিত্যকালীর উল্লেখ

ক'রে বলছেন, তন্ত্রে আছে যে মা সেখানে নিরাকারা। সৃষ্টি তখনও হয়নি। তিনি সৃষ্টির পূর্বে পূর্বসৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রেখেছিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব : ঈশ্বর ও জগৎ

বলা বাহুল্য, এখানে তন্ত্র এবং বেদান্তের অথবা বেদ-বিহিত যে সব অন্যান্য সাধন-প্রণালী আছে, তাদের একটি গূঢ় রহস্যের কথা বলছেন। সে রহস্যটি এই যে, সকলেই জানেন সৃষ্টি নিত্য নয়। তাই যা নিত্য নয় একদিন তার নাশ হবে, এবং নাশ হওয়ার পর আবার সৃষ্টি হবে কোথা থেকে? যদি বলা যায় যে তাঁর ভিতর থেকেই সৃষ্টি হবে অর্থাৎ তিনি কার্য এবং কারণ উভয়ই, তখন প্রশ্ন উঠবে: তা হ'লে তাঁর ভিতরে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তা স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে। এখন এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলে হয় অদ্বৈতহানি, আর অস্বীকার করলে হয় সৃষ্টি অসম্ভব। এইজন্য তন্ত্র এবং বেদান্তও বলে, সমস্ত জগতের যখন লয় হয়, তখন ঈশ্বর সৃষ্টির বীজগুলি নিজের ভিতর সংগ্রহ ক'রে রাখেন, এবং সেই বীজগুলি যেহেতু তাঁর স্বরূপ থেকে ভিন্ন নয়, সেইহেতু সেখানে দ্বৈতাপত্তি হয় না। আমরা যখন অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ-রচনার কথা শুনি, তখন রচনার ক্রম এই ভাবে দেখি: প্রথম হয় তাঁর হিরণ্য-গর্ভরূপে আবির্ভাব—হিরণ্যগর্ভ যেন জগৎস্রষ্টা, জগৎ সৃষ্টি করবেন এই উদ্দেশ্যে তিনি যেন একটি ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হলেন; তারপর তাঁরই ভিতর থেকে আরম্ভ হ'ল প্রথম সৃষ্টি। প্রথম তাঁর ভিতর থেকে আবির্ভাব হ'ল বেদের, বেদ মানে সমস্ত জ্ঞানের একটি সূক্ষ্মরূপ, যা তাঁর ভিতরে ভাবরূপে আবির্ভূত হ'ল প্রথমে। তার পর তিনি তাঁকে স্থূল রূপ দেবেন এবং এই স্থূলরূপেরও ক্রম আছে। এমন বলা আছে:

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ
আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

অর্থাৎ সেই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হ'ল, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী ও তারপর পঞ্চভূতাত্মক বিভিন্ন প্রকৃতি। তাঁর ভিতরে অনভিব্যক্তরূপে যে সৃষ্টি ছিল, তাঁকেই বলছেন যেন সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখা। আদ্যাশক্তি এই সৃষ্টি তাঁর ভিতর থেকে বার করেন, আবার তাঁতেই রাখেন। এই উপমা দিচ্ছেন মাকড়সার জাল সৃষ্টি দিয়ে। উপনিষদে বলেছেন "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"—যেমন ঊর্ণনাভি তার ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে, আবার সময়ে সে জালকে নিজের ভিতরে গুটিয়ে নেয়, তেমনি ঈশ্বরও তাঁর ভিতর থেকে এই জগৎকে প্রকাশিত করেন, আবার তাঁর ভিতরেই এই জগৎকে উপসংহৃত ক'রে নেন।

যাঁর ভিতর থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়, যাঁতে এই জগৎ অবস্থিত থাকে এবং অন্তে যাঁতে এই জগৎ লয় হয়, তাঁকেই আমরা বলি 'ব্রহ্ম', তাঁকেই বলি 'ঈশ্বর'। ঈশ্বরের এই সৃষ্টি কিন্তু কুম্ভকারের কুম্ভ সৃষ্টির মতো নয়। কুমোর যখন হাঁড়ি কলসী তৈরী করে, তখন সে তা নিজের ভিতর থেকে তৈরী করে না। সে তৈরী করে বাইরের কোন উপাদান থেকে। কুমোর যদি নাও থাকে, হাঁড়ি কলসীগুলোর তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। জগতের সৃষ্টি এ-রকম নয়—এ-কথা বোঝাবার জন্যই উপনিষৎ ঐ-ভাবে বললেন যে, যাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, যাঁতে এই জগতের স্থিতি এবং যাঁতে এই জগৎ লয় হবে, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম।

সুতরাং এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তাঁর থেকে যে ভাবে হচ্ছে, তাতে তিনি জগতের উপাদান-কারণও বটেন, নিমিত্ত-কারণও বটেন। হাঁড়ি কলসীর উপাদান-কারণ মাটি, নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার। কুম্ভকার আছে ব'লে মাটির এই রূপান্তর ঘটে। এখানে কিন্তু এক ঈশ্বর আছেন, আর দ্বিতীয় কিছু নেই। তিনি ছাড়া কোন উপাদান নেই, যা তিনি

রূপান্তরিত করবেন, কোন যন্ত্র নেই যার সাহায্যে রূপান্তরিত করবেন, কোন সত্তা নেই যা তাঁর সৃষ্ট এই জগতের উপাদান হবে। তাই বলছেন, তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই জগতে অবস্থান করছেন আবার তাঁতেই এই জগতের লয় হবে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—"

যাঁর থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, যাঁতে এই জগতে সত্তাবিশিষ্ট হ'য়ে থাকে এবং অন্তে যাঁতে এই জগতের লয় হয়, তিনিই হলেন সেই পরম তত্ত্ব। তাঁকে জানতে ইচ্ছা কর। এখন এই পরম তত্ত্ব এই ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়াতে তিনি উপাদান এবং নিমিত্ত উভয় কারণ। সুতরাং তাঁর জগৎ-সৃষ্টি সাধারণ কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে না। আংশিক-ভাবে তুলনা করা যেতে পারে ঊর্ণনাভির সঙ্গে, অথবা বিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে।

"যথা অগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ প্রবর্তন্তে সরূপাঃ"

যেমন অগ্নি থেকে হাজার হাজার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোয় অনেকটা সেই-রকম। অগ্নির যা তত্ত্ব স্ফুলিঙ্গেরও সেই তত্ত্ব, অথচ তারা অগ্নি থেকে ভিন্নরূপে প্রতীত হচ্ছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে জীব-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত কোথাও পুরোপুরি মেলে না, অংশতঃ সাদৃশ্য আছে মাত্র।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষের কতকটা ধারণা হ'তে পারে, ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে। ঠাকুর বলছেন, মা এই জগৎ-সৃষ্টি এইভাবে করেছেন। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে মার স্বরূপ-সম্বন্ধে বলছেন, তিনি নিরাকারা। গানে ভক্ত বলছেন: 'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি'? মুণ্ডমালা ধারণ ক'রে আছেন বরাভয়করা; সেই মূর্তি সম্বন্ধে বললেন, ব্রহ্মাণ্ড যখন ছিল না, তখন তাঁর মুণ্ডমালা কোথায় ছিল? এগুলো আমাদের দৃষ্টিতে যেন অসম্ভব, কিন্তু যিনি নিত্যা, যিনি আমাদের মন-বুদ্ধির

অগোচরা, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। এইভাবে ভক্তেরা, সাধকেরা তাঁকে দেখেছেন। গানে আছে,

"মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপে দিগম্বরী, হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে॥"

মা কালো কিনা, তা জানতে হ'লে তাঁর কাছে গিয়েই জানতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

ঈশ্বরের ইতি নেই

আমরা যখন দেখি, আমাদের দৃষ্টিকোণ যেমন, সেই অনুসারে তাঁর বর্ণ, তাঁর রূপ ধারণা হয়। কিন্তু মানুষ যখন তাঁতে লীন হয়, তখন তার ধারণা, এই সাধারণ প্রবর্তকাদি যে উপাসক, তাদের ধারণার সঙ্গে, এক হয় না। বহুরূপীকে নানা জনে নানা রঙের দেখে, কিন্তু যে গাছ-তলায় থাকে, সেই ঠিক বলতে পারে বহুরূপীর স্বরূপ কি? সে বলে যে যত রং-এ আমরা তাকে দেখি, সব রংই তার। ভক্ত বলেছেন 'চিদাকাশে যার যা ভাসে, তাই তার বোধের সীমানা'—যার মনে যে অনুভব হচ্ছে, তার বুদ্ধি সেই অনুভবটুকুর দ্বারা সীমিত হ'য়ে রয়েছে। ঠাকুর তাই বলছেন যে, তাঁর সম্বন্ধে আমরা যে যা ধারণা করি, সেটাই যে তাঁর শেষ, এ যেন আমরা কখনও মনে না করি। আমরা এই কথা মনে রাখতে পারি যে, আমি যা অনুভব করছি, তা তাঁর রূপ। কিন্তু এই রূপ ছাড়া যে তাঁর আর কোন রূপ নেই, এ-কথা যেন আমরা কখনও মনে না করি, আমরা যেন কখনও তাঁর 'ইতি' না করি।

বন্ধন ও মুক্তি

এরপর ঠাকুর আলোচনা করছেন, বন্ধন আর মুক্তির প্রসঙ্গ। ঠাকুর বলছেন, বন্ধন আর মুক্তি এ-দুয়ের কর্তা তিনি। এখন এ-কথা ভাবতে

গেলে আমাদের মনে সংশয় জাগে যে তিনি এ জগতে তা হ'লে কেন মন্দের সৃষ্টি করলেন। বন্ধনের সৃষ্টি তো না করলেই পারতেন। তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন, তা হ'লে বুড়ীর খেলা চলে না। তাঁর খেলা চালাতে গেলে ভালোর সঙ্গে মন্দকেও রাখতে হবে। বলছেন, সবাই বুড়ী ছুঁয়ে ফেললে বুড়ীর খেলা চলে কি করে? তবে যদি কেউ খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বুড়ী তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। এখন প্রশ্ন হ'ল তিনি তো খেলছেন; কিন্তু আমাদের যে এদিকে প্রাণান্ত। সেই ঈশপের গল্পের ব্যাঙেরা ছেলেদের বলেছিল—তোমাদের কাছে যা খেলা, আমাদের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার। তার উত্তরে ঠাকুর 'কথামৃতে' অনেক জায়গায় ব'লে দিয়েছেন যে তোমরা যারা 'প্রাণে মরছি' ব'লছ, সেই তোমরা কারা? তিনি ছাড়া আর কেউ কি? যদি তিনি নিজেই কখনও চোখ বেঁধে, কখনও চোখ খুলে ঘোরাঘুরি করেন তো কারও ওপরে কি অত্যাচার করা হয়? ঠাকুর বলছেন 'হে রাম, তুমি নিজের দুর্গতি নিজে করেছ। যেখানে তিনি বন্ধনের মধ্যে থাকছেন, সেখানে তিনি নিজেই কষ্ট ভোগ করছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ-রকম নিজের কষ্ট নিজে ডেকে আনা তো মূর্খেরাও করে না। তার উত্তর হচ্ছে এই যে, মূর্খেরও যে বুদ্ধি আছে, তা কি তাঁর নেই! তিনি সে বুদ্ধি প্রয়োগ করেন না। তাঁর যা বুদ্ধি, তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। বুঝতে না পেরে আমরা বলি, তাঁর লীলা, এবং এই লীলার সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলার তুলনা ক'রে বলি "লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যং" —যেমন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলাঘর তৈরী করছে, ভাঙছে আবার গড়ছে, ঠিক সেই-রকম তিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। আসল কথা তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এ জগতে আমি একাই আছি; আমি

ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? সুতরাং তিনি ছাড়া যখন আর কেউ নেই, তখন কাকেও তিনি বদ্ধ করছেন আর কাকেও মুক্ত করছেন—এ-রকম তো হয় না।

মুক্তির উপায়

এখন এই বন্ধন যদি আমাদের পছন্দ না হয় তো তারও উপায় আছে। যদি আমরা আন্তরিকভাবে কাতর হ'য়ে প্রার্থনা করি, তা হ'লে তিনি আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু কেন তিনি এই বৈচিত্র্য করেছেন—এই প্রশ্নের অবসর নেই। কেন করেছেন, আমরা তা জানিনা। তবে আমরা এইটুকু ভাবতে পারি—এই সৃষ্টি-রূপ তোমার খেলা যেমনই হ'ক, মা, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তা হ'লে তিনি হয়তো মুক্তি দিতে কাতর হবেন না; কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করা চলে না, কেন তিনি এ-রকম সৃষ্টি করলেন। তাঁর খুসী। এই জন্যই তাঁকে বলা হয়েছে 'ইচ্ছাময়ী'। তাঁর যেমন ইচ্ছা হয়, তিনি তেমনই করেন, আমাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা তিনি করেন না। আমাদের পক্ষে যদি এ বন্ধন অসহ্য ব'লে বোধ হয় তো সে বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুজতে হবে। সেই উপায় সম্বন্ধেও আবার তিনিই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। কিন্তু সেই উপায় আমরা নিতে চাই কি? এখানে বলেছেন যে, এই সংসার তিনি সৃষ্টি ক'রে তারপর বলছেন "যাও বাবা, এখন খেলা কর।" যদি খেলা ও খেলনা আমাদের পছন্দ হয় তো ক্ষতি কি? খেল! যখন খেলনা আর ভাল লাগে না, তখন ছেলে বলে 'মা যাব।' তখন কোনও খেলনা তাকে আর তৃপ্ত করতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই যে এই খেলা আর এই সব খেলনা কি অসহ্য হয়েছে আমাদের কাছে? যদি হ'য়ে থাকে তো তার ব্যবস্থা রয়েছে, আর সেই ব্যবস্থা তিনিই ক'রে

রেখেছেন। বলছেন—'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'—ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ ক'রে সৃষ্টি করেছেন। সেই জন্যই তারা বাহ্য জিনিসকেই দেখে, অনুভব করে; অন্তরাত্মাকে দেখে না, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। কিন্তু এর ভিতর বিরল কোন ব্যক্তি "আবৃত্তচক্ষু" হ'য়ে বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্তরাত্মাকে দেখেন। সুতরাং দুই-ই আছে। তিনি যেমন 'মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি'—মনকে ব'লে দিয়েছেন 'যা, তুই বিষয় ভোগ করগে যা' তেমনি আবার যিনি মার জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন, তাঁর দিকে হাত প্রসারিত ক'রে দিচ্ছেন। কিন্তু সেই ব্যাকুলতা কি আমাদের আছে? আমরা কি আবার তাঁর কোলে ফিরে যেতে চাই? অনেক সময় আমরা ভাবি যে চাইব কি ক'রে?—তিনি কি আমাদের সে অমৃতের স্বাদ দিয়েছেন? সেই স্বাদে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন বলেই তো আমরা বিষয়ের আকর্ষণ বোধ করছি। এ কথাটা কেবল একই জিনিসকে ঘুরিয়ে বলা। বিষয়ের উপর এত আকর্ষণ আছে বলেই তো তাঁর প্রেমের স্বাদ পাচ্ছিনা। আমরা ভাবি আমাদের করণীয় বোধহয় কিছুই নেই, যা করতে হয় তিনিই করুন। দেবীসূক্তে পাই

"যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্"

আমি যাকে ইচ্ছা করি, বড় করি; আবার যাকে ইচ্ছা করি, অধোগামী করি। শাস্ত্র বলছেন, যাকে তিনি উঁচুতে তুলবেন তাকে দিয়ে শুভ কর্ম করান 'তমেব সাধু কর্ম কারয়তি যম্ ঊর্ধ্বং নিনীষতি' তিনি যাকে উঁচুতে ওঠাবেন, তাকে দিয়ে সাধু কর্ম করান—আবার যাকে অধোগামী করবেন, "তমেব অসাধু কর্ম কারয়তি যম্ অধো নিনীষতি"—তাকে দিয়ে তিনি অসৎ কর্ম করান। এখন তিনি যদি সব করান, সৎকর্ম ও অসৎ

কর্ম, তা হ'লে আমাদের দোষ কি ? কোনও দোষ নেই, কেবল একটি দোষ ছাড়া।

বন্ধনের কারণ কর্তৃত্ববোধ

আমরা যেন মনে না করি যে আমি করছি। তাঁকে সরিয়ে এই যে নিজের কর্তৃত্ববোধ, এই থেকেই যত বিপত্তির শুরু। যদি আমরা এই কথা সব সময় মনে রাখতে পারি যে সবই তিনি করছেন, তা হ'লে তো আর কোন চিন্তাই ছিল না; তা হ'লে তো আমরা হতাম জীবন্মুক্ত। কিন্তু ভালর বেলায় আমরা কৃতিত্ব নিই, আর মন্দের বেলায় যদি বলি 'তিনি করাচ্ছেন, তা হ'লে তো মনের সঙ্গে জুয়াচুরি করা হয়। এ যেন সেই ব্রাহ্মণের গো-হত্যার মতো। গল্পটি যদিও অনেকের জানা, তবুও আবার বলছি। এক ব্রাহ্মণ খুব সুন্দর এক বাগান করেছেন। সেই বাগানে একদিন এক গরু ঢুকে ভাল ভাল ফুলের গাছ মুড়িয়ে খেল। এই দেখে তো ব্রাহ্মণ রেগেই আগুন। গরুটাকে তিনি এমন মারলেন যে গরুটা মরেই গেল। তখন গো-হত্যার পাপ ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করতে এসেছে। এই দেখে তিনি বললেন "দাঁড়াও, এ পাপ আমি করিনি। হাতের দেবতা ইন্দ্র। অতএব ইন্দ্রই গো-হত্যা করেছে, হাত তো একটা যন্ত্র মাত্র।" গো-হত্যার পাপ তখন গেল ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র সব শুনে সেই পাপকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, নিজে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে গেলেন সেই বাগানে। বাগানে গিয়ে বাগানটির খুব প্রশংসা করছেন, শুনে ব্রাহ্মণ তো খুব খুসী, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে তিনি সব দেখাচ্ছেন আর সবকিছুই তিনি নিজে করেছেন ব'লে কৃতিত্ব নিচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মরা-গরুটার কাছে এসে পৌঁছলেন। চমকে উঠে ছদ্মবেশী ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন "এখানে গো-হত্যা ক'রল কে ?"

তখন ব্রাহ্মণ নিরুত্তর। এতক্ষণ 'আমি করেছি' বলেছেন, সুতরাং এখন কি ক'রে বলেন যে, 'এটা ইন্দ্র করেছে'। তাই তিনি চুপ ক'রে রইলেন। তখন ইন্দ্র স্বরূপ ধারণ ক'রে বললেন "তবে রে ভণ্ড! যত ভাল কাজ করবার বেলায় তুমি, আর গো-হত্যা করবার বেলায় ইন্দ্র।"

আমাদেরও ঠিক সেই রকম অবস্থা। আমরা যদি সম্পূর্ণ কর্তৃত্বহীন হই তো শুভ অশুভ কোন কর্মের ফলের জন্যই আমরা দায়ী হবো না। কিন্তু যখনই নিজেকে কর্তা ব'লে, ভোক্তা ব'লে বোধ হচ্ছে, তখনই ভাল এবং মন্দ এই দু-রকম কর্মের ফলই ভোগ করতে হচ্ছে। সুতরাং এই দায়িত্ব—হয় আমরা পুরোপুরি নেব, নয়তো সব তাঁর হাতে ছেড়ে দেবো, মাঝামাঝি হ'লে চলবে না। সব জায়গায় আমি করছি, আর যখন অসুবিধায় পড়ছি, তখন তিনি করছেন—এ হ'তে পারে না। আমরা অনেক সময় শুনি যে "একটু ভগবানের নাম করা দরকার; তা তিনি যদি করান তো ক'রব।" কই খাওয়ার সময় তো বলি না, তিনি যদি খাওয়ান তো খাব। তখন তো আমার চেষ্টা আছে। তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছি, আর ভগবানের চিন্তার সময় "তিনি করান তো ক'রব!" আর এটাই হ'ল আমাদের আলস্য; আমাদের মনের সঙ্গে জুয়াচুরি। এই জুয়াচুরি না ক'রে যদি আমরা সম্পূর্ণ তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারি, তো আমাদের বিশ্বাসের কখনও অমর্যাদা হবে না। তিনিই আমাদের সব রকমের অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবেন, কিন্তু তার আগে নয়। আর যদি খেলা আমাদের এত অরুচিকর না হয় তো খেলা চলুক। তিনি দেখবেন। খালি দেখবেনই না, দু-একটা ঘুড়ি যদি সুতো কেটে বেরিয়ে যায় তো তিনি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠবেন। "তাইতো, আমার খেলা যে এখানে বন্ধ হয়ে গেল"—এ-কথা কখনও বলবেন না।

সংসার ও মুক্তি—তাঁর ইচ্ছা

তাই বলছেন, তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা; তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী, লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। এখন প্রশ্ন হ'ল তিনি তো সকলকেই মুক্তি দিতে পারেন। তবে কেন তিনি তা দেন না? তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন যে, তাঁর ইচ্ছা যে খেলা চলে। আবার যখন খেলা বন্ধ হবে, তখনও তিনিই তা করবেন। প্রসাদ বলে "মন দিয়েছে, মনেরে আঁখি ঠারি"—মনকে তিনি ইশারা ক'রে সংসার করতে বলেছেন। সে তাই করছে; তাঁর মায়াতে ভুলে মানুষ তাই সংসার নিয়ে পড়ে রয়েছে।

এরপর এল একটি মারাত্মক প্রশ্ন—"মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?" সর্বত্যাগী ঠাকুরকে দেখে এই প্রশ্নটি মানুষের বিশেষ ক'রে মনে ওঠে। সর্বত্যাগীর সান্নিধ্যে এসে মানুষের নিজের দৈন্য প্রকট হ'য়ে ওঠে। তাই প্রশ্ন ওঠে যে সমস্ত ত্যাগ না করলে কি তিনি আমাদের নাগালের বাইরে থাকবেন। এই সর্বত্যাগ আমাদের পক্ষে সম্ভবও হবে না, সুতরাং তাঁকে পাওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঠাকুর হেসে বলছেন—হাসা এইজন্য যে আমাদের দৌড় তিনি জানেন,—"না গো, তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে-বশে বেশ আছ। সারে-মাতে।" গুড়ের নাগরী থাকে, তাতে কোন কোন নাগরীতে কিছু ঝোলা-গুড়ও থাকে, আবার কিছু দানা-গুড়ও থাকে। তাকে বলে সারে-মাতে থাকা। আবার বলছেন নকশা খেলার কথা। এই খেলায় যারা বেশী 'কাটায়', তাদের ঘুঁটি দিয়ে আর খেলা চলে না। ঠাকুর তাই বলেছেন "আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।" তারপর তিনি বলেছেন "সত্যি বলছি, তোমরা সংসার ক'রছ, এতে দোষ নেই।" যদিও ঠাকুরের মতো সর্বত্যাগীকে দেখলে মনে হয়, এ-রকম হ'লে তো বেশ হ'ত। কিন্তু মন বোঝে না যে এ-রকম সকলের জন্য নয়। ঠাকুর তা

বোঝেন। তাই বলেছেন "তোমরা সংসার ক'রছ—দোষ নেই।" তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, এই একটা ব্যাপারে ঠাকুরের কিন্তু কোন আপস নেই। সংসারে আমি যেমন ইচ্ছা তেমনি চ'লব, আর ঈশ্বরের একান্ত দায় তিনি সেখান থেকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে যাবেন—এ হয় না। তাই বলছেন "তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, না হ'লে হবে না।" তাই সংসার করায় দোষ নেই, দোষ আছে সংসারে আসক্ত হ'য়ে থাকায়, ভগবানকে ভুলে সংসারে ডুবে থাকায়।

দশ

কথামৃত—১।২।৬

নামে বিশ্বাস

কেশব ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের অবিরাম ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে। ঠাকুর বলছেন "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।" যদি মানুষ মনে মনে দৃঢ়সংকল্প ক'রে বলতে পারে যে সে মুক্ত, তো সে সত্যি মুক্ত হ'য়ে যায়। আর তা না হ'য়ে যদি সে ক্রমাগত ভাবতে থাকে যে, আমি পাপী, আমি বদ্ধ, তো সে বদ্ধই হ'য়ে যায়। ঠাকুর বলছেন যে, ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই যে "কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি?" এই বলে ঠাকুর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকিশোরের কথা বললেন। কৃষ্ণকিশোরের এমনই বিশ্বাস যে এক অশুচি, সমাজে অপবিত্র বলে গণ্য মুচিকে বললেন "তুই বল্ শিব"; শিব বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বাস হ'ল যে সে শুদ্ধ হ'য়ে গেল, আর তার হাতের জল তিনি গ্রহণ করলেন। ঠাকুর বলছেন যে, "তাঁর নামে বিশ্বাস কর, আর বলো যে অন্যায় করেছি, আর ক'রব না"—এ-দুটি একসঙ্গে হওয়া

চাই। যদি তাঁর কাছে শরণাগত হ'য়ে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম গ্রহণ করা যায় তো তিনি সকল পাপ থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বুঝতে হবে—যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, যে তাঁর শরণাগত, সে আর অসৎ পথে যায় না। যদি দেখি কেউ অসৎ পথে চলছে, আর বলছে 'আমি তাঁর নাম করেছি, আমি শুদ্ধ, আমি মুক্ত', তা হ'লে বুঝতে হবে, সে ঠিক ঠিক নাম করেনি, নামে তার শ্রদ্ধাও নেই, তাই সে শুদ্ধও নয়, মুক্তও নয়। তার আচরণের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাবে তার স্বরূপ।

ভগবদ্ আশ্রয়

ভাগবতের ভিতরে একটা কথা আছে, যে তাঁকে আশ্রয় করেছে, তার আর কখনো পদস্খলন হয় না; ঠাকুর যাকে বলছেন 'বেতালে পা পড়ে না'।

"যমাশ্রিত্য নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

বলছেন যে, ভগবানকে বা তাঁর প্রতি শুদ্ধা ভক্তিকে অবলম্বন ক'রে মানুষ যখন শুদ্ধ, পবিত্র হয়, তখন সেই আশ্রয়ের স্বভাবই হচ্ছে এই যে সে রকম মানুষ আর প্রমাদগ্রস্ত হয় না; "ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ"—কখনও ভুল করে না। "ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ"—যদি সে চোখ বুজেও দৌড়োয়. তবু তার পদস্খলন হয় না। ঠাকুর বলেছেন, যে ছেলে বাপের কোলে চড়ে যায় সে স্বচ্ছন্দে হাততালি দিয়ে যেতে পারে; তার পড়বার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু যে ছেলে বাপের হাত ধরে চলেছে, সে হঠাৎ কিছু দেখে অন্যমনস্ক হ'য়ে হয়তো হাততালি দিতে গেল, তখনই সে বাপের হাতছাড়া হ'য়ে পড়ে যেতে পারে তাই যদি দেখা যায় যে কোন ভক্তের বারবার পদস্খলন হচ্ছে, তবে

বুঝতে হবে—তার ভক্তি ঠিক অন্তরের ভক্তি নয়। কেন না সে ভক্তি যদি আন্তরিক হ'ত, ভগবানই তার রক্ষাকর্তা হতেন ; তার পা বেতালে পড়তে দিতেন না।

"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥"

যাঁরা অনন্যচিত্ত হ'য়ে ভগবানের শরণাগত হন, ভগবানই তাঁদের উদ্ধার করেন। ভগবান প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছেন যে, তিনি তাঁদের মৃত্যুসংসাররূপ সাগর থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেন। তবে তাঁকে যদি ভার দিই তো ভার সম্পূর্ণরূপে দিতে হবে, তার মধ্যে কোন ভাগাভাগি চলবে না।

গিরিশবাবু ও বকল্‌মা

ঠাকুরকে বকল্‌মা দিয়ে গিরিশবাবু খুব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, ভাবলেন—তিনি এবার নিশ্চিন্ত। এরপর একদিন যখন কথায় কথায় গিরিশবাবু বলে উঠেছেন যে তাঁকে কোন এক জায়গায় যেতে হবে, ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন "সে কি গো, তুমি না আমায় বকল্‌মা দিয়েছ ? তুমি আবার' এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে'—ব'লছ কেন ?" গিরিশবাবু তখন বুঝলেন, সত্যি তো, তাঁর যে বকল্‌মা দেওয়া আছে ; এখন তো আর খানিকটা তাঁর, খাকিটা আমার করলে চলবে না। যেখানে আমার অভিমান নিহিত আছে, সেটা আমি ক'রব ; আর যেটা কঠিন সেটা তিনি করবেন ; এ-রকম ভাগাভাগি তো চলে না। তাই শাস্ত্র বলেছেন যে, পরিপূর্ণভাবে অনন্যচিত্ত হ'য়ে তাঁর শরণাগত হ'তে হবে। 'অনন্য' না হ'লে হবে না। যদি আমি 'এটাও কিছুটা' 'ওটাও কিছুটা' করি তো বুঝতে হবে কোনটাতেই আমার নিষ্ঠা নেই। তাই বলেছেন, "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ

পর্যুপাসতে” অনন্যচিত্ত হ'য়ে যদি তাঁর শরণাগত হওয়া যায়, তবেই তিনি তাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন। কিন্তু ‘অনন্য হ'তে হবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে হবে।’ এই কথাটি ঠাকুর গিরিশকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। এ-সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে গিরিশ বলছেন যে, তখন তিনি ভেবেছিলেন যে বকল্‌মা দিয়ে বোধ হয় তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু পরে প্রত্যেকটি কাজের আগে, এমনকি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের আগে তাঁকে ভাবতে হয়েছে যে, সে কাজটি তিনি করছেন, না ঠাকুর করছেন। ‘বকল্‌মা দেওয়া'র অর্থ যে এত গূঢ়, তা তিনি তখন ভাবতেই পারেন নি। ঠাকুরও এ-কথা বারবার বলেছেন, তিনি করিয়ে নেন, ছাড়েন না। তাই ঠাকুর তাঁর আদরের সন্তানদের দিয়েও কঠোর সাধনা করিয়ে নিয়েছেন, জগতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে এ-বস্তু এত সহজ-লভ্য নয়। তবে যদি কেউ তাঁর উপর নির্ভর করে তো তখন যা করাবার তিনিই করিয়ে নেন।

এর পর ঠাকুর বলছেন যে ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টান প্রভাব থাকায় খ্রীষ্টান-দের মতো পাপ ও পাপীর উপর বেশ জোর দেওয়া হয়। ঠাকুর এটা একেবারেই পছন্দ করতেন না। এ-সম্বন্ধে বহুবার তিনি বলেছেন, যারা ‘নাম’ করে, জপ করে, তারা এত ‘পাপী পাপী’ কেন করে? তা হ'লে নিশ্চয় তাদের নামে তেমন বিশ্বাস নেই। পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে, কোন রাজা ব্রহ্মহত্যা ক'রে ঋষির কাছে গেছে, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি ক'রে হবে, তা জানবার জন্য। ঋষি বাড়িতে নেই, ঋষি-বালক ছিল। সে ব'লল “ব্রহ্মহত্যা ক'রে এসেছ, বেশ, তিনবার ‘রাম’ নাম কর। তুমি এখন নিষ্পাপ”। ঋষি বাড়িতে ফিরলে বালক তাকে সব কথা খুলে বললে। সব শুনে ঋষি বললেন “করেছিস্ কি!

এক ‘রাম’ নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।

তিনবার রামনাম করাইলি তারে?”

"এক রাম নামে যেখানে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ চলে যায়, কি হিসেবে তাকে তিনবার রামনাম করালি? একবারই কি যথেষ্ট নয়?" তাই ঠাকুর বলছেন যে, এত নাম করেও যারা 'পাপী পাপী' বলে, বুঝতে হবে যে তাদের নামে শ্রদ্ধা নেই।

ভগবানের সঙ্গে আমাদের এইরকম সম্বন্ধ পাতাতে হবে যে আমরা তাঁর সন্তান, তাঁর অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে আমাদের অধিকার। তাঁর পবিত্রতা, তাঁর শুদ্ধি, তাঁর যে সমস্ত বন্ধনাতীত সত্তা—এই সবকিছুর উপর আমাদের দাবী, যে দাবীর উপর, ঠাকুর বলেছেন যে, কোন নালিশও চলে না। তাই তো ঠাকুর গাইলেন—"আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।" যদি তাঁর নাম করি তো উদ্ধার আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে। এর পরেও যদি আমরা চিন্তা করি তো বুঝতে হবে, তাঁর নামে আমাদের সে বিশ্বাসও নেই, ভক্তিও নেই।

শুদ্ধা ভক্তি

ঠাকুর মার কাছে চেয়েছিলেন শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, যে ভক্তি কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য নয়, এমন কি মুক্তির জন্যও নয়! এই রকম ভক্তি যদি কারও থাকে, তা হ'লে তার আর সংসারের কোন জিনিসের জন্য প্রার্থনা করতে হয় না। ভগবানকে আমরা সাধারণতঃ উপায়রূপে গ্রহণ করি, বলি, 'ভগবান আমি বিপদে পড়েছি, আমায় উদ্ধার কর; হে ভগবান, আমাকে এটা পাইয়ে দাও, সেটা পাইয়ে দাও, ইত্যাদি'; কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি ঠিক তার বিপরীত। সেখানে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কোন কাম্য নেই। 'আর কিছুই চাই না ভগবান, একমাত্র তোমাকে চাই, তোমাকে ভালবাসতে চাই, যে ভালবাসা হবে নিষ্কাম, অহৈতুক, যে ভালবাসার কোন কারণ

থাকবে না।' তাই তো ঠাকুর মায়ের পায়ে শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম—সব নিবেদন করলেন, চাইলেন কেবল শুদ্ধা ভক্তি।

'এ-সংসার ধোঁকার টাটি' প্রসাদ বলেছিলেন। তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করলে আবার এই সংসারই হয় 'মজার কুটি'। সংসারের অনিত্যতা বিচার ক'রে এ-সংসারকে যখন মিথ্যা, মায়িক বস্তু ব'লে বোধ হয়, তখন এ-সংসার 'ধোঁকার টাটি' ব'লে মনে হয়। আবার যখন এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয় যে এই সংসার সেই এক পরমেশ্বর ছাড়া আর কিছু নয়, তিনি ছাড়া এর আর কোন পৃথক্ সত্তা নেই—আমরা এই যা কিছু দেখছি, সবই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, তখন এ-সংসারে থেকেও আমরা ভগবানের লীলা আস্বাদন করতে পারি। আর তখনই সংসার 'মজার কুটি' হয়। এই সংসার আমাকে আবদ্ধ করবে, এই সংসার আমাকে ব্রহ্ম থেকে দূরে নিয়ে যাবে—এ-রকম আশংকার তখন আর কোন অবকাশ থাকে না।

ঠাকুর বলছেন, একবার তিনি ধ্যান করতে বসেছেন চোখ বুজে ; বসে ভাবলেন যে চোখ বুজলেই 'তিনি' আর চোখ চাইলে 'তিনি নেই'! ভাবলেন যে, এ কেমন একঘেয়ে ভাব যে চোখ বুজেই তাঁকে ভাবতে হবে! তিনি না অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিরাজিত! জগতে এমন কোন জিনিস কি আছে, য তিনি ছাড়া? গীতায় তো ভগবান বলেছেন "ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্"—পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি ছাড়া। জগতের প্রতিটি অণুপরমাণুতে তিনি ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছেন, এক একটি ধুলিকণার ভিতরেও তিনি পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, অংশতঃ নয়, ক্ষুদ্ররূপে নয় ; কারণ অখণ্ড যিনি, অবিভাজ্য যিনি, তাঁকে কি আর ভাগ ক'রে টুকরো টুকরো করা যায়? এই বুদ্ধিতে যখন মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জগতে কি এমন বস্তু আছে, যা তাকে মোহগ্রস্ত করবে? উপনিষদ্ বলছেন, যখন সর্বত্র কেউ

আত্মাকে দেখে "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"—তখন শোকই বা কোথায়, মোহই বা কোথায়? এর পর ঠাকুর বলছেন যে, এ সত্য কথা যে, জনকরাজা একাধারে জ্ঞানী আবার কর্মী, নিত্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত, আবার তিনিই এই জগতে সাধারণের মতো ব্যবহার করছেন। রাজা তিনি, সংসারী তিনি—তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে বনবাসী হ'য়ে যাননি, সুতরাং তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে সংসারের কোন বিরোধ নেই। কথাটি ব'লে ঠাকুর বলছেন "কিন্তু ফস ক'রে জনকরাজা হওয়া যায় না।"

নির্জনবাস ও সাধন

জনকরাজার উদাহরণ দিয়ে আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা জনকরাজার মতো সংসারও ক'রব আবার ভগবানের চিন্তাও ক'রব। কিন্তু এই যে ভগবানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তা এত সহজসাধ্য নয়। তার জন্য অনেক সাধন করতে হয়। জনকরাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন, তবে 'জনকরাজা' হ'তে পেরেছিলেন। তাই সংসারে থেকেও মাঝে মাঝে নির্জনবাস করতে হয়। নির্জনে গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায় তো সেও ভাল। তবে মনে রাখতে হবে যে এ কেবল নির্জনবাসের জন্য নির্জনে বাস নয়, তা যদি হ'ত তো নির্জন সেলে বন্দী কয়েদীরা তো সব শ্রেষ্ঠ ধার্মিক হ'য়ে যেত। তা নয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্জনে গিয়ে আমরা আমাদের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি, ততক্ষণ আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্য মনের কতদূর শক্তি, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি না। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যারা ভেসে যায়, স্রোতের শক্তি যে কত প্রবল তা তারা বুঝতে পারে না। যখনই স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ এগোবার চেষ্টা করে, তখনই সে এর শক্তির পরিচয় পায়। তাই যাঁরা সাধন-ভজন করেন, তাঁরা জানেন

যে যত তাঁরা মনকে ইষ্টে নিবিষ্ট হবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন, মন ততই ঠিক সেইটি ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসের কথা ভাবছে। এই মনের সঙ্গে যুঝতে গেলে আমাদের এই সদা-বিক্ষেপময় সংসারের ভিতর থেকে তা করা সম্ভব নয়। এই জন্য ঠাকুর নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তার কথা বলছেন। নির্জনে কেন? না, সেখানে গেলে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকবে। তাই এই নির্জনেই মনের স্বরূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হ'তে পারি। আমরা ধরতে পারি, মন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কতভাবে বিভ্রান্ত করছে। নির্জনে বিক্ষেপের কারণ থাকে না, তাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নির্বাধ হ'তে পারে। আমরা অহরহ এই সংসারের কোলাহলের মধ্যে যেভাবে দিন কাটাচ্ছি, তাতে এই মনকে সংযত ক'রে ভগবানের দিকে স্থির রাখা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই মানুষের অবকাশের প্রতীক্ষা করতে হয়; আর যখনই এই অবসর হয়, তখনই নির্জনে মনকে ঈশ্বর-চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হয়। এই অভ্যাস করতে করতে তবে ভগবানের জন্য একটা স্বাদ, একটা আকর্ষণ, একটা আনন্দ বোধ হয়—পার্থিব আনন্দের সঙ্গে যার অনেক পার্থক্য। পার্থিব বস্তুতে আনন্দ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক, কেন না মনের স্বাভাবিক গতিই ঐ দিকে; কিন্তু ভগবদ্‌-আনন্দ!—এ দিকে তো ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নেই, তাই ভগবানের দিকে মনের মোড় ফেরাতে গেলে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, চেষ্টা করতে হয়, অভ্যাস করতে হয়, তবেই ধীরে ধীরে সেই আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়।

কথামৃত—১।২।৭-৮

কেশব ও বিজয়ের মতভেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে স্টীমারে চলেছেন, আর অবিরাম ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে। বিজয় আর কেশবের মধ্যে যে মতভেদ আছে, ঠাকুর তা দূর করার চেষ্টা করছেন। কেশব ও বিজয় পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে মতভেদ হওয়ায় বিজয় কেশবের ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আলাদা হ'য়ে গেলেন, ফলে উভয়ের অনুচরদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ঠাকুর তাই এদের দুজনের মধ্যে ভাব করিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মতভেদের উল্লেখ ক'রে ঠাকুর বলছেন যে, তাঁদের ঝগড়া যেন শিব-রামের ঝগড়া। শিবের গুরু রাম; রামের গুরু শিব। তাঁদের ঝগড়া মিটে গেল, কিন্তু তাঁদের অনুচরদের অর্থাৎ বানর ও ভূতপ্রেতগুলোর ঝগড়া মিটল না। ঠাকুর আরও বলছেন, গুরু-শিষ্যের ঝগড়া এ আর নতুন কিছু নয়। গুরুর সঙ্গে রামানুজের মতবিরোধ হয়েছিল। কিন্তু গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যেন পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মতো। বাইরে তাদের যতই বিরোধ থাকুক না, অন্তরে পরস্পরের প্রতি এক নিগূঢ় আকর্ষণ থাকে।

এর পর ঠাকুর কেশবকে বোঝাচ্ছেন, কেন তাঁর দল ভেঙে যায়—তিনি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করেন না বলে। বলা বাহুল্য, কেশবের দলের ভাঙনের কারণ ছিল তাঁর অল্পবয়সের মেয়ের সঙ্গে কুচবিহার-রাজার বিয়ে দেওয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার হ'য়ে তিনি নিজেই অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার সমাজের প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন। ফলে বিরোধের

সৃষ্টি হ'ল ; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি তাঁর দল ছেড়ে দিয়ে এক নতুন দল গড়লেন।

ঠাকুরের অভিমানশূন্যতা

প্রসঙ্গতঃ ঠাকুর বলছেন যে কেশব গুরু হ'য়ে, বিচার না ক'রে যাকে তাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করতেন ; তার ফলে সকলে তাঁকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে দল ভেঙে যায়। ঠাকুর বলছেন, তাঁর কিন্তু অন্য ভাব, "আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা, বাবা।" অর্থাৎ 'আমি গুরু'—এই বুদ্ধি তাঁর নেই। এই রকম কর্তৃত্ব-বুদ্ধি থাকলে অভিমানের সৃষ্টি হয় আর এই অভিমান থেকেই পতন হয়। দেখা যায় যে কর্তৃত্ববোধ থেকে অপরকে চালাবার আগ্রহই মানুষের মধ্যে বেশী থাকে ; নিজে চলবার প্রতি তার তেমন আগ্রহ থাকে না। ফলে উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের মতো তার অবস্থা হয়। এই গুরুগিরি থেকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন কেশবকে। অন্যদিকে তাঁর নিজের ভাবের কথা তিনি বলছেন যে, মার হাতের যন্ত্র তিনি। মা যেমন চালাচ্ছেন, তিনি তেমনি চলছেন। যেখানে তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়, পথ অপরিচিত, সেইপথে অপরকে চালানো কত কঠিন। এই পথে অপরকে চালাবার আগে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কি অভ্রান্ত ? নিজে যদি অভ্রান্ত না হই তো অপরকে যে নির্দেশ দেব, তা ভ্রান্তিশূন্য হবে কি ক'রে ? এইজন্য ঠাকুর বলছেন যে, সব তাঁর উপর ছেড়ে দিতে হয়।

গুরু তিনিই হ'তে পারেন, যাঁকে ঈশ্বর নির্দেশ দেন গুরু হবার। তখন তাঁর ভিতরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অপরকে চালনা করেন। সেখানে গুরুর কোন কর্তৃত্ব থাকে না, কর্তৃত্ব থাকে ভগবানের। গুরু

সেখানে মাধ্যম হ'য়ে কাজ করেন। অপরকে চালনা করার অধিকার ভগবান যদি আমাদের না দেন, তো আমাদের কথার কোন জোর থাকে না। যীশুখ্রীষ্ট উপদেশ দিচ্ছেন ; একজন বললেন "He speaks like on having authority." তাঁর কথার এমন জোর দেখা যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে যে তিনি আদেশ পেয়েই কথা বলছেন।

গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ

ঠাকুর আরও বলছেন, গুরু এক সচ্চিদানন্দ, আর কেউ নয়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তাই। আমরা যখন প্রণাম মন্ত্রে বলি "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।" তখন 'আমার গুরু অমুক ভট্টাচার্য'—তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এ-কথা বোঝায় না। শাস্ত্রের তাৎপর্য এখানে ভাবে বুঝতে হবে। অমুক ভট্টাচার্য যে বলছি, তিনি কিন্তু গুরু নন। গুরু হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ স্বয়ং ; হ'তে পারে তিনি কোন আধারের মধ্য দিয়ে তাঁর কৃপা বিতরণ করেন। কিন্তু সেই কৃপা বিতরণ তখনই সার্থক হয়, যখন সেই মাধ্যম হয় শুদ্ধ। আর সেই মাধ্যমে যদি অশুদ্ধি থাকে তো তাঁর কৃপা অবাধে প্রবাহিত হ'তে পারে না। এইজন্য গুরুরও অধিকার-অনধিকার বিচার শিষ্য করবে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করার আগে। এইটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র আরও বলেন যে, যাঁকে গুরুরূপে বরণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে, তাঁর আচরণ বিচার ক'রে দেখতে হবে। ঠিক ঐ রকম বিচার করার কথা শিষ্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। গুরু যদি অনধিকারী হন তো তিনি যথাবিধি শিষ্যকে পরিচালনা করতে পারবেন না। শিষ্যও যদি উপযুক্ত গুণসম্পন্ন না হন, তিনিও অগ্রসর হ'তে পারবেন না। গুরু নিজে শুদ্ধচরিত্র হ'য়ে, শিষ্যের প্রতি করুণাপরবশ হ'য়ে তার পথ প্রদর্শনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবেন এবং এই সম্বন্ধের ভিতর যেন কোন আর্থিক আদান-প্রদানের

ভাব না থাকে, এটা যেন একটা ব্যবসায়ে পরিণত না হয় —সে বিষয়ে খুব সাবধান হ'তে হবে। শাস্ত্র বলছেন, তিনি শ্রোত্রিয় শাস্ত্রজ্ঞ হবেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জীবনে প্রতিফলিত ক'রে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন—তিনি অকামহত হবেন অর্থাৎ কোন কামনার দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে তিনি শিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবেন না। আর তাঁর যেন আমিত্বের অভিমান একটুও না থাকে। সুতরাং গুরু সবচেয়ে বেশী অযোগ্যতার পরিচয় দেবেন তখন, যখন 'আমি শিক্ষা দিচ্ছি শোন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা সেই অনুসারে চল'—এইরকম আমিত্বের অভিমান থাকবে তাঁর। গুরুকে ভাবতে হবে যে তিনি একটি আধার মাত্র, যেমন মাটির প্রতিমা আমাদের উপলক্ষ্য, ঠিক সেই রকম। প্রতিমা যেমন দেবতা নন, তেমনি সেই ব্যক্তি আধাররূপে গুরুশক্তি প্রকাশের একটি উপলক্ষ্য মাত্র; গুরু নন। ঠাকুর তাই বলছেন, গুরু সেই সচ্চিদানন্দ এবং সেই দৃষ্টিতে দেখেই "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ"—এ-কথা বলা সম্ভব। মানুষ হ'য়ে জন্মালে তাঁর মধ্যে কিছু না কিছু অপূর্ণতা থাকবেই, তাই সে অসম্পূর্ণ ব্যক্তি কখনও পরব্রহ্ম হ'তে পারেন না—এ-কথা সকলের বোঝা উচিত, বিশেষ ক'রে বোঝা উচিত তাঁর যিনি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন

"পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি।
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

রথ, পথ, মূর্তি সকলেই নিজে নিজেকে প্রণামের লক্ষ্য ব'লে ভাবছে; আর অন্তর্যামী হাসছেন, ভাবছেন যে এরা কি ভুলই না করছে।

উপনিষদে একটা গল্প আছে যে দেবতারা যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত ক'রে খুব অভিমানী হ'য়ে উঠেছিল। ব্রহ্ম সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর, তিনি দেবতাদের এই মনোভাব বুঝলেন; বুঝে তিনি তাঁদের অভিমান দূর করবার জন্য একটি অপূর্ব রূপে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা তাঁকে

চিনতে পারলেন না। তখন তাঁরা অগ্নিকে পাঠালেন জেনে আসতে, ইনি কে। অগ্নিকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি কে হে বাপু?' অগ্নির অভিমানে ঘা লাগল, বললেন "আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা"। তিনি বললেন 'বুঝলাম তোমার ছোট বড় অনেক নাম আছে, কিন্তু তুমি কি করতে পারো?' 'আমি জগৎসংসারটা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে পারি।' 'তাই নাকি! তা হ'লে এই কুটোটা পোড়াও তো'। অগ্নি গেলেন সেটাকে পোড়াতে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন; কিন্তু তবুও সেটির গায়ে আগুনের একটু আঁচও লাগাতে পারলেন না। লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে তিনি ফিরে এলেন। তখন বায়ুকে পাঠানো হ'ল। বায়ুরও হ'ল ঠিক সেই অগ্নির মত অবস্থা। তখন ইন্দ্র নিজে গেলেন। ইন্দ্রকে আরো তীব্র কশাঘাত করবার জন্য সেই যক্ষ অন্তর্হিত হলেন। ইন্দ্র লজ্জিত হ'য়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় সেখানে উমা হৈমবতীর আবির্ভাব হ'ল। তিনি বললেন, "ইন্দ্র, যিনি তোমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁকে তোমরা কেউ চিনতে পারলে না, তিনিই হলেন পরব্রহ্ম। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরই জয় হয়েছে, তোমাদের কোন কৃতিত্ব নেই সেখানে।" ঠিক সেই রকম আমরা যদি মনে করি যে, কোন কাজ আমাদের শক্তিতে হচ্ছে তা হ'লে আমরা ভুল ক'রব। আমাদের নিজেদের কোন সামর্থ্য নেই; আমাদের পিছনে সর্বশক্তির আধার যিনি, তিনিই আমাদের চালাচ্ছেন; ঠিক যেমন পুতুলনাচের পুতুলগুলোকে চালানো হয়, উপর থেকে দড়ি ধরে। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন, যেমন আলু পটল সিদ্ধ হবার সময় দেখা যায়, সেগুলো লাফাচ্ছে; নীচে আগুন থাকে, তাই তারা লাফায়; আগুনটা সরিয়ে নিলে সব ঠাণ্ডা। শাস্ত্রে বলেছেন—"যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্, সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো অন্তরঃ, যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরম্, যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" যিনি সর্বভূতে অবস্থিত,

সর্বভূত থেকে পৃথক্, সর্বভূত যাঁকে জানে না, সর্বভূত যাঁর শরীর, সকল ভূতের অভ্যন্তরে থেকে যিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই নিয়ন্ত্রণ-কর্তা অন্তর্যামী, অমরণধর্মী আত্মা।

যাঁর শক্তিতে সর্ব ক্রিয়া ঘটছে, আমাদের সকল চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁকে কিন্তু "সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ"—সর্বভূত জানে না ; আর এই জানে না বলেই সকলে ভুল ক'রে মনে করে যে 'আমি করছি'। এই যে নিজেকে কর্তার আসনে বসানো—এরই নাম অবিদ্যা, এরই নাম অজ্ঞান। তাই ঠাকুর বারবার বলছেন "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু"—আমি নয়, সব কিছুই তুমি। এই দৃষ্টিতে যতক্ষণ না আমরা দেখব, ততক্ষণ তাঁর প্রকাশ আমাদের মধ্যে হবে না, আমরা কেবল চোখ-বাঁধা বলদের মতো এই বিশ্বে জন্মমৃত্যুপরম্পরার মধ্য দিয়ে ঘুরে ম'রব।

তাই যতক্ষণ না তিনি আদেশ দিচ্ছেন ততক্ষণ গুরু পদবী গ্রহণ করা উচিত নয়। শশধর তর্কচূড়ামণিকে ঠাকুর যখন এই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, পণ্ডিত তখন একটু সঙ্কোচবোধ করলেন। ঠাকুর তখন বলছেন যে "আদেশ না পেয়ে থাকলে তাঁর কথায় জোর হবে না"—কেউ বলবে না "He speaks like one having authority."

ঈশ্বরলাভ ও লোককল্যাণ

এরপর ঠাকুর বলছেন যে 'তোমরা বলো জগতের উপকার করা, জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। তুমি কে যে, জগতের উপকার করবে। আগে তাঁকে লাভ কর, তিনি শক্তি দিলে, তবে সকলের উপকার করবে ; নচেৎ নয়।' অনেক সময় আমরা মনে করি, জগতের উপকার করার কথা। এটা আর কিছু নয়, কেবল আমাদের ভিতরের প্রচ্ছন্ন অহংকারকে একটা আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশ করা মাত্র। যীশুখ্রীষ্ট একটা সুন্দর কথা

বলেছিলেন যে "তোমার চোখে একটা কড়িকাঠ পড়ে আছে, আর একজনের চোখে একটা কুটো পড়ে আছে—তুমি সেই কুটোটা সরাতে যাচ্ছ। আগে তোমার চোখের উপর থেকে সেই কড়িকাঠটা সরাও, তবে তো তুমি দেখতে পাবে, তবে তো তুমি অপরের চোখের উপর থেকে কুটোটা সরাতে পারবে।" আমরা নিজেদের অবস্থার কথা না ভেবে অপরের কল্যাণের জন্য অনেক সময় ব্যস্ত হই। ঠাকুর তাই বলছেন, "যার জগৎ তিনি কি আর জগতের কল্যাণে সমর্থ হচ্ছেন না যে, তোমাকে জগতের কল্যাণ করতে হবে।" কল্যাণ সম্বন্ধে তোমার ধারণাটাই বা কতটুকু যে তুমি জগতের কল্যাণ করবে ?

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ"—একটা চুলের ডগা, তাকে একশ ভাগ করলে যা হয় তার আবার একশ ভাগ করলে যতটুকু হয়, ততটুকু এই জীব। এই এতটুকু জীব, সে আবার অহংকার করছে যে সে জগতের উপকার করবে! কি বিকট অভিমান যে আমি এই জগতের কল্যাণ ক'রব, আর সমস্ত জগৎ আমার সেই কল্যাণের ভিখারী হ'য়ে থাকবে।

তাইতো 'জীবে দয়ার' কথা শুনে ঠাকুর ব'লে উঠেছিলেন "দয়া! দয়া করবার তুমি কে ? বলো 'জীবে সেবা'।" সকল জীবের মধ্যে তিনি রয়েছেন সেই দৃষ্টিতে তাঁর সেবা করা। এই ভাবটি যদি আমরা গ্রহণ করি, তবেই আমাদের কর্ম পরিণত হবে সাধনায়। না হ'লে জীবে দয়া করতে গেলে আমাদের অভিমান হিমালয়ের মতো বিশাল হ'য়ে উঠবে, যার ভারে আমরা ডুববো। স্বামীজী যিনি এত কর্মের কথা বলেছেন, তিনিও বলছেন যে, "এ জগৎটা যেন একটা কুকুরের লেজ। টানাটানি ক'রে মনে করি সোজা হয়েছে, ছেড়ে দিলেই সে যেমন বাঁকা, তেমনি থাকে।"

জীব সেবা

আসল কথা হচ্ছে এ জগৎটা একটা পাঠশালা। এই পাঠশালায় আমরা এসেছি শেখবার জন্য। এই শেখবার দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তবে আমাদের কিছু লাভ হবে, নচেৎ নয়। 'জগন্নাথের রথ তাঁরই শক্তিতে চলে, তোমার শক্তিতে নয়। তুমি সেই রথের দড়ি ছুঁয়ে নিজের জীবনকে সার্থক করতে পারো এই পর্যন্ত।' কাজেই আমি সমাজ সংস্কার ক'রে বা নানা লোকহিতকর কর্ম ক'রে, এ জগতের উপকার ক'রব—এ-সবই আমাদের ভ্রান্ত অভিমান। ভগবান আমাদের এই জগতে আসার সুযোগ দিয়েছেন, কাজ ক'রে নিজেকে ধন্য করবার জন্য, আর সেই কাজ করতে হবে সেবার ভাবে, দয়ার ভাবে নয়। তাই তো স্বামীজী বলেছেন—দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খ-দেবো ভব। সব জায়গায় তিনি। তাঁর সেবা কর, যেখানে যে রকম প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবে। যেখানে যেটি প্রয়োজন, ভাবতে হবে ভগবান সেখানে আমার পূজা নেবার জন্য সেইভাবে অবস্থান করছেন। ভক্তিশাস্ত্রে যেখানে সর্বত্র পূজার কথা বলেছেন, সেখানে এইভাবে পূজার কথাই বলা হয়েছে। তাই গরুড়কে পূজা করতে হবে সিংহাসনে বসিয়ে নয়, তা হ'লে উল্টে আরও বিভ্রাটের সৃষ্টি হবে। শুধু মানুষে নয়, সর্বত্র সর্বজীবে—যেখানে যেভাবে প্রয়োজন, সেইভাবে পূজা করতে হবে, ভক্তিভাবে, সেবার ভাবে। আর এইভাবে কাজ করলে আমরা যা কিছু করি না কেন, সবই হ'য়ে উঠবে তাঁরই পূজা—তাঁরই আরাধনা।

বার

কথামৃত—১।২।১০

কেশব প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গঙ্গাবক্ষে নৌ-বিহার করছেন। অবিরাম ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে।

লোকশিক্ষা কঠিন কাজ

ঠাকুর বলছেন 'লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন'। যিনি শিক্ষা দেবেন, তিনি ভগবানের আদেশ পেলে তবেই এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন ; না হ'লে তাঁর কথার ভিতর না থাকে জোর, না থাকে সঙ্গতি। আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে যখন আমরা অসীমকে বোঝাতে যাই তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কথার মধ্যে অসঙ্গতি থেকে যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বললেন সামাধ্যায়ীর কথা। তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন 'ভগবান নীরস, তাঁকে তোমাদের ভক্তিরস দিয়ে রসিয়ে নিতে হবে'। বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলা হয়েছে, এখানে তাঁকে বলা হচ্ছে 'নীরস'। এ-রকম অসঙ্গতি তখনই আসে, যখন মানুষ অনুভূতি ছাড়া কথা বলে। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন, 'কেউ যখন বলে, আমাদের মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে' এ হ'ল সেই রকমের এক অসঙ্গতি ; ফলে বুঝতে হবে ঘোড়া তো নেইই, গরুও নেই। এ-রকম অসঙ্গতি দেখা দেয় তখন, যখন আমরা আমাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে কথা বলি। যেমন একদিন বেলুড় মঠে একজন গান গাইছেন "মাঝে মাঝে আমি তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।" গানটি শুনে মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন "অনুভব না ক'রে খালি কাব্য করা, তাই এই

রকম কথা। যে বস্তুর এক মুহূর্তের স্বাদ মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত ক'রে দিতে পারে, সেই বস্তু সম্বন্ধে বলছে "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।" এর কারণ, সেই স্বাদ জীবনে লাভ হয়নি, তাই তার এক মুহূর্তের আস্বাদন জীবনকে কতখানি ভরে দিতে পারে, তা জানা নেই। ভাগবতে বর্ণনা আছে, নারদ পাঁচ বছরের ছেলে। তাঁর একমাত্র বন্ধন ছিলেন মা। সেই মায়ের মৃত্যুর পর তীব্র বৈরাগ্যে সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এক জায়গায় গাছের তলায় বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এমন সময় ভগবানের আবির্ভাব বোধ করলেন হৃদয়ে। অন্তর তাঁর ভরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। তখন ব্যাকুল অন্তরে তিনি আবার তাঁর দর্শন চাইলেন, এমন সময় দৈববাণী শুনলেন "নারদ, তুমি যা অনুভব করেছ, তাতেই তোমার সমস্ত জীবন ভরে থাকবে। এখন তুমি এই নাম গুণগান কীর্তন ক'রে বেড়াও। এতেই তোমার জীবনের সার্থকতা।" এই এক মুহূর্তের দর্শন সমস্ত জীবনটাকে পরিপূর্ণ ক'রে দিল। এটি হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞের, রসিকের ভাব ; কবিতা নয়, এ হ'ল অনুভূতি। সুতরাং সাক্ষাৎ আদেশ যদি কেউ পেয়ে থাকেন তো তাঁর পক্ষেই লোকশিক্ষা দেওয়া সম্ভব, অন্যথা নয়। এই লোকশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে দেখতে হবে যে মানুষ কি দৃষ্টিতে নিজেকে দেখছে, তার কর্মের কিভাবে মূল্যায়ন করছে। যদি সে লোকশিক্ষা দেবার অভিমান না নিয়ে, ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ মাত্র করে আলোচনার দৃষ্টিতে, তাতে দোষ নেই। কিন্তু যদি সেটা 'আমি শিক্ষা দিচ্ছি' এই অভিমান থেকে আসে, তা হ'লে তা অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীরা পরস্পর আলোচনা করছেন ; আর এই আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল তাঁদের মধ্যে কে ভগবানের মধ্যে কোন গুণ দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। এক একজন তাঁদের নিজের নিজের

অভিজ্ঞতা বলছেন। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে এর ভিতর একটা সৌন্দর্য, একটা স্বাভাবিকতা আছে, অহঙ্কার নেই। অহঙ্কার তখনি হ'ত, যদি তাঁরা বলতেন যে ভগবান এই রকম মাত্র, অন্যরকম নয়। আমি তাঁর ভিতর কি গুণ দেখে আকৃষ্ট হয়েছি, বলছেন সেই কথা, বর্ণনা সেই হিসাবে। ভগবান অনন্ত, অনন্ত প্রকারের বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে, অনন্ত গুণ তাঁর। এ কাকেও শিক্ষা দেওয়া নয়, এ শুধু পরস্পর ভাব-বিনিময়। এর মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষ তখনি হয় যখন কেউ গুরুর ভাব নিয়ে বেশ পায়ের উপর পা দিয়ে বলে "আমি বলছি, তোমরা শোন।"

সংসারীর কর্তব্য

এরপর একজন প্রশ্ন করছেন "যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ ক'রব ?" উত্তরে ঠাকুর বলছেন, "না, সব কর্ম ত্যাগ করবে কেন ? চিন্তা, তাঁর নাম গুণগান, নিত্যকর্ম এ-সব করতে হবে।" এ-সব করতে হয়, কারণ এগুলি তাঁকে পাবার উপায়। এর প্রতিকূল যেগুলি, সেগুলি থেকে সাধ্যমত বিরত থাকতে হয়। তখন ব্রাহ্মভক্তটি বললেন, "কিন্তু সংসারের কর্ম ? বিষয় কর্ম ?" ঠাকুর বলছেন, "হ্যাঁ, তাও করবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার।" তবে কর্মব্যস্ততা এমন যেন না হয় যে ভগবানকে চিন্তা করবার এক মুহূর্ত অবসর পাওয়া যায় না। জীবনের মধ্যে বিষয়কর্মেরও একটা অংশ আছে। সেই কর্ম সম্পাদনের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে হবে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে হবে যে সেই কর্ম যেন আমাদের সমস্ত সময়টা গ্রাস ক'রে না ফেলে। ভগবানকে ভুলে কর্ম নয়, তাঁকে লাভ করার জন্য কর্ম। তাই ঠাকুর সংসারী লোকদের বলেছেন, একহাতে তাঁকে ধরে অন্যহাতে কর্ম করতে। এগুলি খুব প্রয়োজনীয় কথা, তাই পুনরাবৃত্তি হলেও কথাগুলি

বার বার মনে করবার মতো। কারণ আমরা বেশীর ভাগই আছি সংসারের ভিতরে, সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তাই অনেক সময় মনে হয়, এই ব্যস্ততার মধ্যে হয় তো আমরা তাঁকে ভুলে যাচ্ছি। কাজেই মনে সংশয় জাগে, আর এই সংশয়াকুল মনে বার বার প্রশ্ন জাগে 'তা হ'লে উপায় কি?' উপায় যে কি—তা ঠাকুর বার বার ব'লে দিয়েছেন বিভিন্ন পরিবেশে; কখনও কোন নিরাশার ভাব তাঁর মধ্যে কেউ দেখেনি। সকলের জন্যই তিনি একনিষ্ঠ আশাবাদী, সকলেরই হবে; চাই কেবল আন্তরিকতা। যতক্ষণ সংসারের দায়িত্ব আছে, ততক্ষণ একহাতে তাঁকে ধরে অপর হাতে সংসার করতে হবে। আর যখন তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন, তখন দু-হাতেই তাঁকে ধরতে হবে।

জগতের উপকার সাধন

আজকাল অনেকে বলেন, জগতের উপকার করতে হবে আগে। এটা এই আধুনিক সমাজের মনোবৃত্তিরই প্রতিফলন। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, "জগৎ কি এতটুকু গা?—যে তুমি এর উপকার করবে। যাঁর জগৎ তিনি করবেন, যা করবার। তোমার এত ব্যস্ততা কেন?" একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, আমি যে জগতের উপকার করার জন্য এত ব্যস্ত, তার কারণ জগতের ব্যথিতদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, না অন্য কিছু? আর এই 'অন্য কিছু'র উৎস সন্ধান করতে গিয়ে কি আমার একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার, প্রতিষ্ঠা অর্জনের বাসনা খুঁজে পাওয়া যাবে না? এই দৃষ্টিতে কর্ম করতে গেলে সেটা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত করবে। এটা কর্মের দোষ নয়, দোষ কর্ম করার যে কৌশল, তা অবলম্বন না করা। আর এই কৌশল হ'ল তাঁকে ধরে কর্ম করা যাতে কর্মস্রোত জীবনের উদ্দেশ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে

যেতে না পারে। ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন, "ভগবানের সঙ্গে দেখা হ'লে কি কতকগুলো স্কুল হাসপাতাল ডিসপেনসারী চাইবে?" কেন এ-কথা বললেন? এগুলো তো ভাল কাজ। ভাল কাজ ঠিকই, কিন্তু ভগবানকে আস্বাদন করাকে গৌণ ক'রে কতকগুলো হাসপাতাল ডিসপেনসারীকে মুখ্য করা—এ ঠিক কাঞ্চন ফেলে কাঁচ নিয়ে খেলা করার মতো নয় কি? তিনি মুখ্য, তিনিই প্রধান—তারপর অন্য সব কিছু। তাই বলছেন, 'কালীঘাটে গিয়ে আগে যো সো ক'রে কালী দর্শন করো, তারপর দানধ্যান'। ভাব এই যে আমরা এই জগতে এসেছি, তাঁকে লাভ করবার জন্য, তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য—এ কথা যেন আমাদের ভুল হ'য়ে না যায়। কথামৃতে আমরা দেখি, ঠাকুরের এক জন্মদিনে কালীকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে একটু পরেই উঠে যেতে চাইছেন কোন একটা মিটিং-এ যাবার জন্য। সেটি শ্রমিক-কল্যাণ বিষয়ে। ঠাকুর বলছেন "এখানে কত হরিনাম হবে, কত আনন্দ হবে, ওর ভাগ্যে নেই।" ঠাকুরের আপসোস হ'ল। কিন্তু কেন? কালীকৃষ্ণ তো ভাল কাজই করতে যাচ্ছিলেন। ভাল কাজ বটে, কিন্তু সামনে ভগবদ্‌ভজনের যে সুযোগ রয়েছে, তাকে উপেক্ষা ক'রে একটা লোকহিতকর কাজের দোহাই দেওয়া—ঠাকুরের দৃষ্টিতে এটা স্বর্ণ সুযোগ হারানোর মতো।

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

স্বামীজী এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের 'আদর্শ বাক্য' দিয়ে গেলেন "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—সেখানে নিজের মুক্তির সাধনার সঙ্গে জগতের হিত জুড়ে দিলেন। সন্ন্যাসীদের সামনেও তিনি এ আদর্শ তুলে ধরলেন। অনেক সময় অনেকের মনে সংশয় ওঠে, জগতের হিত করতে গেলে আমাদের নিজেদের মোক্ষ ব্যাহত হবে কি না? একজন সাধু তাই হরি মহারাজকে লিখছেন, হরি মহারাজ খুব ত্যাগ বৈরাগ্যের

উপদেশ দিতেন কিনা, তাই ভাবলেন হরি মহারাজ হয়তো তাঁকে সমর্থন করবেন, লিখলেন "আমি ভাবছি কাজকর্ম আর ক'রব না, কেননা তা করতে গেলে অহংকার আসে।" হরি মহারাজ তার উত্তরে লিখলেন "আর বুঝি ভেবেছ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে অহংকার আসবে না।" এ-কথাটা আমাদের ভাল ক'রে বুঝতে হবে, যে মানুষ যে ভাবে তৈরী, তার মনের যে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি আছে, সবগুলি দিয়ে তাকে ভগবানের দিকে যাবার চেষ্টা করতে হয়। আমাদের যেমন অন্তরে চিন্তা করবার একটি যন্ত্র—মন রয়েছে, সেটি দিয়ে তাঁর চিন্তা করতে হয়, বাইরে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েও তেমনি তাঁর সেবা করতে হয়। স্বামীজী বার বার এই কথাটি বলেছেন যে, ভাগবানের সেবা কেবল একটি বিগ্রহের মধ্যে সীমিত রাখলে, আমরা তাঁর সেবাকে সংকীর্ণ ক'রে রাখলাম বুঝতে হবে।

ভাগবতবাণী

ভাগবতে এ-সম্বন্ধে পরিষ্কার বলা আছে :

> অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে
> ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

যিনি কেবলমাত্র ভগবানের বিগ্রহেই তাঁর পূজা করেন, অবশ্য শ্রদ্ধা-সহকারে না হ'লে তো তিনি ভক্তই হতেন না—এদিকে অন্যত্র এমন কি ভগবানের ভক্ত যাঁরা, তাঁদের দিকেও দৃষ্টি নেই—তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত বলে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাব তাঁর উপর বেশী। আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত সম্বন্ধে বলা আছে :

> সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
> ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

শ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি, তিনি সর্বভূতেই নিজের আত্মাকে দেখেন এবং 'ভূতানি

ভগবতি আত্মনি'—অর্থাৎ সমস্ত ভূতকে সেই ভগবানে দেখেন, যিনি তাঁর আত্মা। আত্মা যেমন প্রিয়, সেইরকম সর্বভূতই প্রিয়। ভগবান যেমন পূজার্হ, সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত ভগবানও সেইরকম পূজার্হ। তাই "জীবে দয়া" কথাটি ঠাকুরের পছন্দ হ'ল না, পরিবর্তে তিনি বললেন "শিবজ্ঞানে জীব-সেবা", যে কথা শুনে স্বামীজী বলেছিলেন "আজ একটা নতুন শিক্ষালাভ হ'ল, যদি ভগবান কখনও দিন দেন তো তা প্রচার ক'রব"। এই জন্যই যেন ঠাকুর তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, আর তাঁকে তৈরী করেছিলেন তাঁর হাতের যন্ত্ররূপে, যার পরিণামে আধ্যাত্মিক জগতে একটা নতুন সাধনার ধারা প্রবর্তিত হ'ল। লোককল্যাণের কথা আগেও প্রচলিত ছিল কিন্তু সর্বভূতে তাঁরই সেবা— এটি এমনভাবে পরিস্ফুট ক'রে বোধ হয় আর কখনো বলা হয়নি। যদিও ভাগবতে এর উল্লেখ আছে, তবু সাধনজীবনে এর প্রয়োগ করার এ-রকম সুস্পষ্ট নির্দেশ বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঠাকুর তাই বলেছেন, "ভগবানের পূজা গাছে হয়, পাথরে হয় প্রতিমায় হয়, আর মানুষে হয় না!" সর্বজীবের মধ্যে মানুষে তো তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কেননা এই মানুষের ভিতরেই তাঁকে লাভ করবার, তাঁর সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই দিক দিয়ে দেখলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। এই মানুষ এতদূর অবধি এগিয়ে যেতে পারে যে সে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা পর্যন্ত বোধ করতে পারে।

নরজন্ম ও আত্মজ্ঞান

ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখেই উপনিষদে মানুষকে খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ্ বলছেন—"যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে, যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে, ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে"। এই নরলোকে আত্মাকে কি রকম দেখা যায়? না,

দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন দেখা যায়, তেমনি নিখুঁতভাবে! আর পিতৃলোকে অনুভূত হয় স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর মতো; গন্ধর্বলোকে অনুভূত হয় জলের উপর পড়া প্রতিবিম্বের মতো; কেবল ব্রহ্মলোকে অনুভূত হয় স্পষ্টভাবে, আলো আর অন্ধকার যেমন পৃথক্, আত্মা সেখানে সেইরকম পৃথক্ অনাত্মা থেকে।

ব্রহ্মলোক মানে যেখানে মানুষের শুদ্ধি দেবতাদের শুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। সেখানের সঙ্গে এই তুলনা। তা হ'লে বুঝতে হবে মনুষ্যলোকের স্থান কত উর্ধ্বে। এই মানুষের ভিতরে তাঁর প্রকাশ কত স্পষ্ট। সুতরাং সেখানে তাঁর পূজা না ক'রে যদি আমরা যেখানে তাঁর অল্পপ্রকাশ কেবল সেখানে করি, তা হ'লে আমাদের পূজা যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়! তাই সর্বত্র তাঁর পূজা, এই দৃষ্টিতে যেন আমরা কাজ করি। যখন কারও সেবা করছি, তখন মনে করতে হবে সেবা করার সৌভাগ্য হচ্ছে বলেই সেবা করতে পাচ্ছি, সেব্যকে যেন নিজের থেকে উঁচু আসনে বসাই, আর নিজেকে যেন তার সেবক—এই দৃষ্টিতে দেখি। তা হ'লে আমাদের কাজে কোন ত্রুটি থাকবে না; মন ভগবান থেকে দূরে সরে যাবে না, আর কর্ম তখন আমাদের বন্ধনের কারণ না হ'য়ে বন্ধনমোচনের উপায় হবে।

তের

কথামৃত—১।৩।১-২

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্ত বেণীমাধব পালের বাগান-বাড়ীতে তাঁদের উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। মাস্টারমশাই এই বাড়িটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সেটি বাস্তবিক একটি সাধন-ক্ষেত্র। ঠাকুর আসবেন ব'লে ভক্তেরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে সেখানে এসেছেন।

চারদিক লোকে লোকারণ্য। ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসন গ্রহণ করলেন। এই যে বর্ণনাটুকু, এটুকু বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। কল্পনা করুন, উৎসব বাড়ি, সর্বত্রই ভিড় উপছে পড়ছে, এর ভিতর ঠাকুর আসছেন স্নিগ্ধ-মুখ, হাসতে হাসতে এসে আসন গ্রহণ করলেন। ভক্তেরা একদৃষ্টিতে তাঁকে দেখছেন। বলা বাহুল্য, এই দৃশ্যটি মাস্টারমশাই যেন তাঁর মানসনেত্রে ধ্যান করতে করতে রচনা করেছেন। কাজেই দৃশ্যটি এইভাবে রচিত হয়েছে যে আমরাও যেন ধ্যান ক'রে সেই চিত্রটি আমাদের মানস নেত্রে দেখতে পাই।

ঠাকুর বললেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব আর এক গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুসী হয়।"

ঠাকুর বলছেন যে ভক্তকে দেখে ভক্তের আনন্দ হয়, আর সেই আকর্ষণেই ঠাকুরের সেখানে আসা। যদিও ব্রাহ্মভক্তেরা সনাতন ধর্মের বিরোধী ছিলেন, তবু তাঁদের মধ্যে এমন একটা ঐকান্তিকতা ছিল যা তাঁকে আকৃষ্ট ক'রত।

এর পরেই ঠাকুর বলছেন "যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি,—"তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বসো, অথবা বলি, যাও, বিল্ডিং (রাসমণির কালীবাটীর সংলগ্ন কুঠি বাড়ি প্রভৃতি) দেখ গে।"

প্রাকৃত মানব

আমরা জানি যেখানে লোক-সমাগম হয়, সেখানে সকলেই কিছু এক ভাবের হয় না। কাজেই যাঁরা ভগবদ্‌ভক্ত তাঁরা ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কথাবার্তা মন দিয়ে শুনে আনন্দবোধ করবেন। আর যাঁরা এ ভাবের নন, স্বভাবতই তাঁদের এসব ভাল লাগবে না। ভাল যে লাগে না, তা আমরা চারদিকে চোখ চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারি। অসংখ্য

লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়তো ভগবদ্‌ভাব নিয়ে আনন্দ করে, আর বাকী সকলের কাছে এগুলি একটা বিরক্তির কারণ মাত্র। তুলসী-দাসের দোঁহায় আছে—"গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠি বিকায়"—দুধ ঘরে ঘরে গিয়ে ফেরি ক'রে বিক্রি করতে হয়, আর মদ ফেরি করতে হয় না; এক জায়গা থেকেই বিক্রি হয়; প্রয়োজনের তাগিদে লোক এসে নিয়ে যায়। কলকাতায় যাঁরা বাস করেন, তাঁরা জানেন যে যে-রাস্তায় সিনেমা-থিয়েটার পড়ে, সে রাস্তা দিয়ে হাঁটাই যায় না। সব সময় সেখানে ভিড় লেগেই রয়েছে। আর ভগবৎকথা শুনতে কজনই বা আসে। হয়তো কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে বলে "আচ্ছা ওখানটায় অত লোক জমা হয়েছে কেন, একটু গিয়ে দেখি।" যদি দেখে যে কীর্তন হচ্ছে তো বলে 'ও কীর্তন! তার চেয়ে যদি একটু মারামারি হ'ত তো দেখে আনন্দ হ'ত।" এই হ'ল মানুষের স্বভাব। ভগবানকে নিয়ে আনন্দ করা, এটা যেন সাধারণ মানুষের স্বভাবের বাইরে। যদি বা কেউ এ-রকম করে, তা হ'লে সে সকলের উপহাসের পাত্র হয়। আমরা যখন ছেলেবেলায় বেলুড় মঠে যাতায়াত করতাম, তখন অনেকে টিটকিরি দিত। "এই বয়সে অত সাধুদের কাছে যাওয়া কিসের জন্য। ওখানে আছেই বা কি?" তা হ'লে কি করতে হবে? ছোটবেলায় ছেলেরা খেলার মাঠে যায়—সে বেশ বোঝা যায়। একটু বয়স হ'লে তাস পাশা খেলে, তাও বেশ বোঝা যায়। এমনকি যখন বৃদ্ধ হয়, তখনও যেন সৎপ্রসঙ্গের অবকাশ হয় না। তখনও বিষয়-কথা নিয়ে মত্ত। কয়েকটি বৃদ্ধ একসঙ্গে জড় হ'য়ে যে সব আলোচনা করে, সেগুলো শুনলে বোঝা যাবে যে, সারা জীবন ধরে তারা যা ক'রে এসেছে, বসে বসে শুধু তারই জাবর কাটছে। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার, আর সেই পরিবর্তন যাতে হ'তে পারে, তার জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করতে হয়। জায়গায় জায়গায় ভগবৎ-প্রসঙ্গের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ক'রে রাখা উচিত, যাতে দুটি লোক

হলেও তারা সেখানে সৎপ্রসঙ্গ ক'রে নিজেদের ভাবকে আরও দৃঢ় করতে পারে। আর এই দু-চারজনকে দেখে আরও কিছু লোক আকৃষ্ট হ'তে পারে। অনেক সময় এমন দেখেছি, আমাদেরই ভিতর কেউ বলছে "তাই তো এখানে লোক বেশী আসে না।" তার উত্তরে একজন বলছেন "তার উপায় আছে। এসো আমরা মারামারি করি। এখনি লোক ভরে যাবে।" উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রসঙ্গে লোককে আকৃষ্ট করা। কিন্তু অন্য কোন আকর্ষণ দিয়ে তাদের ভগবৎপ্রসঙ্গে আনার কোন সার্থকতা নেই। কি পাশ্চাত্য দেশে, কি এখানে, দেবস্থানে লোক বেশী হয় না, তাই মাইক চালিয়ে দেওয়া হয়, একেবারে হাউ হাউ করে। আর বারোয়ারী হ'লে তো কথাই নেই। মনের স্বাভাবিক গতিই হৈ চৈ-এর দিকে, তাই এইভাবে লোককে আকর্ষণের চেষ্টা। কিন্তু দু-চারজন লোকও যদি একটা উচ্চভাব নিয়ে পড়ে থাকে এবং তারা যদি আন্তরিক হয় তো তার প্রভাব হয় অমোঘ। আমাদের বহির্মুখী দৃষ্টি অনেক সময় অনুষ্ঠানের সফলতা যাচাই করে সংখ্যা দিয়ে। অনেক সময় অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা তোমাদের ওখানে কত লোক হয় ?" আমি বলি, "লোক কোনদিন আমি গুনি না ; একটা পরিবেশ সৃষ্টি করাই আমাদের কাজ।" শাস্ত্র বলেছেন যে বহু লোক এদিকে আকৃষ্ট হয় না। অসংখ্য লোক এ পৃথিবীতে আসে, যারা 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-পর্যায়ে পড়ে। এসেছে, জন্মেছে, সুখদুঃখাদি ভোগ করছে, মরছে। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন জীবন।

জীবনের উদ্দেশ্য

যদি কাকেও প্রশ্ন করা যায়, "আচ্ছা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ?" সে বলবে, "উদ্দেশ্য আবার কি ?" জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে—এ-কথা যেন ভাবতেই পারে না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরকে

বলেছিলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আহার নিদ্রা ইত্যাদি। উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, "সমস্ত জীবন যেমন ক'রে কাটাচ্ছ, এখন তারই ঢেঁকুর উঠছে।" অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধিমান্। ঠাকুরের এই ভর্ৎসনা তিনি ভালভাবেই নিয়েছেন, বিরক্ত হননি এবং শেষে যেন অত্যন্ত বিনতির সঙ্গে বলেছেন "না মশাই, আমরাও হরিনাম করি।" খুব ভাল কথা। কিন্তু ও-রকম করলে হবে না। দু-চার জনের এটিকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কেবল মঠ-মন্দিরেই নয়, বাড়ীতে যে কোন জায়গায় যদি দু-পাঁচটি লোক এই ভাব দৃঢ়রূপে ধরে থাকে, তা হ'লে সেখানে ক্রমশঃ একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অবশ্য প্রত্যেক জায়গায় এমন একজন থাকতে হবে, যিনি হবেন সেই কেন্দ্রের প্রাণস্বরূপ ; যাঁর চরিত্র দেখে অপর লোকে আকৃষ্ট হবে। এই রকম ছোট ছোট কেন্দ্র যদি সর্বত্র ছড়ানো থাকে তো সর্বত্র একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বড় বড় সভা সমিতি ক'রে এই রকম পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না, কারণ সভাসমিতি লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করে মাত্র, জীবনকে স্পর্শ করে না। জীবনকে অত সহজে স্পর্শ করা যায় না, কারণ সে যে আরও গভীরে। এইজন্য ঠাকুরেরও এইসব জায়গায় যাতায়াত ছিল। ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, হরিসভায় যেতেন, এমনকি তান্ত্রিকদের সাধনচক্রেও যেতেন। তখনকার দিনের জ্ঞানী গুণী সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দর্শন করতেও তিনি গেছেন নিজে উপযাচক হয়ে। কালনায় ভগবানদাস বাবাজীকে দেখতে গেছেন, কলকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখতে গেছেন, শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখতে গেছেন, দয়ানন্দ স্বামীকে দেখতে গেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে এই বিশিষ্ট লোকদের ভিতরে যদি একটু ঈশ্বরীয় ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তো অনেক কাজ হবে। তিনি নিজে থেকেই তাঁদের কাছে গেছেন ; কারণ গরজ তো তাঁরই বেশী। যে কাজের জন্য

তাঁর আসা, সেই উদ্দেশ্যকে তো পূর্ণ করতে হবে। তিনি জানতেন যে 'মা'র ইচ্ছায় এই কাজ চলবে ; কাজেই তার ভূমিকা তৈরী করবার জন্য এইভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন মায়ের হাতের যন্ত্ররূপে।

ঠাকুরের আচরণ ও উদ্দেশ্য

এরপর ঠাকুর বলছেন যে "সংসারী লোকদের যদি বলো 'সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও' তো তারা কখনও শুনবে না।" ঠাকুর জানতেন যে খুব শুদ্ধভাব যদি প্রচার করা যায়, তা হ'লে খুব কম লোকই তা গ্রহণ করতে পারবে। শাস্ত্র তা জানে, আচার্যেরা তা বোঝেন ; আর যিনি স্বয়ং অবতার, তিনি তো ভাল করেই তা জানেন। এ জন্য ঠাকুর তাঁর ভক্তদের সঙ্গে শুধু যে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করতেন, তা নয়, রঙ্গরসও করতেন। তাঁর অগাধ স্নেহ বাপ-মার স্নেহকেও তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে—এ-কথা যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই বুঝেছেন। কত রকমে তাঁদের আকর্ষণ করছেন। কাকেও বলছেন "একে তামাক খাওয়ারে," কাকেও বলছেন "একে কিছু খেতে দে"—আবার কাকেও বলছেন "ওকে গাড়ির ভাড়াটা দিও।" এমনকি যখন তিনি অন্তিমশয্যায়, গিরিশবাবু গেছেন তাঁকে দেখতে, তাঁকে ফাগুর দোকানের কচুরী খাওয়াবার জন্য তাঁর কি ব্যস্ততা! চলতে পারেন না, তবু কোনরকমে কলসী থেকে জল নিয়ে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন। এত করার কি প্রয়োজন তাঁর ? প্রয়োজন এই যে, জানতেন যে এঁদের যন্ত্ররূপে তৈরী ক'রে যাচ্ছেন, যাঁদের মধ্যে দিয়ে অনেকে তাঁর ভাব গ্রহণ করবার সুযোগ পাবে। তাই এত কষ্ট এত ত্যাগস্বীকার। আমরা ভাবলে অবাক হয়ে যাই, কি সুন্দর সুষ্ঠু এক প্রণালীতে প্রচার কার্য এগিয়ে চলেছে যে বিষয়ে তিনি নিজেও হয়তো অবহিত ছিলেন না। 'অবহিত ছিলেন না' এইজন্য বলছি যে তা ছিল তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। এ ভাবেই

তাঁর প্রত্যেকটি কাজের দ্বারা লোককল্যাণ সাধিত হ'ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে।

চোদ্দ

কথামৃত— ১।৩।৬-৭

স্বামীজীকে যন্ত্ররূপে গঠন

সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণের সামনে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করছেন। ঠাকুর অনেক সময় বলতেন, "জ্ঞানপথ—বড় কঠিন।" তবে কখনও কখনও আমরা এর ব্যতিক্রমও দেখেছি। যেমন স্বামীজীকে তিনি জ্ঞান-পথের উপদেশ দিয়েছেন। যেমন তাঁকে শক্তি মানিয়েছেন, আবার তেমনি উপদেশও দিয়েছেন 'সবই ব্রহ্ম'। অবশ্য স্বামীজী তখনই সে-কথা মানেননি। উপহাস ক'রে বলছেন "ঘটি ব্রহ্ম, বাটি ব্রহ্ম!" ঠাকুর একটু হেসে বলেছিলেন "পরে বুঝবি"। তারপর সত্যসত্যই স্বামীজীর জীবনে এমন হয়েছে যে তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করছেন। বর্ণনা আছে, মা সামনে খেতে দিয়েছেন। নরেন্দ্র দেখছেন ভাত, থালা, বাটি সব ব্রহ্ম। সত্য-সত্যই সে অনুভূতি হ'ল, যখন তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করলেন। তার পরে আর ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করতে পারছেন না। আমরা দেখেছি, প্রথমে কেউ বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও ঠাকুর তাঁকে বাধা দিতেন না। তাই নরেন্দ্র যখন 'মা'কে মানতে চাননি, তখনও তাঁকে বাধা দেননি। পরে যখন স্বামীজী সেই 'মা'কে মানলেন, তখন ঠাকুরের কি আনন্দ! কারণ নরেন্দ্রনাথকে তিনি বিশেষভাবে তৈরী করেছেন এক পূর্ণাবয়ব যন্ত্র হিসেবে, আচার্য হিসেবে, যাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেবে বিভিন্ন ভাবের মানুষ, তাই

ঠাকুরের এত চেষ্টা, তাঁকে বিভিন্ন ভাব শেখানোর জন্য। এক ছটাক জলে যদি পিপাসা মেটে তো সমুদ্রে কত জল আছে সে খোঁজের দরকার কি? কিন্তু এ তো সাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য। নরেন্দ্রকে তো সেই সাধারণের পর্যায়ে ঠাকুর ফেলেননি। আপাতবিরোধী এই সব বিভিন্ন সিদ্ধান্তে নরেন্দ্রকে নিষ্ণাত ক'রে তাঁকে এক অপূর্ব যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন তিনি, যেখান থেকে ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে।

ঠাকুরের অহঙ্কারশূন্যতা

এর পর ঠাকুর বলছেন, বেদে যে সপ্তভূমির কথা আছে সেগুলি মনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা। এগুলি অনুভব দিয়ে বুঝতে হয়, যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। এর মধ্যে সপ্তমভূমিতে মন গেলে শরীরের আর কোন ক্রিয়া সম্ভব হয় না। ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখতে পাই, এই সপ্তমভূমি থেকে যখন আর তাঁর মন নামতে চাইছিল না, তখন দৈব-প্রেরিত হ'য়ে কোন একজন এসে তাঁর মন নীচে নামিয়ে কোন রকমে তাঁকে কিছু খাইয়ে দিতেন। এইভাবে প্রায় ছয়মাসকাল তিনি ছিলেন। অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে এই অবস্থায় বেশী দিন থাকা সম্ভব নয়। আমাদের শরীর যদি চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হয় তো তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। কিন্তু তা হ'লে আচার্যদের অবস্থা কি? ঠাকুর বলছেন তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের একটু 'বিদ্যার আমি' থাকে। শঙ্করাচার্য প্রভৃতির একটু 'বিদ্যার আমি' ছিল, তাই তাঁদের দ্বারা প্রচারকার্য হয়েছিল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন যে "এর ভিতর 'আমি' কিছু নেই, 'তিনি' আছেন।" এটি কিন্তু খুব আশ্চর্য কথা। "আমার একটুখানি অহঙ্কার আছে" এ-কথাটি কিন্তু তিনি বলেননি। বলেছেন "এর ভিতরে আর কিছু নেই; আমি নেই, এখানে

তিনি আছেন"—অর্থাৎ এই শরীরে আমি-বুদ্ধি করছেন না। বুদ্ধি করছেন—তাঁর শরীর একটি যন্ত্ররূপ, যাকে জগন্মাতা নিয়ন্ত্রণ করছেন, চালাচ্ছেন ; প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে এই শরীরে যতকিছু ক্রিয়া হচ্ছে, তা তাঁরই দ্বারা নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই যে দেহাভিমানশূন্যতা এবং নিজেকে জগন্মাতার যন্ত্ররূপে বোধ করা, এ একমাত্র অবতার-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

মনের বিভিন্ন স্তর

মনের যে সব ভূমির কথা বলা হচ্ছে, এগুলি হ'ল বিভিন্ন স্তর বা অবস্থা ; যেমন ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ইত্যাদি। প্রথমে মনের অবস্থা হয় পাগলের মতো। পাগল মানে যে সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস দেখে, সত্যকে মিথ্যা দেখে, মিথ্যাকে সত্য দেখে। এ হ'ল ক্ষিপ্ত অবস্থা। মূঢ় অবস্থায় বুদ্ধি কাজ করে না। এর পর 'বিক্ষিপ্ত অবস্থা' মানে মনের গতি হয় কখনও সত্যের দিকে, কখনও মিথ্যার দিকে ; সাধারণ জ্ঞান অনুসারে যাকে বলা যায়, কখনও ভগবানের দিকে কখনও সংসারের দিকে। এর পর 'একাগ্র অবস্থা', যখন মনকে বিষয় থেকে গুটিয়ে ধ্যেয় বস্তুতে নিবদ্ধ করা হয়। এর আর একটু উঁচু অবস্থার নাম 'নিরোধ' অবস্থা, তখন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়। তারপর হ'ল 'স্বতঃ ব্যুত্থান', এ হ'ল 'সমাধির অবস্থা', কিন্তু এ অবস্থায়ও মনের মধ্যে সংস্কারের লেশ থাকার জন্য মন নিজে থেকে সমাধি থেকে নেমে আসে। এর পর আরও একটু এগিয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, তার নাম 'পরতঃ ব্যুত্থান,' যখন মন নীচে নামতে চায় না, একমাত্র অপরে চেষ্টা ক'রে তাকে নামাতে পারে। এইভাবে বিভিন্নভূমির সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় হয়েছে এবং তিনি হয়েছেন জগন্মাতার এক অপূর্ব যন্ত্র।

এর পর ঠাকুর বলছেন যে "এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা বড় কঠিন। তোমাদের ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।" কথাটি কেন বললেন, তা

বোঝা মুস্কিল। বোধহয় এইজন্য বললেন যে এইরকম ব্যক্তিত্বলোপের অবস্থা হয়তো সকলে পছন্দ করবে না। ব্রহ্মজ্ঞানী, যে ব্রহ্মের অনুসরণ করছে, ব্রহ্মের অবস্থা লাভ করবার চেষ্টা করছে, সেও হয়তো ভয় পেয়ে যাবে নিজের অবশ্য-মৃত্যুর কথা ভেবে। তাই বলছেন "তোমাদের ভক্তিপথ খুব ভাল ও সহজ পথ।" ভাল কেন? না, বহুলোকের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করা সম্ভব। সাধারণের পক্ষে—জ্ঞানীর মতো নিঃশেষে নিজের 'আমি'কে বিলীন ক'রে দেওয়া সহজ নয়।

মথুরবাবুর ভাবাবস্থা

এতটুকু কামনার লেশ থাকলে সমাধি তো দূরের কথা, কোন উচ্চ ভাবভূমিতেই স্থির হ'য়ে থাকা সম্ভব হয় না। যেমন হয়েছিল মথুরবাবুর। মথুরবাবু ভাবের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "ও-সব মার ইচ্ছা হ'লে হবে।" পরে যখন সত্য-সত্যই মথুরবাবুর ভাব হ'ল, তখন তিনি এতই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন যে ঠাকুরকে বললেন "বাবা, তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার এই ভাবের চোটে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে; কোন দিকে আমি মন দিতে পারছি না।" সামান্য একটু ভাবের উন্মেষেই এই অবস্থা, আর যদি ভাবের এমন বেগ আসে যে সমস্ত মন লীন হ'য়ে যায়, তো তা মানুষের পক্ষে হয় নিতান্ত অসহ্য। এইজন্য বলেছেন "যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদ্ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ"—যোগীরা পর্যন্ত এই অভয়স্বরূপকে দেখে ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেন।

আমিত্বের লোপ

যখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি"—এর পর এ অবস্থা অতিক্রম ক'রে গেলে আর সংজ্ঞা থাকে না। সংজ্ঞা বলতে জ্ঞান ধরেছেন এবং জ্ঞান মানে 'আমি' 'তুমি' এইসব

সংসারের জ্ঞান। এ সব লোপ হ'য়ে যাবে শুনে মৈত্রেয়ী ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন, "এই অবস্থা নিয়ে আমি কি ক'রব ; এ অবস্থা তো আমার ভাল লাগছে না।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বোঝালেন যে "সংজ্ঞা মানে এ নয় যে সেখানে গিয়ে তোমার সত্তাও লুপ্ত হ'য়ে যাবে। সংজ্ঞা মানে জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান, সে সব লোপ পেয়ে যাবে।" তাঁর বোঝানোর পর হয়তো মৈত্রেয়ীর ভয় দূর হ'ল, কিন্তু সাধারণ মানুষের এ ভয় কখনও যায় না। সে যদি মনে ক'রে যে তার আমিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে যাবে, তা হ'লে সে অবস্থা সাধকদের যতই কাম্য হোক না কেন, মানুষ তা চায় না ; বলে, 'দরকার নেই ও-রকম অবস্থার, আমি যেমন আছি এই বেশ।' এই হ'ল সাধারণ মনের অবস্থা। তাই ঠাকুর বলছেন "তোমাদের ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।" ঠাকুর বলছেন, "আমায় একজন বলেছিল, মহাশয়, আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন ?" সকলে হাসছেন। সমাধি' শুনে মানুষের একটু আকর্ষণ হয়। শিখে নিলে সমাধির অবস্থাটা যদি উপভোগ করা যায় তো মন্দ কি ? বহুবার বলেছি, পাঁচ টাকার সমাধির কথা। একজন নিয়মিতভাবে সমাধি বিক্রি করতেন, পাঁচ 'টাকা যার দাম। একসঙ্গে অনেকগুলি লোককে বসিয়ে তিনি তাদের বলতেন, এইভাবে ভাবো। এর পর তাদের উপর সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে তিনি তাদের এমন অবস্থায় পৌঁছে দিতেন, যাতে তারা অন্ততঃ মনে ক'রত যে তাদের সমাধি হয়েছে। আর এই সমাধিও ছিল খুব সুলভ, মাত্র পাঁচ টাকা তার দাম। তাই একজন বলেছিলেন "মশাই, সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন ?"

ভাবে কর্মাভাব

আমরা যেভাবে ভগবানের লীলাকীর্তন করি, তাঁকে নিয়ে লীলা-বিলাসের কথা বলি, মানুষ যখন একেবারে তাঁতে লীন হ'য়ে যায়, তখন

আর তাঁকে নিয়ে সে ভাবে লীলাবিলাস সম্ভব হয় না। তাই ঠাকুর বলছেন "ঈশ্বরের দিকে যত এগিয়ে যাবে, কর্মের আড়ম্বর তত কমে আসবে। এমন কি তাঁর নাম গুণগান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়।" ভক্তেরও এই ভাবে সমাধি হ'তে পারে, তখন তার দ্বারা আর বাহ্য অনুষ্ঠানাদি সম্ভব হয় না। ঠাকুর বলছেন যে এই অবস্থায় তর্পণ করতে গিয়ে তিনি তা করতে পারেননি, পরে হলধারী বুঝিয়ে দিলেন যে এটা সাধনের একটা স্তর, যেখানে গেলে মানুষের এ-রকম অবস্থা হয়।

এর পর ঠাকুর বলছেন যে অবতার ও সিদ্ধ-পুরুষের স্তর-বিভাগের কথা। 'অবতার' বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন—যেখানে শক্তির বিশেষ প্রকাশ। অবতার, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ—শক্তির প্রকাশের তারতম্য অনুসারে এদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়। ভগবানের শক্তি সকলের মধ্যে আছে পূর্ণভাবে, কিন্তু তার প্রকাশের তারতম্য আছে। এ-কথা আমরা ব্যাবহারিক জগৎ থেকে বুঝতে পারি। তাই তিনি বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তাঁর ভিতর ঐশী শক্তির বেশী প্রকাশ বলেই লোকে তাঁকে দেখতে আসে। যে বস্তু অখণ্ড, তাকে খণ্ড ক'রে কোন জায়গায় কম, কোন জায়গায় বেশী এ-রকম তো করা যায় না। একটি ধূলিকণাতে পর্যন্ত ভগবানের সত্তা পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। কেবল প্রকাশের তারতম্য। আর এই থেকেই বোঝা যায় কে বদ্ধ, কে মুমুক্ষু, কে মুক্ত, কে সিদ্ধ আর কে বা অবতার।

লেকচার ঃ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

এর পর লেকচার দেওয়ার কথা উঠল। ঠাকুর বললেন "একবার কেশবকে বললাম, তোমরা কি রকম ক'রে লেকচার দাও, আমি শুনবো।" বলা বাহুল্য কেশব অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন ; তিনি বক্তৃতা দিলেন। ঠাকুর বলছেন 'শুনে আমার সমাধি' হ'য়ে গেল।' এত আনন্দ

তার ভিতর পেয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছেন "তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা অত বলো কেন ? ভগবান তুমি অমুক করেছ, তমুক করেছ। তুমি সুন্দর ফুল করেছ, আকাশ করেছ—এই সব।" যারা নিজেরা ঐশ্বর্য ভালবাসে, তারাই ভগবানের ঐশ্বর্যের এত ক'রে বর্ণনা করে। তাই যতক্ষণ আমাদের ঐশ্বর্যের মোহ থাকে, ততক্ষণ ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি থাকে। কিন্তু যত তাঁর নিকটে যাওয়া যায়, তত তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ গাঢ় হয়, তত তাঁর ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি কমতে থাকে। তাই যে ভগবানকে প্রথম প্রথম মনে হয়—অনন্ত-শক্তিস্বরূপ, তিনিই শেষে হন অনন্ত-প্রেমস্বরূপ। শান্ত ও দাস্যে যে ঐশ্বর্যের ভাব থাকে, সখ্যের ভিতর সেই ভাব কমতে থাকে, কমতে কমতে বাৎসল্যে সে-ভাব একেবারে লোপ পেয়ে যায়। মা যেমন সন্তানের কাছ থেকে কিছু আশা করেন না, তাকে তাঁর দেবারই থাকে, নেবার কিছু থাকে না, ভগবানের সঙ্গে যখন ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ হবে, তখন তাঁর দিকে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। আর সবশেষে মধুর ভাব ; সেখানে প্রেমে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একীভূত হ'য়ে যাওয়া, যেখানে আর দুই-ভাব থাকে না।

এর পর জন্মান্তরের কথা উঠল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি জন্মান্তর মানেন ?" ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝব ? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।" ভগবানের লীলা আমরা কি বুঝব ? ভীষ্ম-দেবের সেই শেষ কথা : ভগবানের লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না। যে ভগবান জগতের রক্ষাকর্তা, তিনি পাণ্ডবদের সারথি হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, তবু তাঁদের দুঃখের শেষ নেই। ভাব এই যে—তোমরা এখানেই তাঁর যথেষ্ট লীলা দেখতে পাচ্ছ, তা-ই বুঝতে পারছ না ; আবার জন্মান্তরের চিন্তায় মাথা ঘামানো ! তা থেকে এই জন্মে এই জীবনটা

যাতে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগতে পারে, তার চিন্তাই করা উচিত। অনন্ত জগতের সবকিছু তো জানা সম্ভব নয়, আর দরকারই বা কি নিষ্প্রয়োজন কতকগুলি সিদ্ধান্ত মাথায় পুরে রাখার? এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পেয়েছি, ভগবানের কথা শুনেছি, তাঁর উপর হয়তো একটু ভালবাসাও এসেছে। এখন চেষ্টা করতে হবে তাঁর চিন্তা করবার, চেষ্টা করতে হবে তাঁতে ডুবে যাবার, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করবার।

পনেরো

কথামৃত—১।৪।১-২

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। এই বিজয়কৃষ্ণ এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী আচার্য। তাই তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়। স্বাধীন চিন্তার সুযোগ কম। কিন্তু তাঁর ভিতর পরম বৈষ্ণব অদ্বৈত গোস্বামীর যে ভাব তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন, তা অন্তরে এখন বিকশিত হচ্ছে। তাঁর সেই ভক্তি, সেই প্রেমের উপর যে আবরণ ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। তিনি ঠাকুরের কথামৃত আকণ্ঠ পান করছেন, আবার কখন কখন হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে ঠাকুরের সঙ্গে বালকের ন্যায় নৃত্যও করছেন।

জন্মান্তরবাদ ও শাস্ত্র

কথাপ্রসঙ্গে একটি ভক্ত ছেলের কথা উঠল, যে গলায় ক্ষুর দিয়ে দেহত্যাগ করেছে। এ-কথা শুনে ঠাকুর বললেন "বোধ হয় তার শেষ জন্ম।" ঠাকুরের এই কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবন করবার মতো।

জন্মান্তর সম্বন্ধে ঠাকুর সাধারণতঃ কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে হয় বলতেন "এ-রকম শুনেছি"—নয় বলতেন "শাস্ত্রে আছে"। এখানে বলছেন, "পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়"। কেন না, তা না হ'লে কারো কারো যে আবাল্য শুভসংস্কার দেখা যায়, তা কোথা থেকে আসে? সে তো এ জীবনে তা অর্জন করেনি! সুতরাং কল্পনা করতে হয়, এগুলি তার পূর্বজীবনের অর্জিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে এ গল্পটি বললেন, একজন শব-সাধনা করতে বসে নানা বিভীষিকা দেখতে লাগল, শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে গাছের উপর উঠে বসেছিল। সব উপকরণ তৈরী দেখে সে শবের উপর বসে সাধনা শুরু ক'রে দিল। অল্প জপ করতেই মা প্রসন্না হ'য়ে তাঁকে দেখা দিলেন। তখন সে মাকে বললে "মা, তোমাকে ডাকার জন্য যে এত আয়োজন ক'রল, তার কিছুই হ'ল না; আর আমি কিছুই করিনি, আমার উপর তোমার কৃপা হ'ল!" তখন মা বললেন, "ওরে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোর এই সাধনা চলে এসেছে। তারই পরিপক্ক অবস্থাতে তুই আমার দর্শন পেলি।" ভাবটা হচ্ছে এই যে, পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে মানুষের জন্ম হয়। এক জন্মই তো শেষ নয়। যদি এক জন্মে সব শেষ হ'য়ে যেত, তা হ'লে "কৃতহানি, অকৃতাভ্যাগম" দোষ হ'ত। একজন অনেক শুভকার্য ক'রল, কিন্তু এ জীবনে হয়তো তার কোন ফল দেখা গেল না; আবার আর একজন আবাল্য শুভ বা অশুভ কর্মফল ভোগ করছে, যা সে এ জীবনে অর্জন করেনি, 'অকৃত' অর্থাৎ যা সে করেনি। শাস্ত্রকার বলছেন, কর্মফল কিছুই নষ্ট হয় না; পরজন্মে সেগুলির ভোগ হবে। ঠিক এই কথা আমরা গীতাতেও পাই। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, যদি কেউ সাধনা করতে করতে যোগভ্রষ্ট হয় অথবা সিদ্ধির আগেই তার শরীরপাত হয়, তার কি হয়? শাস্ত্র বলছেন, সে যা কিছু করেছে, তার কিছুই নষ্ট হয় না। গীতা বলছেন, 'নহি

কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না। অর্জুনের প্রশ্ন—এক চিরন্তন প্রশ্ন : 'যোগাচ্চলিতমানসঃ' যোগ থেকে কোন কারণে যার মন সরে গেল, তার কি অবস্থা হবে? সে কি ছিন্ন মেঘের মতো উভয়ভ্রষ্ট হ'য়ে নাশপ্রাপ্ত হবে? এই ছিন্ন মেঘের মতো নাশপ্রাপ্ত হওয়া, পাহাড়ে যারা মেঘের খেলা দেখেছেন, তারা জানেন। একটা মেঘ এসে পাহাড়ের গায়ে লাগল; লেগে যখন আবার উঠে গেল মেঘটা, তখন ঐ মেঘের এক টুকরো হয়তো পাহাড়ের গায়ে আটকে গেল। সেই টুকরোটি কিছুক্ষণ পরে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অর্থাৎ সেটা মেঘেও স্থান পেল না, আবার পাহাড়েও স্থান পেল না, সেইরকম যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কি ইহকাল কি পরকাল দুই-ই নষ্ট হবে? শাস্ত্র বলছেন, তার কিছুই নষ্ট হবে না। এ জীবনে সে যা কিছু ক'রল, তাই তার পরবর্তী জীবনে পাথেয় হিসাবে রইল, যা দিয়ে সে সেই জীবন শুরু করবে। আর এই কারণেই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে: কারো ভিতর থাকে আবাল্য ভগবৎপ্রেম, আবার কেউবা মলিন মন নিয়ে জন্মায়। এই যে শুদ্ধি বা মলিনতা, তা তো সে এ জন্মে অর্জন করেনি। সুতরাং বুঝতে হবে এর পিছনে রয়েছে পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার। সুতরাং "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্"—শুভ বা অশুভ কর্ম যা করা হয়েছে, তার ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। এখন এই যে 'অবশ্য ভোক্তব্য'—তা আমরা এক জীবনে দেখতে না পেয়ে ভাবি যে পরজীবনেও হয়তো তা পাওয়া যাবে না। অনেক দুষ্কৃতকারী সারাজীবন দুষ্কর্ম করেও দাপটে কাটিয়ে যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এইসব দেখে আমরা ভাবি, তা হ'লে তার দুষ্কৃতির পরিণাম তো কিছুই দেখা গেল না? শাস্ত্র বলছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের পরিবর্তন হ'ল মাত্র, সংস্কারের পুঁটলি ঠিকই রয়ে গেল; ফলে কোন না কোন সময় তাকে কৃতকর্মের ফল ভোগ

করতেই হবে। সুতরাং সাধনার ধারা পরবর্তী জীবনেও চলতে থাকে যদিও এ সম্বন্ধে তার নিজের স্মৃতি থাকে না। গীতায় তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন :

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

তোমার আমার বহু জন্ম হয়েছে ; আমি সে সব জানি, কিন্তু তুমি তা জানো না। আমাদের এই শাস্ত্রবাক্য শ্রদ্ধাসহকারে মেনে নেওয়া ছাড়া পরীক্ষা করার কোন উপায় নেই। "কৃতহানি, অকৃতাভ্যাগম" এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদ সিদ্ধ করলেও তাতে মানুষের বিশ্বাস স্থির হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাইবেলের উক্তি

তবে এ সম্বন্ধে ঠাকুরের ভাবটা হচ্ছে যে, তুমি যে জন্মটা হাতের কাছে পেয়েছ, তাকে কাজে লাগাও ; আগের বা পরের জন্ম যেগুলি নাগালের বাইরে সে সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? যে জন্ম তোমার হাতের মধ্যে, তাকে উপভোগ কর ; তারপর যদি জন্মান্তর থাকে, তাও কাজে লাগবে, আর যদি নাও থাকে তা হলেও কিছু নষ্ট হবে না। বাইবেলে একটা কথা আছে। একজন যীশুকে বলছেন যে আপনি লেজারাসকে পাঠিয়ে দিন। ওর মুখে জন্মান্তর আছে' শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে ও ধর্মপরায়ণ হবে। যীশু বলছেন 'লেজারাস বললেই কি তারা বিশ্বাস করবে। কত প্রফেট অবতীর্ণ হ'য়ে কি লোককে এ-কথা বলেননি, কিন্তু লোকেরা কি তাঁদের কথায় বিশ্বাস করেছে ?' এখন প্রশ্ন হ'ল, ধরা যাক যে জন্মান্তর আছে। শাস্ত্র বলছেন, আত্মহত্যা মহাপাপ আর এই মহাপাপের ফলে মানুষকে ফিরে ফিরে জন্মাতে হয়। ঠাকুর বলছেন, যাঁরা জ্ঞানলাভ করার পর আত্মহত্যা ক'রে শরীর ত্যাগ করেন, এই পাপ

আত্মহত্যা ঃ উপমা ও ব্যাখ্যা

উপনিষদে বলেছেন, আত্মহত্যা যারা করে, তারা এক দুঃখময় অন্ধকার লোকে যায়—পুরাণাদিতে যাকে 'নরক' বলে। মানুষ আত্মহত্যা করে কখন ? না, যখন তার শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ তার সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। সহ্য করতে পারে না ব'লে সে এই শরীরটাকে সব দুঃখের মূল ব'লে সেটাকে নষ্ট ক'রে দেয়। এখন এই শরীরটা নাশ করেও যদি দুঃখের নিবৃত্তি না হয়, তো এই শরীরটা নাশের কোন সার্থকতা নেই। তাই ঠাকুর বলছেন 'ফিরে ফিরে আসতে হয়।' তাই তাঁর চেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে দুঃখকষ্ট সহ্য করা ভাল। তবে ঠাকুর বলছেন, যাঁদের এই শরীরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, তাদের পক্ষে আত্মহত্যায় শরীর-ত্যাগে পাপ হয় না। ঠাকুর অন্য জায়গায় উপমা দিয়ে বলছেন যে কুয়ো খোঁড়া হ'য়ে গেলে যখন জল বেরোতে থাকে, তখন কেউ কেউ সেই কুয়ো-খোঁড়ার উপকরণ সেই ঝুড়ি-কোদাল ফেলে দেয়। ঠিক সেই রকম এই শরীর দিয়ে ভগবান লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এখন যার এই দেহ-মন দিয়ে ভগবান লাভ হ'য়ে গেছে, তার আর এই শরীরের কোন প্রয়োজন নেই। তবে যাঁর মনে ভগবান লাভের পর লোককল্যাণ-কামনা আসে, তিনি এই শরীটাকে রাখেন তাপিত তৃষিত মানুষকে সেই অমৃতের সন্ধান দিতে ; সেই কুয়ো খোঁড়া হ'য়ে গেলে ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেবার মতো। কিন্তু ভগবান লাভ করবার আগে যে আত্মহত্যা করে, তার পক্ষে সেটা খুবই দুর্ভাগ্য-জনক, কেননা তখনও সেই শরীর দিয়ে ভগবান লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব ; অন্ততঃ সম্ভাবনা আছে, আর এই সম্ভাবনা আছে বলেই এই শরীরটাকে নষ্ট করা তার অন্যায় ; তার পক্ষে ক্ষতিকর—এটি বোঝাবার জন্যই ঠাকুর বলছেন, শরীরটাকে অত তুচ্ছবুদ্ধি করা উচিত নয়। এই শরীর ভগবানের মন্দির, যে মন্দিরে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের

উদ্দেশ্য। তাই তাকে সুস্থ, সুন্দর, সবল রাখতে হয়। যে তা করে না, সে তার দুর্বলতারই পরিচয় দেয়, যে দুর্বলতা তাকে অধিকতর কষ্টের মধ্যে ফেলে, ঠাকুর যাকে বলেছেন 'ফিরে ফিরে আসা।'

আমরা কারো গায়ে পা লাগলে তাকে প্রণাম করি। এখন এই প্রণাম করি কাকে, না ভগবানকে, যিনি সেই দেহরূপ মন্দিরে বাস করছেন। বড়দের পর্যন্ত ছোটদের এই বুদ্ধিতে দেখতে হয়, কারণ সবই যখন ভগবানের মন্দির, তখন ছোট বড় তফাৎ কোথায়? সে মন্দিরে কারো কাছে বিগ্রহ প্রকাশিত, কারো কাছে অপ্রকাশিত। কিন্তু সকলেরই কাছে রয়েছে সে বিগ্রহ প্রকাশের সম্ভাবনা। কাজেই যে-যন্ত্র দিয়ে ভগবান লাভ সম্ভব, সেই যন্ত্রটিকে তুচ্ছ করতে নেই, অবহেলা করতে নেই। সেই দিক দিয়ে দেখে শাস্ত্র শরীর নষ্ট করাকে 'মহাপাপ' বলেছেন। পাপ আর পুণ্যের মাপকাটি হ'ল এই ঃ যা ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তাই 'পুণ্য,' আর যা ভগবানের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তাই 'পাপ'।

পুণ্যকর্মের স্তুতি

কখন কখন স্বর্গে যাবার জন্য মানুষ পুণ্য করে—এক হিসাবে এও মানুষের মনকে ক্রমশঃ শুদ্ধ ক'রে ভগবানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অবশ্য শাস্ত্র বলেছেন এই স্বর্গের দিকে দৃষ্টি, স্বর্গের দিকে আকর্ষণ—এও আমাদের বন্ধন সৃষ্টি করে; যেমন এ পৃথিবীতে বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকলে মানুষ ভগবানকে ভুলে যায়, ঠিক তেমনি স্বর্গের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি থাকলে সে মন ভগবানের দিকে যায় না। কিন্তু স্বর্গলাভের সাধন যে-সব শুভকর্ম, উপাসনা প্রভৃতি—এগুলি মানুষের মনকে ধীরে ধীরে শুদ্ধ করে এবং এই শুদ্ধির পরিণামে সে কিছুটা ভগবানের দিকে এগিয়ে যায়। এই জন্যই শাস্ত্রে পুণ্যকর্মের এত

প্রশংসা করা হয়েছে। লোভপ্রবণ মানুষের মন ভোগের জন্য লালায়িত থাকবেই, কিন্তু এই লালসা তাকে যাতে দেহসর্বস্ব ক'রে অধোগামী না করে, তার জন্য শাস্ত্র বলেছেন যে তোমার ভোগের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে, যদি তুমি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে এগোও। এখন এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে কতকগুলি সংযমের বাঁধনে সে বাঁধা পড়ে, যার ফলে তার আর পশুর মতো জীবনযাপন সম্ভব হয় না। এই যে ভোগলোলুপ মানুষ শাস্ত্রীয় পথে তার নিজের অজ্ঞাতসারে তার পশুসুলভ বৃত্তির উপর কিছুটা লাগাম টেনে দেয়, এটা হয় তার চিত্তশুদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ। এঁর পর ক্রমশঃ আরও কিছুটা শুদ্ধ হওয়ার পর শাস্ত্র তাকে ব'লে দেন 'ও-সব ভোগের দিকে নজর দিও না। তুমি নিষ্কামভাবে যাগ-যজ্ঞাদি যা ক'রছ কর' ; হয়তো বা আবার বলছেন 'ভক্তিই সার কর' অথবা বলছেন 'আত্মাকে জানো।' এগুলি গোড়ায় বললে কিন্তু কোন লাভ হ'ত না।

মানবমনের ক্রমোন্নতি

ঠাকুর তাই বলছেন, "যখন কোন লোক কাছে আসে, আর দেখি তার ভিতরে প্রবল ভোগের বাসনা রয়েছে, তখন তাকে বলি, 'খেয়ে লে ; প'রে লে'" অর্থাৎ খেয়ে প'রে ভোগ ক'রে নাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেন 'কিন্তু জেনো এগুলো কিছুই নয়।' অর্থাৎ এ-সব দিয়ে তোমাদের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কিন্তু প্রথমেই ভোগ করতে বারণ করলে সে-কথা কেউ শুনত না। তারা ভাবে ঠাকুর যখন ভোগ করতে বলছেন, তখন খেয়ে প'রে ভোগ করতে বাধা কোথায়? বাধা কোথাও নেই। শাস্ত্রও আমাদের বাধা দেননি। বলেছেন করো, কিন্তু জেনো 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—এগুলি সব বলেছেন মানুষের স্বভাব। স্বভাব- ই এতে দোষ নেই, সে বেচারী কি করবে? মন চাইছে

ভোগ। আমরা যদি বলি 'ভোগ ক'রো না, এটা অন্যায়'—সে শুনবে না। কাজেই তাকে ছেড়ে দিতে হয়, একটু ভোগ করো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছেন "জেনো, এগুলি কিছু নয়।" বিচার ক'রে ভোগ করবে। চারেতে যখন মাছ গাঁথে মাছটা তখন সুতো টানতে আরম্ভ করে ; আর তখনই কিছুটা সুতো ছেড়ে দিতে হয়। প্রথমে সুতো ছেড়ে দিয়ে পরে কিছু খেলিয়ে মাছটাকে তুলতে হয়। কেননা প্রথমেই টানলে সুতো ছিঁড়ে যাবে। তাই যারা প্রবল ভোগপরায়ণ, ঠাকুর তাদের ভোগ ক'রে নিতে বলতেন, কিন্তু শেষে এও বলে দিতেন 'কিন্তু জেনো—কিছুই কিছু নয়।' এই শেষের কথাটি হয়তো তখন তাদের মনে থাকে না, প্রথম কথাটাই মনে থাকে। কিন্তু এমন সময় আসে, যখন মনে হয় যে ঠাকুর যেন শেষে কি একটা কথা বলেছিলেন। সেই শুভ মুহূর্তে মনে পড়বে, তাইতো ঠাকুর তো বলেছিলেন "এ-সব কিছুই কিছু নয়।" শাস্ত্রও তাই আমাদের যার যেমন মনের আকাঙ্ক্ষা সেই অনুসারে তাকে উপদেশ দিয়েছেন। যে পুত্রের কামনা করছে, তাকে পুত্রেষ্টি-যাগের বিধান দিয়েছেন, যে শস্য-সম্ভার চাইছে তাকে বৃষ্টির জন্য কারীরী-যাগ করবার উপদেশ দিয়েছেন, এমনকি যে শত্রু বিনাশের জন্য ব্যাকুল, তাকেও শ্যেনযাগ ক'রে শত্রু বিনাশ করবার উপায় ব'লে দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে শাস্ত্র এ-রকম অসৎ কর্মে কেন আমাদের প্রবৃত্ত করছেন? শাস্ত্র প্রবৃত্ত করছেন না। মানুষ নিজেই প্রবৃত্ত হচ্ছে। শাস্ত্র তার ভোগপ্রবণ মনকে একটু শাস্ত্রমুখী করবার চেষ্টা করছেন মাত্র। শাস্ত্র যদি কেবলমাত্র উচ্চতম আদর্শের কথাই বলতেন, তা হ'লে তা হতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য ; বেশীর ভাগ লোককে শাস্ত্র-ধর্ম ছাড়াই চলতে হ'ত। শাস্ত্র আমাদের সকলের এই প্রয়োজনটি বুঝেছেন ; আর বুঝেছেন ব'লে যার যেমন মন, তাকে তার উপযোগী ক'রে উপদেশ দিচ্ছেন।

খ্রীষ্টের উপদেশ

একজন ভক্ত যীশুখ্রীষ্টকে এসে বললেন যে "আমি ভগবানের পথে যেতে চাই, কি ক'রব ?" যীশু তাকে বললেন, "তুমি এই কর, ঐ কর।" সে বললে "আমি তো এই সব করি। আমি আয়ের এক-দশমাংশ দান করি, আরো যা যা বিধান সবই করি।" তখন যীশু বললেন "Then leave all and follow me"—তা হ'লে সব পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে চলে এস। তিনি গোড়াতেই কিন্তু সকলকে ডাকছেন না তাঁর সঙ্গে চলে আসবার জন্য। কারণ সে-রকম ডাকলে সকলে চলে আসবেও না ; দু-চারজন হয়তো তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, বাকি সব নিজেদের পথে চলবে। কাজেই তাদের জন্য রোগ ভাল করতে হবে ; মৃতকে বাঁচাতে হবে ; জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। বাইবেল পড়লে মনে হবে, যত সব অলৌকিক কাজে ভরা। যীশুর কি খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না যে বাজীকরের মতো যতসব অলৌকিক কাজ ক'রে বেড়িয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে যাদের জন্য তাঁর আসা, তারা কি ক'রে তাঁকে জানতে পারে কি ক'রে তাঁর অনুসরণ করতে পারে, কতটুকু তারা চলতে পারে, তা দেখতে হয়।

উপদেশের বৈচিত্র্য

ঠাকুর তাই বলছেন, যে যেমন তাকে সেই রকম উপদেশ দিতে হয়। শাস্ত্র আমাদের তাই-ই করেছেন, তবু আমরা যখন বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্র বিচার করি, তখন বিভ্রান্ত হই এই দেখে যে, যে-শাস্ত্রে উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা আছে, সেই শাস্ত্রের অন্য জায়গায় আবার আছে অত্যন্ত অনুন্নত ধরনের নিয়ম-আচার। তার কারণ সমাজটাই যে এই-রকম। এই সমাজেই কত বিচিত্র রকমের মানুষ আছে। এই বৈচিত্র্যের জন্যই উপদেশেরও বৈচিত্র্য প্রয়োজন। যে যেখানে আছে, সেখান থেকেই এক

পা এক পা ক'রে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই জন্য আমরা দেখতে পাই, বেদাদি শাস্ত্রে চরম লক্ষ্যের কথাও যেমন আছে, তেমনি আছে অত্যন্ত অনুন্নত যে, তার পক্ষেও গ্রহণোপযোগী উপদেশ, আর এই রকম উপদেশই আছে বেশী, কারণ সংখ্যায় তো এরাই গরিষ্ঠ। এই কথা বিচার ক'রে শাস্ত্রকে বুঝতে হয়।

এখন এই যে আত্মহত্যা, এই যে দেহকে নাশ করা, সাধারণের পক্ষে এটি অত্যন্ত অন্যায়, কারণ সেই দেহ দিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য তখনও লাভ হয়নি। কিন্তু ভগবানকে লাভ করার পর শরীরের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন সেটা থাকল আর গেল, কিছুতেই কিছু আসে যায় না। এখানে মনে হ'তে পারে অপরের কল্যাণের জন্য তো দেহটা রাখা উচিত? তার উত্তর এই যে, কল্যাণ করবার আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে থাকে না; আর তার প্রয়োজনও নেই। কারণ সাধক তখন সকলের মধ্যেই তাঁকে দেখেন; কেই বা বলবেন আর কাকেই বা বলবেন? যে ভূমি থেকে ঐ রকম দেখা যায়, সেই ভূমি থেকে আর উপদেশ চলে না। ঠাকুর বলছেন, কিন্তু কারও কারও ভিতরে, তিনিই একটু 'বিদ্যার আমি' রেখে দেন।

ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন "আচ্ছা, আমার অহঙ্কার আছে কি?" মাস্টারমশাই বলছেন, "আজ্ঞে আপনি একটুখানি রেখেছেন লোকের কল্যাণের জন্য, লোককে সেই আত্মজ্ঞান, ভগবানের কথা শোনাবার জন্য।" ঠাকুর বললেন "না, আমি রাখিনি। তিনিই রেখেছেন।" এইটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করার মতো কথা। যে তাঁর হাতের যন্ত্র, তাকে তিনি রাখতেও পারেন, প্রয়োজন না থাকলে যন্ত্র পরিত্যাগ করতেও পারেন। যখন আমার প্রয়োজন শেষ হ'য়ে যায়, তখন শরীরটা থাকবে—না যাবে, সেটা তাঁর প্রয়োজনে তিনিই বুঝবেন। সুতরাং যিনি ভগবান লাভ করেছেন, তাঁর শরীরটা থাকবে কি যাবে, তা নির্ণয় করার

আর প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। যিনি এর পিছনে সর্বনিয়ন্তা, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ঘটবার তা ঘটে, যে ব্যক্তি পূর্ণকাম তার আর ঐ সবের কোন চিন্তা থাকে না।

ষোল

কথামৃত—১। ।২-৩

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্ত-সঙ্গে ঠাকুরের অবিরাম ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে। ঠাকুর চার রকম জীবের লক্ষণ বলছেন: বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব আর নিত্যজীব।

বদ্ধজীব

বদ্ধজীব তো আমরা চারিদিকেই দেখতে পাই। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, ঠিক যেমন জালের ভিতরে পড়ে মাছ কাদায় মুখ গুজে থাকে, ভাবে এখানটা বোধ হয় নিরাপদ। সে জানে না যে জেলে সেখান থেকে তাকে টেনে তুলবে এবং তার মৃত্যু হবে। এ রকম একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য সম্বন্ধে সে সচেতন নয়; এটাই হ'ল বদ্ধজীবের লক্ষণ। মহাভারতে তাই বলছেন, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার:

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥"

দিন দিন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তার খেয়াল নেই। সে ভাবছে, যারা মরবার তারাই মরছে, আমি ঠিক থাকব। বদ্ধের বন্ধন সম্বন্ধে কোন চেতনা থাকে না। সে যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে—এ সম্বন্ধে তার কোন খেয়ালই নেই। তাই মানুষ হৃদয়ের মতো পরিকল্পনা করে,

ভাবে 'এটা ক'রব', 'ওটা ক'রব', কিন্তু ভাবে না যে আজই যদি ডাক আসে তো সব ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। ঠাকুর বলছেন, হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে একটা এঁড়ে বাছুরকে ঘাস খাওয়াবার জন্য খুঁটোতে বেঁধে রেখেছিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে, বড় হ'লে এটাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে চাষ করানো হবে। ঠাকুর শুনে মূর্ছিত হয়ে গেলেন। এতটুকু একটা বাছুর বড় হবে, তারপর তাকে অতদূরে শিহড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর সেখানে তাকে দিয়ে চাষ করানো হবে!

আমরা এর চেয়েও অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করি, আর ভাবি—আমরা চিরকাল বেঁচে থেকে সেই পরিকল্পনা রূপায়িত ক'রে তার ফল ভোগ ক'রব। এখানে কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনার কথা বলছি না, ব্যক্তিগত পরিকল্পনার কথাই বলছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহ'লে কি আমরা পরিকল্পনা ক'রব না? ঠাকুর কিন্তু সে-কথা বলছেন না। পরিকল্পনা আমরা নিশ্চয়ই ক'রব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এ-কথাও ভাবতে হবে, আমরা যতটুকু পারি ক'রব, তারপর আমাদের পরবর্তী যারা আসবে, তারা করবে। এখান থেকে চলে যাবার জন্য সবসময় তৈরী থাকতে হবে। এই বুদ্ধি ক'রে যদি পরিকল্পনা করা যায় তো দোষ হয় না। তবে সেই বুদ্ধি, নিঃস্বার্থভাব না এলে হয় না। আমার মন যদি স্বার্থবুদ্ধিতে ভরা থাকে তো এমন পরিকল্পনা আমার মাথাতেই আসবে না, যার ফল আমি ভোগ ক'রব না। বদ্ধজীবের মাথায় এ চিন্তা আসে না যে আমি দুদিনের জন্য এ জগতে এসেছি; যখনই ডাক আসবে, তখনই আমায় সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। বরং তার ব্যবহার দেখে মনে হয়, সে এমন এক পাকা বন্দোবস্ত ক'রে এ জগতে এসেছে, যাতে বোধ হয় তাকে কোনদিনই এখান থেকে চলে যেতে হবে না।

মুমুক্ষুজীব ও মুক্তজীব

মুমুক্ষুজীব বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন ; তার আছে বন্ধনের অনুভব, বন্ধনের বেদনা, তাই সে-বন্ধন থেকে তার মুক্তির চেষ্টা। তবে মুক্তির জন্য সচেষ্ট সকলেই যে মুক্ত হয়, তা নয়। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলেছেন, যে মাছগুলো জাল থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করে, তাদের সবাই জাল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। তাদের মধ্যে দু-চারটে ধপাং ধপাং ক'রে লাফিয়ে চলে যায়। ঠিক সেই রকম মহামায়ার জাল থেকে যাঁরা কোনরকমে বেরোতে পারেন, তাঁরাই হলেন মুক্তজীব।

নিত্যজীব

এছাড়াও আর এক-রকমের জীবের কথা ঠাকুর বলেছেন, যাঁদের বলে 'নিত্যজীব'। সেয়ানা মাছ যেমন কখনো জালের মধ্যে পড়ে না, এঁরাও তেমনি কখনো মহামায়ার জালে বদ্ধ হন না। আর পাঁচজনের মতো তাঁরাও এই জগতে আসেন, কিন্তু একটু বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা এ জগতের নন। এই নিত্যজীবের পর্যায়ে ঠাকুর ফেলেছেন তাঁর পার্ষদদের, যাঁদের এ-জগতে আসা কোন বাসনা-প্রেরিত হ'য়ে নয়, যাঁরা আসেন লোক-কল্যাণের জন্য, অবতারাদির লীলার সহচর হ'য়ে। ঠাকুর এখানে নারদের দৃষ্টান্তও দিচ্ছেন। নারদের জীবনে দেখা যায় আবাল্য প্রবল বৈরাগ্য—একেবারে সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে। সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিলেন মা, যিনি ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে দাসী-বৃত্তি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতেন, সন্তান পালন করতেন। সেই মায়ের যখন সর্পদংশনে মৃত্যু হ'ল, তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। আপাতদৃষ্টিতে এটা তাঁর দুর্ভাগ্যের সূচনা ব'লে মনে হবে, কিন্তু নারদ বলছেন, তাঁর যে একটুখানি বন্ধন ছিল, তাও খসে গেল ; তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন সাধন করতে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে গিয়ে একটা গাছের তলায় তিনি ধ্যানে বসেছেন। বলা

বাহুল্য, এমন মন নিয়ে তিনি ধ্যানে বসেছেন, যা কখনও সংসারে লিপ্ত হয়নি। ধ্যান করতে করতে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ভগবান অন্তর্হিত হলেন, যখন ধ্যানে আর তাঁকে ধরা যাচ্ছে না, তখন বালক আকুল হ'য়ে কাঁদছেন ও বলছেন, 'ভগবান, তুমি দেখা দিয়েও অন্তর্হিত হ'লে কেন?' তখন দৈববাণী শুনলেন, "নারদ, তুমি যে একবার দেখা পেয়েছ, তোমার এ-জীবনের পক্ষে তাই যথেষ্ট। আর তুমি আমার দর্শন পাবে না; কিন্তু এই এক দর্শনেই তোমার সমস্ত জীবন ভ'রে থাকবে। এখন তুমি আমার গুণকীর্তন ক'রে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ কর।" বলা বাহুল্য, এই ভগবদ্‌ভক্তি শেখাবার জন্যই নারদের দেহধারণ; সুতরাং নারদের সংসারে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই—একমাত্র লোক-কল্যাণ ছাড়া। এই হ'ল নিত্যজীবের লক্ষণ।

এই সংসারে বদ্ধজীবই সবচেয়ে সুলভ, চারিদিকেই দেখা যায়; মুমুক্ষু-জীব অপেক্ষাকৃত বিরল, তবে খুঁজলে সকলেই কিছু না কিছু দেখতে পান; মুক্তজীবের দেখা পাওয়া মোটেই সহজ নয়; আর নিত্যজীব কেবলমাত্র অতি বিরলই নন, তাঁদের দেখা পেলেও লোকে চিনতে পারে না।

বদ্ধজীবের লক্ষণ

এর পর বদ্ধজীবের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঠাকুর এক ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন "উট কাঁটা ঘাস খেতে বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় তত মুখ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়ে; তবুও সে কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়বে না।" আমরা দেখি এ সংসারে মানুষের কষ্টের শেষ নেই। যাদের বাইরেটা দেখে আমরা সুখী ব'লে মনে করি, তাদের অন্তরটা যদি দেখা যেত তো দেখতে পেতাম, তা দুঃখে ভরা। ভগবান গীতায় বলেছেন, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।'

এই অনিত্য জগতে দুঃখের নিবৃত্তি নেই, তাই অনিত্য বস্তুর উপর আসক্তি ত্যাগ ক'রে আমার ভজনা কর। মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, তবুও উট যেমন কাঁটা ঘাস খেয়ে চলে, মানুষও তেমনি সংসারে থেকে এত দুঃখ পাচ্ছে, তবু সেই সংসারকেই জড়িয়ে থাকতে চায়। কষ্ট যখন পায়, তখন হয়তো সাময়িকভাবে মনে করে সংসার ভাল লাগছে না, ছেড়ে দিই, কিন্তু ছাড়তে কিছুতেই পারে না, এমনই আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন। কেশব সেনের এক আত্মীয় যার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে, তাকে তাস খেলতে দেখে ঠাকুর অবাক হচ্ছেন, কিন্তু আমরা এ দৃশ্য দেখলে তত অবাক হই না, কেননা এ তো আমরা সর্বদাই চারিদিকে দেখছি। এই বদ্ধজীবের অবস্থা সেই মেছুনীর মতো, মাছের আঁসটে গন্ধ ছাড়া যার ঘুম হয় না, ফুলের গন্ধে যে অস্বস্তি বোধ করে।

বদ্ধজীবের মুক্তির উপায়

এখন প্রশ্ন : এ বদ্ধজীবের কি রকম মনের অবস্থা হ'লে তবে মুক্তি হ'তে পারে? ঠাকুর তার উত্তরে বলছেন, "ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে এই কাম-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? 'হচ্ছে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক'—এ-সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল, মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল।" এই মন্দ বৈরাগ্যের ফলে অনেক সাধকের সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। অনেক সাধক প্রথম প্রথম খুব রোক করেই শুরু করে। মনে করে দুদিনের চেষ্টাতেই বুঝি ভগবান লাভ হ'য়ে যাবে। কিন্তু যখন সে দেখে দিনের পর দিন মনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেও সে পরাজিত, তখন সে বুঝতে পারে যে ভগবান লাভ যত সোজা সে মনে করেছিল, তত সোজা নয়। আর এই বোধ থেকেই সৃষ্টি হয় হতাশা, যা সাধকদের জীবনে বড় শত্রু। 'ভগবান লাভ করতে পারছি না' ব'লে বেদনা বোধ থাকা ভাল, কিন্তু ভয় হয় তখন,

যখন এই বেদনাবোধ থেকে জন্ম নেয় হতাশা, যা সাধকের মনোবল ভেঙে দিয়ে তার সাধনায় ছেদ ঘটায়। শাস্ত্রে একে বলেছেন, "প্রমাদ্-আলস্য।" এই প্রমাদ প্রথমতঃ অনবধানতা অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতনতা, আর যদিই বা চেতনা থাকে তো চলবার পথে এমন আলস্য উপস্থিত হ'ল যে সে আর এগোতে পারল না। শাস্ত্র শুধু শুধু এ-কথা বলেননি যে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন ভগবান লাভের পথ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ যেন অসাধ্য। কিন্তু এই অসাধ্যকেই সাধন করতে হবে, কেননা এ ছাড়া ভগবান লাভের যে আর কোন পথ নেই। কিন্তু মানুষের স্বভাবই হ'ল সে সবসময় সবচেয়ে সহজ পথ খোঁজে, আর এইভাবে খুঁজে যে পথটা তার সবচেয়ে সহজ ব'লে মনে হয়, সেই পথেই চলতে থাকে ; চলতে চলতে সে বুঝতে পারে যে, পথটি মোটেই সহজ নয়। অনেক সময় মানুষকে প্ররোচিত করার জন্য বলা হয় "এই কর, তাহলেই হবে। একবার ডেকে দেখ, তাহলেই হবে।" কিন্তু একবার কেন, দশ বার, হাজার বার গলা ফাটিয়ে ডেকে যখন সে দেখে কোন কাজ হচ্ছে না, তখন তার সন্দেহ জাগে। কিন্তু একদিকে যেমন সন্দেহ জাগে, অন্যদিকে তেমনি একটু আকর্ষণও বোধ হয়। এখন এই আকর্ষণ আর সন্দেহের দোলায় দোলায়মান সাধকের চিত্ত। এ-সম্বন্ধে কোন স্তোকবাক্য দিয়ে লাভ নেই যে, এমন এক সহজ পথ আছে যে পথে ভগবান অনায়াসলভ্য, কেননা সে-রকম কোন পথই নেই।

এখানে গিরিশবাবুর দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। গিরিশবাবুকে ঠাকুর বললেন "দেখ, আর কিছু না পার তো দিনে দুবার তাঁর নাম ক'রো।" দিনে দুবার কেন, দিনে একবারও নাম করতে অপারগ দেখে ঠাকুর ভাবের মুখে তাঁকে বললেন, "তাও যদি না পার তো আমাকে বকল্মা দাও" অর্থাৎ আমার উপরে ভার দাও। গিরিশবাবু ভগবান লাভের এমন

সহজ পথ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু এর পর একদিন কথাপ্রসঙ্গে যখন বলছেন যে 'তাঁকে অমুক জায়গায় যেতে হবে, অমুক কাজ করতে হবে', ঠাকুর তখন বললেন, "সে কি গো, তুমি না আমার উপর বকল্‌মা দিয়েছ ? তবে আবার 'এটা করতে হবে' 'ওটা করতে হবে' কি ব'লছ ?" গিরিশবাবু তখন বুঝলেন যে সত্যিই তো, ভার দেওয়া তো ও-রকম ক'রে মাঝামাঝি ক'রে, ভাগাভাগি ক'রে হয় না। শেষজীবনে তিনি বুঝেছেন যে এই বকল্‌মা দেওয়া কত কঠিন। তিনি বলছেন, "প্রতি পদে প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয়, তাঁর উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না, এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটা করলে।" তিনি ভাবলেন তার চেয়ে রোজ এক হাজার বার জপ করাও বোধ হয় ভাল ছিল।

নামমাহাত্ম্য

শাস্ত্র বলেছেন, ভগবানের নাম "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা"—হেলায় করুক বা শ্রদ্ধাভরে করুক, তার কল্যাণ হবেই। এই আশ্বাসবাণীতে ভরসা পেয়ে মানুষ ভাবে, ভগবানের নাম না হয় ক'রে ফেলাই যাক এক আধবার। বেশী সময় নষ্ট না করলেই তো হ'ল। কিন্তু তারপর শাস্ত্র বলছেন "নাম তো ক'রছ, কি রকম ক'রে নাম করতে হয় জান তো ? নামের সঙ্গে মনকে একাগ্র করতে হয়। একাগ্রতা আছে তো ?" সর্বনাশ ! একাগ্রতা ! সে যে কঠিন কথা ! তার চেয়ে এক হাজারের জায়গায় দশহাজার বার নাম করা যায়, কিন্তু একাগ্রতা পাঁচ মিনিটের জন্য আনাও খুব কঠিন। স্বামীজী গান গাইছেন "সাধন ভজন তাঁর কররে নিরন্তর" শুনে ঠাকুর বলছেন, "যা করবিনি, তা বলছিস কেন ? বল্, কর রে দিনে দুবার"—ঠাট্টা ক'রে বললেন। ভাব এই যে, এইরকম ক'রে ভগবানের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হয় না যে, আমরা দু-দশবার তাঁর নাম ক'রব, আর তিনি তার পরিবর্তে আমাদের সব ক'রে দেবেন।

ভগবান বলছেন "আমি যোগক্ষেম বহন করি অর্থাৎ যার যা প্রয়োজন আছে, তাকে তা দিই; আর যার যা আছে, তা রক্ষা করি।" তা-হ'লে তো তাঁর ভক্ত হ'য়ে লাভ আছে। যার যা প্রয়োজন তিনি যোগাবেন, আর যা আছে সব পাহারা দেবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বললেন, যেটা আমাদের মনে থাকে না। 'অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো" —অনন্য হ'য়ে যারা আমার চিন্তা করে 'তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—সেই যাঁরা আমার সঙ্গে নিত্যসংযুক্ত তাঁদের যোগক্ষেম আমি বহন করি। যোগক্ষেমের আশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে তাঁর দিকে এগোলাম বটে, কিন্তু তাঁর সর্ত শুনে ব'লে উঠি "রক্ষা কর ভগবান, তোমার যোগও চাই না ক্ষেমও চাই না।"

আসলে আমরা চাই স্বল্পতম বাধার পথ (path of least resistance)। কিন্তু ভগবান লাভের তো তেমন কোন পথ নেই, বরং প্রতিটি পথই বিপদসঙ্কুল, যেখানে পদে পদে পরীক্ষা। গোপীরা – যারা ভগবানকে সর্বস্ব অর্পণ করেছে, তাদেরও এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছে, তবেই তাঁর কৃপা লাভ হয়েছে।

ত্যাগ ও ব্যাকুলতা

গোপীরা গৃহত্যাগ ক'রে, আত্মীয়-স্বজন স্বামী-পুত্র সব ত্যাগ ক'রে, পাগলের মতো ভগবানের পদপ্রান্তে হাজির হ'ল, আর ভগবান তখন বললেন "এসেছ, বেশ করেছ, তা আমাকে তোমাদের জন্য কি করতে হবে?" যেন একেবারে অপরিচিত তারা সব। ইংরেজীতে যেমন বলে "What can I do for you?" ঠিক সেইরকম ভাব। যার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলাম, সেই এ-রকম ব্যবহার করছে। এই হ'ল পরীক্ষার ধারা। তবে পথের ভয়ঙ্করতা যদি গোড়া থেকেই চিত্রিত হয় তো কেউ আর ভয়ে সে পথ মাড়াবে না। কাজেই বলতে হয়--উপায়

আছে। তাঁর উপর নির্ভর করো। তিনিই সমস্ত বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"—তাদের আমি মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি, "ময্যাবেশিতচেতসাম্"—যারা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করেছে। কিন্তু উদ্ধার হ'তে চাইলে তো তিনি উদ্ধার করবেন। ঠাকুর যেমন বলেছেন যে, বিষ্ঠার কৃমিকে যদি ভাতের হাঁড়িতে রাখা যায় তো সে মরে যাবে। আমাদের অবস্থাও ঐ রকম। সংসারের মালিন্যেই আমাদের সন্তোষ, আর এর ভিতরেই আমরা হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছি, ভগবানের কথা ভাববার অবকাশ কোথায়? আর যদি বা আমরা তাঁর কথা ভাবি, সেটা হয়, যা স্বামীজী বলেছেন, যেমন বৈঠকখানা সাজাবার জন্য একটা জাপানী ফুলদানির প্রয়োজন—অর্থাৎ ফ্যাশন, ধর্মের প্রয়োজন আমাদের জীবনে ঐ ফুলদানির মতো। এই রকম হ'ল ভগবানের দিকে আমাদের মন দেওয়া। কিন্তু ও-রকম দিলে তো চলবে না, সমস্ত মনটা তাঁকে দিতে হবে। সহস্র বন্ধন ছিঁড়ে সমস্ত মন তাঁর দিকে দেওয়া কঠিন কথা।

শরণাগতি

শাস্ত্রের নির্দেশ, যত কঠিনই তা হোক না কেন, পালন করার চেষ্টা করতে হয়। কেন করতে হয়? না, তা ছাড়া মানুষের কল্যাণকর আর কিছুই নেই বলে। এ কথাটি যদি মানুষ অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে তো তাঁর পায়ে শরণ নেওয়া ছাড়া সে আর করবেই বা কি? ভাগবত বলছেন যে মরণশীল মানুষ দেখছে তার পিছনে মৃত্যুরূপ কালসর্প ছুটে আসছে তাকে দংশন করবার জন্য। তাই সে ছুটে পালাচ্ছে; ছুটতে ছুটতে সে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন লোকই ঘুরে ফেলল, কিন্তু দেখল কোথাও তার নিষ্কৃতি নেই। পিছনে সেই কালসাপ ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে সে দেখছে—তাঁর পাদপদ্মে এসে পড়েছে। সে খুঁজে বার করতে পারেনি, ছুটতে ছুটতে কোনক্রমে পূর্ব সুকৃতি বলেই

হোক বা তাঁর কৃপাতেই হোক, তাঁর পাদপদ্মের সমীপে এসে পড়েছে। এখানে এসে সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বস্তির সঙ্গে শুয়ে প'ড়ল। স্বস্তি কেন? না, মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয় আর নেই এখানে। ঠিক তারই প্রতীক বোধহয় নারায়ণের বাহন গরুড়, যার কাছে সাপ ঘেঁষে না। সুতরাং তাঁর পাদপদ্মে শরণ নিলে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। মৃত্যু কাকে বলছেন? না, নিজেকে ভুলে থাকাই মৃত্যু, নিজের স্বরূপকে ভুলে থাকাই মৃত্যু। এই মৃত্যু আমাদের সব জায়গায়, সব সময় আমরা মৃত্যুগ্রস্ত হ'য়ে রয়েছি, কারণ মৃত্যু মানে তো শুধু দেহের নাশ নয়, মৃত্যু মানে তাঁকে ভুলে থাকা। তাই মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় হ'ল তাঁকে আশ্রয় ক'রে থাকা। কিন্তু তাঁকে আশ্রয় করাও সহজ নয়, এটা আমরা পরে বুঝতে পারব। ঐ লোকটির মতো তিন লোক ছুটোছুটি ক'রে ক্লান্ত হ'লে তবেই তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় পাব। এই যে তিন লোকে ছুটোছুটি, এই যে মনের সঙ্গে সংগ্রাম, তা ক'রে যখন আমরা অবসন্ন হই, তখনই হয়তো আমাদের শরণাগতির ভাব মনে আসে, আর তখনই তিনি আমাদের আশ্রয় দেন। তা না হ'লে সর্বদা তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত হয়েও আমরা তাঁর থেকে দূরে থাকি কি ক'রে? আর এই যে সাধনা, এ-সাধনা শুরু হয় তখনই, যখন এ-সংসার আমাদের বিষবৎ বোধ হয়।

সংসার ও সাধনা

এখন সংসারে থেকে তাকে বিষবৎ মনে ক'রব, এ তো বড় সর্বনেশে কথা! কিন্তু যতক্ষণ সংসার মধুর ব'লে মনে হয়, ততক্ষণ আর অন্য মধুরের প্রয়োজন কোথায়? সুতরাং ভগবানের আর প্রয়োজন নেই সেখানে। যদি বা প্রয়োজন হয় তো ব'লব, "হে প্রভু ছেলেটার অসুখ হয়েছে, যেন সেরে যায় বা এবারের ফসল যেন ভাল হয়"—তাঁর প্রয়োজন

এই পর্যন্ত। আমরা এই সংসারকে চাই, আর এই সংসারের সুখ পাবার বা দুঃখ এড়াবার উপায়রূপে চাই তাঁকে। আসলে আমরা আন্তরিক তাঁকে চাই না। তাঁকে চায় এ-রকম বীর হৃদয় খুব কম, যে হৃদয় তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। মনে হবে এ তো সন্ন্যাসের কথা, কিন্তু এ সন্ন্যাসের কথা নয়, এ হ'ল প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ের কথা। আমরা যখন বলি 'নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার' তখন তোতা-পাখির মতো কথাটি আবৃত্তি করি মাত্র। এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার মতো দৃঢ়তা আমাদের থাকে না। ঠাকুর বলেছেন, "তোমরা এ-ও কর, ও-ও কর।" এক হাত দিয়ে সংসার কর, অন্যহাতে ভগবানকে ধর। কিন্তু তার পরেই ঠাকুর বলছেন—যখন পরিবেশ অনুকূল হবে, তখন "দু-হাত দিয়েই তাঁকে ধর।" এই যে দু-হাত দিয়ে ধরা এইটিই কিন্তু লক্ষ্য ; এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য অবস্থা বিশেষে যদি প্রয়োজন হয় তো এক হাত দিয়ে তাঁকে ধরার কথা বলা হয়েছে। তা না হ'লে সংসারে এক হাত, আর ভগবানে এক হাত —এটা কোন কাজের কথা নয়। মূল কথা হ'ল দু-হাত দিয়ে তাঁকে ধরা। কিন্তু দেখা যায়—হয় সংসার আমাকে ছাড়ছে না, অথবা আমি সংসারকে ছাড়ছি না ; তাই একটু আপস করা হয়। বলা হয়—আচ্ছা এক হাতে সংসার কর, আর এক হাতে তাঁকে ধরে থাকো। ঠাকুরের সন্তানেরা বলছেন যে মনটার দুআনা দিয়ে যদি সংসার করা যায় তো ভেসে যাবে। আমরা অনেক সময় বলি যে 'সংসারে এত কাজ যে, ভগবানের চিন্তা করার অবকাশ পাই না'—এই কথাই যদি সব সময় মনে থাকে তো প্রকারান্তরে তাঁরই চিন্তা হ'য়ে যায়। কিন্তু তা তো হয় না ; এগুলো কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা, নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যে, কাজের চাপে আমি তাঁর চিন্তার সময় পাই না। তখন কি মনে থাকে এই কথা যে তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, তখন কি মনে থাকে যে "ঈশা বাস্যমিদং

সর্বম্”—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আত্মবস্তু দিয়ে ভ’রে ফেলতে হবে, তাঁকে দিয়েই ভরিয়ে তুলতে হবে সমস্ত জীবনটা ?

সতরো

কথামৃত—১।৪।৬-৭

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুরের ভগবৎ-প্রসঙ্গ চলছে। বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, সপ্তমভূমিতে মন যাবার পর যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সাধক কি দেখে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, সেখানে গেলে মনের নাশ হ’য়ে যায়, কাজেই সেখানকার খবর দেবার আর কেউ থাকে না ; নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাবার মতো অবস্থা ! নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল, পুতুলটি আর রইল না। সেই রকম যে ব্যক্তি ব্রহ্মলাভ ক’রল, তার আর ব্যক্তিত্ব রইল না। উপনিষদে দৃষ্টান্ত আছে :

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ (কঠ, ২।১।১৫)

শুদ্ধ জলরাশিতে একটি শুদ্ধ জলবিন্দু পড়লে সেই শুদ্ধ জলবিন্দুটি সেই জলরাশির মতোই হ’য়ে যায় ; ‘তাদৃগেব ভবতি’—সেইরকমই হ’য়ে যায় ; যিনি জ্ঞানী, মুনি—মননশীল সাধক, তাঁর আত্মার অবস্থাও এই রকমই হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হ’য়ে যায়।

জ্ঞানীর অবস্থা ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এতে কি তাঁর লোপ হয় ? তার উত্তর এই যে, এতে তাঁর লোপ হয় না, কেবল তাঁর চারপাশের যে বেড়া, যে সীমার বাঁধন দিয়ে তিনি অন্য বস্তু থেকে নিজেকে পৃথক্ ক’রে

রেখেছিলেন, সেই সীমার নাশ হয়। অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র বিন্দুটি ছিল, সেটি আর বিন্দুরূপে রইল না, সিন্ধুরূপে রইল। বিন্দুরূপে তার যে ক্ষুদ্রতা, কেবল সেইটার নাশ হ'ল সে অসীম হ'য়ে গেল। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঠাকুর, জলরাশির উপর যদি একটা লাঠি রাখা যায়, তাহলে মনে হয়, জলটা যেন দুভাগ হ'য়ে গেছে। আসলে জলটা যা ছিল তাই আছে, কেবল লাঠিটা থাকার জন্য দুটো ভাগের মতো দেখাচ্ছে। সেইরকম 'আমি'-বুদ্ধি থাকাতেই মনে হয়, আমার ব্যক্তিত্ব আলাদা হ'য়ে গেছে। এখন সেই 'অহং লাঠি' তুলে নাও সেই এক জলই থাকবে। 'আমি'-কে সরিয়ে ফেল, তাহলে আর 'আমি একটি' 'তিনি একটি' এই বিভাগ থাকবে না। লাঠি রাখলে জলের যে ভাগ হয়, সে ভাগ যেমন সত্য নয়, সেই রকম এই 'আমি'রূপ বস্তুটিও সত্য-সত্যই সত্তাকে পৃথক্ করে না; জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বকে সে পৃথক্ ক'রে দেয় না। কিন্তু ঐ জলের বিভাগের মতো মনে হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি ভিন্ন বস্তু। কিন্তু আসলে তো ভিন্ন বস্তু নয়। 'আমি' থাকাতেই ভেদের প্রতীতি হয় মাত্র। তাই বলেছেন "অহংই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।"

এখন প্রশ্ন হ'ল, এই 'অহং' যদি যত নষ্টের মূল হয়, তাহলে যে পথে সে অহংএর নাশ হয়, সেই পথই ভাল। ভক্তিযোগে যদি 'অহং' থাকে তো জ্ঞানের পথই ভাল, যাতে অজ্ঞান দূর হয়, অহংএর নাশ নয়। এই প্রশ্নই বিজয়কৃষ্ণ করলেন ঠাকুরকে। উত্তরে ঠাকুর বলছেন: দু-একটি লোকের জ্ঞানযোগের দ্বারা 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর 'অহং' ঘুরে ফিরে ঠিক উপস্থিত হয়। এ সেই অশ্বত্থ গাছ কাটার মতো অবস্থা। আজ গাছ কেটে দাও, কাল সকালে দেখবে আবার ফেঁকড়ি বেরিয়েছে।

আমরা বিচার করি—এই জগৎটা মিথ্যা, আমিও এই জগতের

অন্তর্ভুক্ত, এই আমি-আমার অহংকার—এও সেই মিথ্যারই কার্য, সত্য দৃষ্টিতে যার কোন অস্তিত্ব নেই ; কাজেই একে সত্য ব'লে যে বোধ, তা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে হচ্ছে—এই ভাবে আমরা মনকে বোঝাই। কিন্তু হাজার বিচার করি, কিছুতেই এই 'অহং' যায় না। বড় বড় পণ্ডিত, দার্শনিক—তাদের সেই পাণ্ডিত্য, দর্শনের মধ্যে দিয়েও অহং আত্মপ্রকাশ করে। চেষ্টা করলেও অহংকার যায় না। ঠাকুর বলছেন যে, দৈবাৎ কারও যেতে পারে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এইভাবে অহংকে নিবৃত্ত করা বড় কঠিন। তাই তিনি বলছেন "একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক শালা 'দাস আমি' হ'য়ে......আমি দাস, আমি ভক্ত—এরূপ আমিতে দোষ নাই।"

ভক্তের 'দাস আমি'

এই 'ভক্ত আমি', 'দাস আমি' মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে না। 'অহংকার দোষের' বলি কেন? না সে বন্ধন এনে দেয়। কিন্তু যে অহংকার বন্ধন এনে দেয় না, তাতে দোষ কিসের? সেইজন্য 'দাস আমি' 'ভক্ত আমি' 'সন্তান আমি'তে দোষের কিছু নেই। এ-কথা কেন বলছেন? জ্ঞানযোগের দ্বারা অহংকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা যায় সত্য ; কিন্তু জ্ঞানযোগের অনুশীলন ক'রে অতদূর অবধি এগোনো ক-জনের পক্ষে সম্ভব? দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। দেহাত্মবুদ্ধি মানে—এই দেহটাকে 'আমি' বোধ করা। এই দেহটাকে 'আমি' ব'লে বোধ করছে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, মূর্খ থেকে পণ্ডিত পর্যন্ত। ঠাকুর তাই বলছেন, যতই বলি কাঁটা-খোঁচা নেই, সেই কাঁটা যখন হাতে লাগে তখন 'উঃ' ক'রে উঠি। সাধারণ মানুষের কি কথা, তোতাপুরীর মতো উচ্চ অধিকারীরও দেহের জন্য মন নীচে নেমে এসেছিল। এই দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাব এতদূর। এখন

জ্ঞানীরও যেখানে এই অবস্থা সাধারণ মানুষের তাহলে করণীয় কি ? এমন কি উপায় আশ্রয় করা উচিত, যার দ্বারা "বজ্জাত আমি" অর্থাৎ যে আমি বন্ধনের সৃষ্টি করে, সেই 'আমি'র হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে সাধক 'শুদ্ধ আমি' হ'তে পারে। এই 'শুদ্ধ আমি' থাকলে কোন দোষ হয় না ; সুতরাং তাকে নাশ করবার জন্য কোন উৎকট সাধনার প্রয়োজন নেই, থাকলেও তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তাই ঠাকুর বলেছেন, "কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ।" কলিযুগে মানুষের মন দেহে নিবিষ্ট থাকে।

কলিতে ভক্তিযোগ

উপনিষদের যুগকে আমরা 'সত্যযুগ' ব'লে কল্পনা করি। সেই সময়েও কিন্তু উপনিষদ্ বলছেন, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ ক'রে সৃষ্টি ক'রে ভগবান যেন জীবের মহা অনিষ্ট করছেন। সেই জন্য সে কেবল বাইরের জিনিসই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। এ তো সেই উপনিষদের যুগের কথা। সুতরাং এটি হচ্ছে সনাতন সত্য, সব সময় সব মানুষের পক্ষে। কলিযুগের প্রভাব কি কেবল বর্তমানেই রয়েছে ? কলিযুগ তো চিরকাল রয়েছে। কেননা যে 'দেহাত্মবুদ্ধি' কলিযুগের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, সেই দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাব থেকে তো মানুষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—কোন যুগেই মুক্ত নয়। এই যুগেতেই আবার আমরা দেখব এমন মানুষ, যাঁদের আমরা সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের লোক ব'লে বলতে পারি। আবার সত্যযুগেও কলিযুগের মতো অসুর প্রকৃতির লোক দেখা যায়। সুতরাং যুগ ঠিক এইভাবে ভাগ করা যায় না। আমরা কলিযুগের যত দোষ দিই। ভাগবতে এক জায়গায় আছে :—

"কৃতাদিষু মহারাজ কলাবিচ্ছন্তি সংভূতিম্"—

কৃত মানে সত্যযুগ, সত্যযুগের লোকেরাও এই কলিযুগে জন্ম নিতে ইচ্ছা করে। তারা ভাবে যদি কলিযুগে জন্মাতাম, তাহলে অত কঠোর সাধনার প্রয়োজন হ'ত না। অনায়াসে ভক্তিমার্গ অবলম্বন ক'রে সিদ্ধিলাভ করা যেত। এটি হচ্ছে বোঝাবার জন্য যে, সব যুগেই মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ মনোবৃত্তি আছে। আবার এ-সবের ভিতর থেকেও উদ্ধার পাবার উপায়ও আছে। আর সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই উপায়ই হচ্ছে ভক্তিযোগ। যে কোন যুগেই হোক না কেন, যদি সহজলভ্য ভক্তিযোগ অবলম্বন ক'রে এগোনো যায়, তাহলে দরকার কি জ্ঞানযোগের, অত কঠোরতার বা কর্মকাণ্ডের আড়ম্বর যেখানে হাজার বছর ধরে একটি যজ্ঞ করতে হয়। পুরাণাদিতে আছে অমুক লোক দশ হাজার বছর তপস্যা করছে। আমরা তো এক-শ বছরও বাঁচি না, কাজেই আমাদের ও চিন্তা ক'রে লাভ কি?

এ কথার তাৎপর্য কিন্তু এ নয় যে, জ্ঞানযোগ কোন উপায় নয়। জ্ঞানযোগ উপায় তো বটেই, কিন্তু সেই উপায় অনুসরণ করার ক্ষমতা আমাদের ক-জনের আছে? মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সে সামর্থ্য থাকলেও বাকি সকলের কাছে সে উপায় নাগালের বাইরে। সুতরাং সেই উপায়ই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ, যা আমার পক্ষে অনুকূল, যা আমার সামর্থ্যের মধ্যে। তাই এই যোগ শ্রেষ্ঠ, ঐ যোগ নিকৃষ্ট বলা যায় না। যার পক্ষে যে উপায় উপযোগী, তার পক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ। বাজারের নানা ধরনের দামী দামী ওষুধ আছে, তার যে কোন একটা খেলেই কি রোগ সারে? রোগ সারাতে গেলে আমার পক্ষে যেটি উপযোগী, সেই ওষুধটিই গ্রহণ করতে হয়।

ভাগবত : জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম

ভাগবতে তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। যাঁরা অত্যন্ত বিষয়বিরাগী, যাঁদের কোন কামনা নেই, যাঁরা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করেছেন, অবশ্য 'কর্ম' বলতে এখানে সকাম

কর্মকেই বোঝাচ্ছে ; 'এই কর্ম ক'রে এই ফল লাভ ক'রব'—একে বলে 'সকাম কর্ম'। এই সকাম কর্ম যাঁরা ত্যাগ করেছেন, তাঁদের জন্যই জ্ঞানযোগের বিধান। আর যাঁদের মনে কামনা বাসনা প্রবল, তাঁদের জন্য কর্মযোগ। কামনা প্রবল বলেই প্রথমে তাঁরা কামনা করেই শাস্ত্রীয় কর্ম করবেন। এইভাবে করতে করতে তাঁরা ধীরে ধীরে উচ্চতর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবেন। এইজন্য সকাম কর্ম দিয়েই তাঁদের শুরু। আর যাঁরা অতিশয় বিষয়বিরাগীও নন, আবার অতিশয় ভোগপ্রবণও নন ; অর্থাৎ যাঁদের এমন তীব্র কামনা নেই, যা তাঁদের ভগবানের দিকে এগোতে দিচ্ছে না ; আবার এমন তীব্র বৈরাগ্যও নেই, যে মন বিষয়ের দিকে একেবারেই যাবে না—তাঁদের জন্য ভক্তিযোগ। একজনের কাছে যা পথ্য, অন্যজনের কাছে তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এই জন্যই ভক্তিযোগীরা জ্ঞানযোগকে ভয় করে, আবার জ্ঞানযোগী ভক্তিযোগকে উপেক্ষা করে, আবার ভক্তিযোগী ও জ্ঞানযোগী উভয়েই কর্মযোগীকে ঘৃণা করে। কিন্তু এ সবগুলিই মানুষের এগিয়ে যাবার পথ ; সুতরাং কোনটাই উপেক্ষার বা ঘৃণার বস্তু নয়। যে যেখানে আছে, তাকে তো সেখান থেকেই এগোতে হবে—এক পা এক পা ক'রে। এক লাফে কি ছাদে ওঠা যায় ? একটা একটা ক'রে সিঁড়ি পেরিয়ে তবে তো ছাদে উঠতে হবে। এখন যদি আমি সেই সিঁড়িগুলিকে ঘৃণ্য বলে মনে করি, কারণ সেগুলি নীচের দিকে আছে, তাহলে তো কোনদিন আমার উপরে ওঠা সম্ভব হবে না। ব্যাকুল হ'য়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের নিজের নিজের পথে এগিয়ে যেতে হবে। যখন আমাদের নিজেদেরই পথ চলার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকে না, তখনই আমরা অপরের পথের সমালোচনা ক'রে তাদের তুচ্ছ বোধ করি। তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে একনিষ্ঠ হ'য়ে যে নিজের পথে এগিয়ে চলেছে, তার পক্ষে কি আর অন্যের পথের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমালোচনা করা সম্ভব ?

তাই নিজের হৃদয়ে অন্বেষণ ক'রে দেখতে হয়, আমি কোন্ পথের অধিকারী। আমি যদি তীব্র বৈরাগ্যবান্ হই, তাহলে জ্ঞানযোগের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি ; আর যদি তা না হই তো আমার পক্ষে জ্ঞান-যোগের পথ অনুসরণ করতে যাওয়া এমন একটা বিপত্তির সৃষ্টি করবে, যা আমাকে সাধনপথে এগোতে দেবে না।

এরপর ঠাকুর বলছেন, ''ভক্ত যে 'ভক্ত আমি' 'দাস আমি' রেখে দেন, সে 'আমি' দোষের নয়, কেননা সে 'আমি' মানুষকে এমন বন্ধনে আবদ্ধ করে না, যা সহজে ভাঙা যায় না। জ্ঞানী তাঁর অহংকে মিথ্যা ব'লে পরিহার করেন, আর ভক্ত ভগবানকে ভাবতে ভাবতে এমন হ'য়ে যান যে তখন তাঁর ক্ষুদ্রতা, তাঁর অপূর্ণতা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।''

ভক্তের জ্ঞানলাভ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা

এরপর বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'এই 'ভক্ত আমি', 'দাস আমি'র কামক্রোধাদি কিরূপ থাকে?' উত্তরে ঠাকুর বলছেন : এঁদের কামক্রোধাদির দাগমাত্র থাকে, যেগুলি তাঁদের আর বিচলিত করতে পারে না। একটা দড়ি যদি পুড়ে যায়, তাহলে সেটা দড়ির মতো দেখায় বটে, তবে তা দিয়ে দড়ির কোন কাজ হয় না, বন্ধন হয় না। এখন এই 'দাস আমি' বা 'ভক্ত আমি' এই ভাব প্রথমে আরোপ ক'রে নিতে হয়। ভগবানকে জানা নেই, সুতরাং কল্পনা ক'রে নিয়ে 'তাঁর দাস', 'তাঁর ভক্ত' এই ভাবে ভাবতে চেষ্টা করতে হয়। এই রকম ভাবতে ভাবতে যখন এই ভাবনায় সিদ্ধি হয়, তখন ভক্ত ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে। ভগবান সর্বশক্তিমান্। তিনি মনে করলে ভক্তকে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। তাই ভক্তেরা ইচ্ছা করলে ভগবানের কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে যে কেবল জ্ঞানযোগীরই একচেটিয়া অধিকার, তা নয়। ভক্তিযোগের ভিতর

দিয়েও ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, যেমন বাড়ির পুরানো চাকর, সে প্রভুর কাছ থেকে পৃথক্ থাকে সব সময়। কিন্তু প্রভু যদি কোনদিন ইচ্ছা ক'রে তাকে পাশে টেনে বসান, তখন সে কি আর পৃথক্ জায়গায় বসতে পারে? তাকে প্রভুর পাশেই বসতে হয়। তবে সাধারণ ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন "চিনি হ'তে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।" সে নিজেকে ভগবান থেকে পৃথক্ রেখে তাঁকে উপাস্যরূপে বা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—যে কোনভাবে আস্বাদন করতে চায়। এটি হ'ল ভক্তের অভিরুচি। যিনি সর্বশক্তিমান্, যিনি সব দিতে পারেন তিনি কি আর ভক্তকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন না? কিন্তু ভক্ত তা চায় না। তা না চেয়ে সে যদি অনন্তকাল তাঁকে আস্বাদন করতে চায় তো সে তার রুচি। এতে কোন দোষ হয় না; দোষ হয় তখন, যখন ভক্ত মনে করে যে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা একেবারে নীরস, শুষ্ক। কারণ তিনি ভাবতে পারেন না যে তিনি যে-রস আস্বাদন করছেন, অপরেও অন্যভাবে সেই রসই আস্বাদন করতে পারেন। এই একদেশীভাব জ্ঞানীরও আছে, ভক্তেরও আছে; এমন কি তোতাপুরীর মতো জ্ঞানীও ঠাকুরের হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করাকে "কেঁও রোটি ঠোকতে হো?" ব'লে উপহাস করেছিলেন।

ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষা

তাই ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষা: নিজের নিজের ভাবের প্রতি একনিষ্ঠ হও, সঙ্গে সঙ্গে অপরের ভাবকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখ; পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ; অপরের ভাবের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হও; কিন্তু নিজের ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা রেখে চল।—এই বিশেষ শিক্ষাই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য, এই ভাবই আজকের যুগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—আর এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের যুগাবতারত্ব।

আঠারো

কথামৃত—১।৪।৭

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুরের অবিরাম ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে।

এর আগে ঠাকুর বলেছেন 'বজ্জাত আমি' ত্যাগ করতে, আর 'ভক্ত আমি' 'দাস আমি' রেখে দিতে। কারণ এই 'আমি'তে কোন দোষ নেই। দোষ, গুণ আমরা কাকে বলি? যা ভগবানের কাছে নিয়ে যায়, তাই গুণ ; আর যা ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাই দোষ। 'ভক্ত আমি' 'দাস আমি' ভক্তকে ভগবান থেকে ঈষৎ পৃথক্ ক'রে রাখে, কিন্তু সে পার্থক্য এমন কিছু নয়, যা তাঁকে আস্বাদন করতে বাধা দেয়।

জ্ঞানপথ কঠিন

যদি কেউ বলে যে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ঈষৎ পার্থক্যই বা কেন থাকবে, তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন, তাঁর থেকে নিজের পার্থক্য নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাজে পরিণত করা মোটেই সহজ নয়। আমি হয়তো ব'লব যে আমার মধ্যে তিনগুণের কোনটাই নেই, অতএব এই তিনগুণ থেকে আমি মুক্ত। কিন্তু যখন কথাটা বলছি, তখনও জানি যে আমি মুক্ত একেবারেই নয়। এই যে মুখের কথা আর অন্তরের কথার পার্থক্য—এই পার্থক্য থাকতে মানুষ কোনদিন তার আদর্শে পৌঁছতে পারবে না।

গীতায় ভগবান বলেছেন :

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

যাঁরা ভগবানের নিরাকার ভাবের দিকে আকৃষ্ট, তাঁদের কষ্ট বেশী। কষ্ট বেশী যেহেতু বাক্য মনের অতীত যিনি, তাঁর দিকে যাওয়াও যাচ্ছে না, আবার অন্যভাবে তাঁকে আস্বাদন করবার রুচিও নেই। তাই ঠাকুর 'সোঽহং' ভাব সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেননি যে এটা ভুল সিদ্ধান্ত ; তিনি বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এ ভাব সহজসাধ্য নয়। মুখে ব'লব 'আমিই তিনি' আর এদিকে হাজার রকমের সংশয়, আসক্তি আমাদের ঘিরে থাকবে। তাই 'আমিই তিনি' ব'লে আমরা নিজেকে ঠকাই, আর অপরকে বিভ্রান্ত করি। যে-সাধনের যোগ্য আমরা, সে-সাধন ছেড়ে দিয়ে যখন যে-সাধনের যোগ্য নই, সেই সাধনের দিকে ঝুঁকি; তখন আমাদের অবস্থা হয় সেই ছোট ছেলেটির মতো, যে নিজের জুতো ছেড়ে দিয়ে তার বাবার জুতোয় পা দিয়ে চলতে চেষ্টা করে। পরিণামে সে যেমন চলতে পারে না, আমরাও তেমনি সাধনপথে এগোতে পারি না।

আমরা হলাম 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' ; 'ততো ভ্রষ্টঃ' এইজন্য যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলুম না ; আর 'ইতো নষ্টঃ' এইজন্য যে, যে ব্যক্তি যে-সাধনার উপযুক্ত সেই সাধনে তার প্রবৃত্তি হ'ল না, সে মনে ক'রল এটি হীনাধিকারীর জন্য। সুতরাং তুমি যে-সাধন করতে পারো সেইটি নিষ্ঠাভরে কর, তাতে শ্রদ্ধা রাখো। এইটাই বড় কথা। যে সাধন আমি ক'রব, তার উপর যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকে, যদি মনে হয় যে এটি হীনাধিকারীর জন্য, তাহলে সেই সাধন কখনও আমায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

"যার যেই ভাব হয় তার সে উত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তদুত্তম॥"

সাধনা করবার সময় যার যেটি ভাব, সেটি তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, কেননা, সেটি ধরেই সে এগোতে পারে। "তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তদুত্তম"—

যে ভাবেই এগোই না কেন, তার কাছে গিয়ে যদি বিচার ক'রে দেখি, তাহলে দেখব যে তার থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাব আছে।

যেমন অদ্বৈতভাবের সাধনার সময় মানুষ যখন বলে যে "আমি ব্রহ্ম"—এই ভাবের সাধনা ক'রব, তখন কিন্তু তার পক্ষে কোন সাধনা করা সম্ভব নয়। কেননা আমিই যদি ব্রহ্ম, তাহলে সাধনা করবে কে? নিজেকে যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবি, আগে থেকেই যদি এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত করি, তারপর আর সাধনার কোন প্রশ্ন আসে না।

পরমার্থ-সত্য

এই যে "অহং ব্রহ্ম" সাধনা, যদি তটস্থ হ'য়ে বিচার করা যায়, তাহলে বুঝব যে তার চেয়েও উচ্চতর ভাব আছে; "আমি ব্রহ্ম"—এ কথাও বলা চলে না। 'আমি ব্রহ্ম' এ-কথাটি বলা হচ্ছে পার্থক্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে; আমি একটি, আর ব্রহ্ম একটি, মনের ভিতরে ভেদ রয়েছে। এই যে বলছি 'আমি' 'আমরা'—এ-দুটি কথার মধ্যে তাৎপর্য কোথায় রয়েছে? ভেদের যে প্রতীতি সেটি মিথ্যা, অর্থাৎ সত্য নয়। ভেদের প্রতীতি হওয়াটা কিছু সাধনায় সিদ্ধির কথা নয়। সুতরাং যদি তার কাছে গিয়ে বিচার করা যায় তো দেখতে পাব, তার থেকেও বড় ভাব আছে, যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে অদ্বৈতবাদী বলেন [মাণ্ডুক্যকারিকা ২।৩২],

> ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ
> ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥

পরমার্থ সত্য হ'ল এই যে, ধ্বংস বা নিরোধ ব'লে কিছু নেই, সৃষ্টি বা উৎপত্তি ব'লে কোন কথা নেই, বন্ধন ব'লে কিছু নেই, সাধক বলেও কিছু নেই, আমরা যে-শব্দগুলিকে অদ্বৈতসাধনে ব্যবহার করছি, এ সবই তো কল্পিত বস্তুকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বলা। কল্পনাকে বাস্তব ব'লে

ধরে নিয়ে যেন আমরা বিচার করছি যে আমি অদ্বৈতের সাধনা করছি। কে আমি? তার স্থিতি কোথায়? তার স্বরূপ কি? যদি তার স্বরূপ ব্রহ্মের থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তো 'আমি ব্রহ্ম' হতেই পারে না। আর অহং যদি ব্রহ্মের থেকে অভিন্ন হয়, তো 'আমি ব্রহ্ম' এই কথার কোন তাৎপর্যই থাকে না। পার্থক্য থাকলে তবেই দুটি বস্তুর সম্বন্ধ হয়। বস্তু যদি এক হয়, তবে নিজের সঙ্গে নিজের আর কি সম্বন্ধ হবে? সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম' যখন সাধনার সময় বলা হয়, তখন ঐ কল্পিত ভেদকে স্বীকার ক'রে নিয়েই বলা হয়। আর এই কল্পিত ভেদকে যদি স্বীকার করেই নিলাম, তাহলে তো আমার দ্বৈত-ভাবই এসে গেল। কাজেই যখন সেই পরম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমরা দেখতে যাই, তখন দেখি এগুলির কোন সার্থকতা নেই। "ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তঃ"—মুমুক্ষু বলে কেউ নেই, মুক্ত বলেও কেউ নেই।

বন্ধন যদি সত্য হয়, তবেই তো মুক্তির প্রশ্ন আসবে। যখন বন্ধনই সত্য নয়, তখন মুক্তি কি ক'রে সত্য হবে? সুতরাং যে দৃষ্টি থেকে এই বিভিন্ন রকমের সাধনার কথা বলি, প্রত্যেকটির ভিতর দ্বৈতভাব অনুস্যূত হ'য়ে রয়েছে। সেই দ্বৈত "পরমার্থতঃ" না হলেও ব্যবহারে তো আছেই; আর এই ব্যবহারকে অবলম্বন করেই তো যত শাস্ত্র, যত সাধনা। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাসভাষ্যে গোড়াতেই বলেছেন, "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ"।

সাধনায় দ্বৈতভাব

এই জগতের সমস্ত ব্যবহার সত্য এবং মিথ্যাকে মিশিয়ে; সমস্ত ব্যবহার মানে লৌকিক ব্যবহার, বৈদিক ব্যবহার দুই-ই। বেদকে পর্যন্ত এই দৃষ্টিতে দেখলে নিত্য বলা চলে না। নিত্য মাত্র এক, এক বললেও যেন ভুল হয়; নিত্য মাত্র সেই বস্তু যেখানে সমস্ত দ্বৈতের অবসান,

বেদান্ত-দর্শনে যাকে "অ-দ্বৈত" বলা হয়েছে। তাহলে তিনি কি? কি তিনি, তা আর মুখে বলা যায় না। এই যে বলা যায় না, এটা কিন্তু বক্তার অসামর্থ্য নয়। বলা যায় না এই জন্য যে, তা বাক্যমনের অগোচর। "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্যের সঙ্গে মনও যেখানে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে ; আর এই বাক্য কেবল লৌকিক বাক্যই নয়, বৈদিক বাক্যের পর্যন্ত এই দুরবস্থা। বেদও কখন বলেন না যে সেই বস্তুকে তিনি প্রকাশ করতে পারেন, কেননা 'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি'—সেখানে বেদও অবেদ হ'য়ে যায় অর্থাৎ বেদ সেখানে অজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং শাস্ত্র, লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহার কোনটাই সেখানে প্রযোজ্য হয় না। অদ্বৈত সাধনা পর্যন্ত এর মধ্যে পড়ে যায়। এই কথাটুকু যদি বুঝতে পারি, তাহলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ব'লে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা থেকে আমরা বিরত হ'তে পারি। কে আমি? কাকে বড় করছি? কে বড় অধিকারী? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী যদি বড় হয়, তো সে কার থেকে বড়? তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখ্‌লে তার পৃথক্ সত্তাই নেই। সুতরাং সে আবার কার চেয়ে কি ক'রে বড় হয়? যা মিথ্যা, তা মিথ্যাই। মিথ্যার রাজ্যে কি আর 'ছোট মিথ্যা' 'বড় মিথ্যা' ব'লে তফাৎ আছে? কিন্তু এই মিথ্যার রাজ্যের ভিতর থেকেও কোন না কোন প্রণালী অবলম্বন ক'রে এই মিথ্যার পারে যাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে—এই প্রণালীগুলিও মিথ্যা। যে কোন প্রণালী, যেহেতু তা প্রণালী, সেই জন্য তা মিথ্যা। সেই দৃষ্টিতে দেখলে অদ্বৈতবেদান্তের সাধনাও মিথ্যা, দ্বৈত বেদান্তের সাধনাও মিথ্যা।

দ্বিবিধ ভ্রম

কোন মিথ্যা এমন আছে, যা আমাদের সত্যে পৌঁছে দেয়, শাস্ত্রে যাকে বলে "সংবাদীভ্রম"। ভ্রম দু-রকমের আছে 'সংবাদীভ্রম' আর

'অসংবাদীভ্রম'। একজন অন্ধকারের ভিতরে একটা আলো দেখল; দেখে তার মনে হ'ল, একটা মণি জ্বলছে। সে তখন চ'লল, মণিটিকে সংগ্রহ করতে। সেই আলোর অনুসরণ ক'রে গিয়ে সে দেখল যে একটা মন্দিরের বন্ধ কপাটের মাঝের এক ছিদ্র দিয়ে আলোটা আসছে, যে আলোটাকে সে মণি ব'লে মনে করেছে। সে দরজাটা খুলল, দেখল সত্যি সত্যি সেখানে একটা মণি রয়েছে, যে মণির আলো দরজার ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আসছিল, সেই আলোটিকেই তার মণি ব'লে মনে হয়েছিল। এখন যেটাকে সে প্রথমে মণি ব'লে মনে করেছিল, পরে মনে হ'ল সেটা মণি নয়, তবুও সেই মিথ্যার অনুসরণ করতে গিয়ে সে মণিটিকেই পেয়ে গেল, অর্থাৎ সত্যকে পেল।

আর একজন ঠিক ঐরকম আলো দেখে মণি মনে ক'রে গিয়ে সেই মন্দিরের দরজার ছিদ্র দিয়ে আলো দেখতে পেল। দরজাটা খুলতেই সে দেখল যে একটা প্রদীপ জ্বলছে। মণি নেই। যেখানে অনুসরণ ক'রে গিয়ে মণিকে পাওয়া গেল, তাকে বলা হয়েছে 'সংবাদীভ্রম' অর্থাৎ যে ভ্রম সত্যকে পাইয়ে দেয় আর যেখানে অনুসরণ ক'রে গিয়ে মণিকে অর্থাৎ সত্যকে পাওয়া গেল না, তাকে বলা হয়েছে 'অসংবাদী ভ্রম'। এখন শাস্ত্রের যত প্রণালী সেগুলিও ভ্রম; কিন্তু সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে সেগুলি আমাদের সত্যে পৌঁছে দেয় ব'লে সেগুলিকে 'সংবাদীভ্রম' বলা হয়েছে। তা ছাড়া আর যা কিছু, সেগুলি 'অসংবাদীভ্রম', সেগুলি সত্যে পৌঁছে দেয় না।

স্ব স্ব ভাবে নিষ্ঠা

যদি বিরাট সগুণ তত্ত্বকে আমাদের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব'লে ভাবি, তবে যেভাবেই হ'ক তাঁর অনুসরণ করতে করতে আমরা সেই পরমতত্ত্বে পৌঁছব। সুতরাং ভ্রমের মধ্য দিয়ে হলেও সেটি 'সংবাদীভ্রম' অর্থাৎ

সত্যকে পাইয়ে দেয়। যত সাধনা শাস্ত্রে আছে, সবই সেই সংবাদী-ভ্রমের মতো। সর্বত্রই আছে শাস্ত্রের নির্দেশ, যে নির্দেশ হয়তো কিছুটা অরুন্ধতী-ন্যায়ের" মতো—অরুন্ধতী নক্ষত্রটি দেখাতে হ'লে প্রথমে যদি কেউ বলে "ঐ দেখ অরুন্ধতী" তাহলে কিন্তু সেটা কেউ খুঁজে পায় না। তাই প্রথমেই দেখাতে হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল, যা সাধারণ মানুষ অনায়াসে খুঁজে পেতে পারে। তারপর দেখাতে হয়—সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের লেজের দিক থেকে তৃতীয় বশিষ্ঠ নক্ষত্রটিকে। তারপর এই নক্ষত্রটির পাশে দৃষ্টি স্থির ক'রে দেখতে হয়—একটি খুব অস্পষ্ট ক্ষীণ-জ্যোতি-সম্পন্ন নক্ষত্র, সেটিই হ'ল অরুন্ধতী। ঠিক সেই রকম প্রথমেই যদি সেই পরমতত্ত্বকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে কেউ বুঝতে পারে না। তাই তাকে রূপ দিয়ে, রস দিয়ে নানাভাবে আমাদের আস্বাদনযোগ্য ক'রে, যে-সব অনুভবের সঙ্গে যে-সব ভাব-সম্বন্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, সেই সব সম্বন্ধের দ্বারা তাঁকে সংবদ্ধ ক'রে, কখন তাঁকে মা ব'লে, কখন সখা ব'লে, কখন বা প্রভু ব'লে আমরা শাস্ত্রের নির্দেশেই তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি। ঠাকুর বলেছেন, তারপর তিনিই ব'লে দেবেন—তাঁর স্বরূপ কি। তিনি জানিয়ে দেবেন, তাঁর ভিতরে কত বৈচিত্র্য আছে এবং সর্ব বৈচিত্র্যের পারেই বা তাঁর স্বরূপ কি। আসল কথা হ'ল, যে কোন ভাবেই হ'ক তাঁতে মন নিবিষ্ট ক'রে রাখতে হবে, অথবা বিপরীতক্রমে বলতে পারা যায়, যে কোন রকমেই হ'ক আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে দূর করতে হবে। এরই নাম হ'ল সাধনা, সে-সাধনা অদ্বৈতভাবেই হ'ক বা দ্বৈতভাবে আমাদের পরিচিত কোন ভাব সম্বন্ধের মধ্যে দিয়েই হ'ক।

উনিশ

কথামৃত—১।৪।৭

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে।

বৈধী ভক্তি

ভক্তিপ্রসঙ্গে ঠাকুর রাগভক্তির উপর জোর দিয়ে বলছেন, ঠিক এই রকমের ভক্তি হ'লে তবেই ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ যে যেখানে আছে, তাকে সেখান থেকেই শুরু করতে হয়; তাই এই রাগ-ভক্তি পাবার উপায় হচ্ছে বৈধীভক্তি। রাগভক্তি না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের চিন্তা করবে না—এই যদি কারও মনোভাব হয়, তবে তার পক্ষে আর তাঁর চিন্তা করা কোনদিনই সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। কেননা তাঁর উপরে পরিপূর্ণ ভালবাসা যখন হবে, তখন তার পক্ষে আর কোন সাধনেরই প্রয়োজন হয় না। তখন কোন আচার নেই; নেই কোন জপতপের, নিয়মকানুনের কঠোর অনুশাসন, তখন কেবল আস্বাদন, কেবল তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা। অনেক ভক্ত ও অনেক সাধুর ভক্তিও ঐভাবে সব নিয়মের পারে গিয়ে পৌঁছেছে। তা ব'লে প্রথম থেকেই আমরা যেন কেউ ঐরকম বে-আইনী ভক্তির আশ্রয় না নিই, কেননা ভক্তিলাভ করতে হ'লে প্রথমে সাধনের দ্বারা আমরা তাঁকে লাভ করতে পারি—এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু যতই আমরা এগিয়ে যাব, ততই আমাদের বুদ্ধি হবে পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, আর ততই আমরা বুঝতে পারব যে, যত কঠোর সাধনই আমরা করি না কেন, ভগবানকে পাবার পক্ষে তা কোন দিনই যথেষ্ট নয়। আর

এই বোধটি যখন পরিপূর্ণভাবে আসবে, তখনই আসবে ভগবানের উপর সত্যিকারের নির্ভরতা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, সাধকরাও বলেন যে 'সাধনার সাহায্যে তাঁকে লাভ ক'রব'—সাধকের এই অভিমান, এই অহঙ্কার যখন চূর্ণ হয়, যখন সাধক নিজেকে অসহায় বোধ করে, সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণ নেয়, তখনই আসে তাঁর কৃপা, তখনই আসে তাঁর দয়া। অবশ্য দয়ার কোন নিয়মকানুন নেই। এই করলে তাঁর দয়া হবে, আর না করলে হবে না—এ-কথা কোন সময়েই বলা যায় না। কিন্তু তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করার মতো মনের অবস্থা সাধকের আসে অনেক সাধনার পর। আমরা এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের সেই দৃষ্টান্তটি স্মরণ করি। বাগবাজারের হরি (পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) কিছুদিন ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে না। ঠাকুর খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, হরি বেদান্ত বিচারে মগ্ন, জেনেও তখন ঠাকুর কোন কথা বললেন না। একদিন ঠাকুর বাগবাজারে এসেছেন, বলরাম-মন্দিরে। এসেই হরিকে ডেকে আনতে বললেন। হরি এসে দেখে হল-ঘরটিতে ঠাকুর বসে আছেন ভক্ত-পরিবৃত হয়ে, আর একটি গান করছেন, দু-চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ে সামনের কার্পেটটা পর্যন্ত অনেকটা ভিজিয়ে দিয়েছে। গানের কথাগুলি হ'ল—

"ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

লবকুশ হনুমানকে বেঁধে সীতার কাছে নিয়ে গেছেন আর বলছেন "মা দেখ! কি রকম বড় একটা বানর ধরে এনেছি।" হনুমান তখন গাইছেন 'ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে'। মানুষ মনে করে, সাধনার দ্বারা ঠিক সে ভগবানকে ধরে ফেলবে, সে জানে না যে হাজার জনমের সাধনাও তাঁকে লাভ করবার জন্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ঠাকুরের ঐ

গান শুনে হরি নিজের ভুল বুঝতে পারল। আর কোন প্রশ্নের প্রয়োজন হ'ল না ; প্রয়োজন হ'ল না কোন উপদেশের।

রাগভক্তি

ঠাকুর বলছেন, আবার কেউ কেউ আছেন আবাল্য যাঁরা রাগভক্তি নিয়ে জন্মান, ভক্তির প্রকাশ যাঁদের হয় একেবারে ছেলেবেলা থেকেই, যেমন প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদকে কারও কাছে ভক্তি শিখতে হয়নি ; বরং নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও প্রহ্লাদের ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়ে উঠেছে। এই রকম ভক্তিলাভ হ'লে তখন আর বৈধীভক্তির কোন প্রয়োজনই হয় না।

এ সম্বন্ধে তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে :

তুলসী জপতপ করিয়ে সব গুড়িয়া কা খেল।
প্রিয়াসে যব মিলন হো তো রাখ পেটারী মেল॥

বলছেন জপ তপ যা কিছু দেখছ, সব ঐ ছোট মেয়েদের পুতুল খেলার মতো। ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলছে ; পুতুলের সংসার পাতছে। যখন আসল সংসার আরম্ভ হবে. যখন স্বামীর সঙ্গে মিলন হবে, তখন সেই পুতুলগুলোকে প্যাটরায় ভরে রেখে দেবে। ঠিক সেইরকম জপ তপ করা যেন ভগবানকে নিয়ে পুতুল খেলা করার মতো। এগুলির সার্থকতা কেবল সেই বৃত্তির অনুশীলন করায়। যখন ভগবানকে আস্বাদন করবার, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করবার সুযোগ আসে, তখন আর জপ তপের কোন সার্থকতা থাকে না ; তখন "সব গুড়িয়া কা খেল"—সেই পুতুল খেলার মতো মনে হয়। ভগবানের উপর ভালবাসা যখন আসে, তখন জপাদি সব কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। তখন কে জপ করবে, আর কাকে নিয়েই বা জপ করবে। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য হা-হুতাশ করছেন ; সেই সময় উদ্ধব উপদেশ দিলেন,

তিনি তো হৃদয়েই রয়েছেন, তাঁকে ধ্যান করলেই তো পাওয়া যায়, তবে এত হা-হুতাশ কেন? যশোদা বলছেন, আমি যে ধ্যান ক'রব, আমার মন কোথায় যে আমি ধ্যান ক'রব, সে মন তো কবে আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি। মন নেই, কাজেই সাধনের যন্ত্রও নেই। ভারী সুন্দর এই দৃষ্টান্তটি যে, সাধক যেখানে তন্ময় হ'য়ে থাকে, সেখানে তার আর সাধনার অবকাশ থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি দূরে, যতক্ষণ তাঁর উপর তীব্র ভালবাসা হয়নি, সাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ পর্যন্ত। যখন তাঁর উপর অনুরাগ এসে গেছে, তখন আর এ-সব সাধনার কোন সার্থকতা নেই।

প্রেমাভক্তিতে ঈশ্বরলাভ

আর একটি প্রশ্ন এখানে বিজয়কৃষ্ণ করছেন, "মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলে ভক্তি হলেই হয়?" প্রশ্ন শুনে মনে হয় যেন এ-সম্বন্ধে তাঁর সংশয় আছে। ভক্তি মনের একটা বৃত্তি-মাত্র, কেবল তা দিয়েই কি ভগবানকে লাভ করা যায়? ঠাকুর বলছেন "হ্যাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়, তাঁর দর্শন হয়।" কিন্তু ভক্তি বলতে এখানে বললেন, 'পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই।' আর সেই ভক্তি এলেই ভগবানের উপর ভালবাসা আসে। এখন একটা প্রশ্ন আমাদের মনে বারবার আসে, ভক্তি যে লাভ হ'ল, তার লক্ষণ কি? ঠাকুর বলছেন "এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়কুটুম্বের উপর মায়ার টান আর থাকে না।" তবে কি মানুষ গাছপাথর হ'য়ে যায়? বলছেন "না, মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে"। পাছে আমরা ভুল বুঝি, তাই ঠাকুর পরের কথাটি বললেন যে "দয়া থাকে"। 'আমি, আমার' বুদ্ধি থেকেই 'মায়া' হয়, আর সর্বজীবের প্রতি করুণা থেকেই হয় 'দয়া'। মা সন্তানের উপর দয়া করে না, মায়া করে। কারণ সেখানে 'আমার' বুদ্ধি আছে, 'আমার রাম' 'আমার

হরি' ইত্যাদি। কিন্তু যদি মায়ের সকলের উপরেই এই টান হ'ত, তা-হলে তাকে আর 'মায়া' বলা যেত না ; কিন্তু তা না হয়ে যেখানে মমত্ব আছে, 'আমার' এই বোধ আছে, সেইখানেই মাত্র তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পায় ; তাই তাকে 'মায়া' বলে। মায়া আর দয়াতে তফাৎ এইখানে যে 'মায়া'র দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয়, আর 'দয়া' মানুষের মুক্তি এনে দেয়। তাই ঠাকুর অনেক জায়গায় বলেছেন "মায়া ভাল নয় ; দয়া ভাল"। ঠাকুর আরও বলছেন যে কাঁচা ভক্তি হ'লে ভগবানের কথা ধারণাই হয় না ; যার শুদ্ধাভক্তি, প্রেমাভক্তি, সেই কেবল ভগবানের কথা ধারণা করতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বলছেন ফটোগ্রাফের কাঁচের কথা। ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো থাকলে তবেই ছবিটার স্থিতি হয়। তা না হ'লে ছবিটা আসার পরমুহূর্তেই চলে যায়। ঠিক সেইরকম মানুষের মনে যদি প্রেম না থাকে তো সেই প্রেমস্বরূপের কথা রেখাপাত করবে কি ক'রে? ভগবানের উপর ভালবাসা এলে সংসার অনিত্য বোধ হয় ; গানে যেমন আছে ঃ

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ॥"

—সংসার সেইরকম বিদেশ বোধ হয়। আপন দেশ হ'ল সেখানে, যেখানে তিনি। তিনিই একমাত্র প্রেমের পাত্র, তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ। অন্য জায়গায় তাঁরই ছিটেফোঁটা সত্তা আছে ব'লে আমরা আকর্ষণ বোধ করি। কিন্তু আসল আকর্ষণের বস্তু হলেন তিনি। তাঁকে কেন ভাল লাগে? না, তাঁকে 'তিনি' বলেই ভাল লাগে, আর কিছু ব'লে নয়। আমরা তখন ভগবানের রূপগুণাদির কথা ভাবি না ; 'তিনি' এই হলেই যথেষ্ট, ভগবান তখন আমাদের সমস্ত অন্তর জুড়ে থাকেন। আর এরই নাম হ'ল প্রেমাভক্তি।

প্রেমাভক্তির লক্ষণ

এই প্রেমাভক্তি যদি কারও লাভ হয় তাহলে বিষয়বুদ্ধি একেবারে দূর হয়ে যায়। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁর দর্শন হয় না। অনেকেই বলেন যে তাঁরা যেন অনেক সময় নানাবিধ 'রূপ দেখেন'। তাই তাঁদের প্রশ্ন—তাঁরা কি ঠিক ঠিক ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন? এই প্রশ্ন আমাদের কাছেও অনেকে করেন। এটা বিচার করার কষ্টি-পাথর আছে ; আর তা হচ্ছে, বিষয় আলুনি লাগছে কিনা? বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ কমছে কি না? ভাগবতে একটি শ্লোকে বলা আছে যে, ভগবানে ভক্তি, ভগবান ছাড়া অন্য জিনিসে বিরক্তি, আর ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দৃঢ়নিশ্চয়—এই তিনটি মানুষের একসঙ্গে আসে ভগবানের শরণ নিলে। কেউ যখন উপবাসী থাকে, তখন উপবাসের জন্য তার মনের ভিতর অসন্তোষ থাকে, শরীরে দুর্বলতা থাকে, ক্ষুধার জ্বালা থাকে। এই রকম কেউ যখন আহার পেয়ে এক এক গ্রাস ক'রে মুখে দেয়, তখন ধীরে ধীরে তার অসন্তোষ দূর হ'তে থাকে, সে অনুভব করতে থাকে যে সে বল পাচ্ছে আর তার ক্ষুধার জ্বালাও দূর হ'য়ে যাচ্ছে। এই তিনটি বোধই হয় তার একসঙ্গে। ঠিক সেই রকম ভগবানের উপর যে ভক্তি লাভ করে, তার তিনটি জিনিস একসঙ্গে অনুভূত হয়—"ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ"—ভগবানের উপর টান, ভগবান ছাড়া অন্য সব কিছুতে বিরক্তি আর ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। এমন এক স্বাদে তার মন ভ'রে থাকে যে অন্য কোন স্বাদ তার আর ভাল লাগে না।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—

যাঁকে লাভ করার পর আর অন্য কিছু লাভ করার থাকে না। আরও বলছেন "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—যাঁতে অবস্থিত হ'লে অতিশয় সুখ দুঃখ কিছুই মানুষকে বিচলিত করতে পারে না।

তখন প্রেমসাগর উথলে সুখ দুঃখ সব ডুবিয়ে দিয়ে যায়। এটি হচ্ছে কষ্টিপাথর, যা দিয়ে পরীক্ষা করতে হয় যে আমার অনুভব ঠিক কিনা ?

একজন ব্রহ্মচারী উত্তরকাশীতে থেকে সাধনা করেন। তিনি বলছেন "দেখ স্বামীজী, আমি ধ্যান করতে বসলে দেখি, কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় আর সব তেত্রিশ কোটি দেবতা সেখানে ভিড় ক'রে আসে"—তাঁর বলার তাৎপর্য এই যে, নিশ্চয় তাহলে সাধনক্ষেত্রে তাঁর খুব উন্নতি হয়েছে।

বিষয়-বিতৃষ্ণা ও সংশয়নাশ

ঠাকুর বলছেন এগুলি যাচাই করবার কষ্টিপাথর আছে। যদি দেখা যায়, তাঁর উপরে মন একাগ্র হয়ে, অচঞ্চল হয়ে রয়েছে, যদি দেখা যায় যে বিষয় আর তেমন ভাল লাগছে না, যদি দেখা যায়, ভগবান সম্বন্ধে আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে এই সব দর্শনাদি সত্য। না হ'লে বুঝতে হবে, এগুলি মাথার খেয়াল। কল্পনা—তা সে যতই মনোরম হোক না কেন, কখনও বাস্তব হ'তে পারে না। অবশ্য ভগবানের কল্পনা ক'রে সাধনের যে শুরু করতে হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কল্পনাকে আমরা যেন বাস্তব ব'লে মনে না করি। এই কল্পনার সাহায্যেই শুরু হয় তাঁর দিকে আমাদের অগ্রগতি, এর শেষ হয় যখন আমরা তাঁর পাদপদ্মে পৌঁছাই। আর আমরা যে সেখানে পৌঁছলাম, তার চিহ্ন হচ্ছে এই যে, ক্রমশঃ তাঁর উপর অনুরাগ-বৃদ্ধি, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকল সংশয়ের অবসান। আর এ-লক্ষণগুলি স্বসংবেদ্য, নিজে বুঝার মতো লক্ষণ ; কেননা আমার মনের গতি কোন দিকে, তা অপরের থেকে আমিই ভাল বুঝতে পারি। অনেক সময় আমরা নিজেদের এমন ভাব দেখাই, যেন এক মস্ত ভক্ত ব'লে লোকের কাছে প্রতীত হই। কিন্তু নিজের স্বরূপ নিজের কাছে কখনও গোপন থাকে না।

আত্মবিশ্লেষণ

অকপট মনোভাব নিয়ে একটু আত্মবিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে যায় মনের কারচুপি, আমরা বুঝতে পারি আমরা কোন্‌খানে খাঁটি আর কোন্‌খানে মেকি। একজন কালীর উপাসক মা-কালীকে দর্শন করার জন্য ভারী ব্যাকুল। যাকে দেখে তাকেই বলে, "আমাকে মার দর্শন করিয়ে দিতে পারো?" এই শুনে একজন লোক বললে, "হ্যাঁ পারি।" যেমন ক'রে লোককে বুঝাতে হয়, সেইভাবে বললে, "অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে গিয়ে মা কালীর পূজা করতে হবে। এই এই সব জিনিস-পত্র লাগবে। তুমি সব যোগাড় ক'রে এস। মা-কালীর দর্শন হবে।" অবশ্য এই পূজায় দক্ষিণাটা একটু যে মোটা দিতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে বললেন, "চোখ বুজে মায়ের মূর্তি ধ্যান কর।" সে সেইরকমই করছে। তারপর বললেন, "এইবার দেখ মা এসেছেন।" চোখ খুলে সে দেখে, সত্যি সত্যি মা দাঁড়িয়ে। সে তখন বেশ কিছুক্ষণ দেখল, দেখে বলল, "মা, তুমি যে সামনে এসেছ, তাতে আমার মনে আনন্দের স্রোত বইছে না কেন? জগন্মাতার দর্শন! এতে তো আনন্দে মন ভরে যাবে। কিন্তু আমার তো সে রকম হচ্ছে না," এই ব'লে সে মায়ের পা জড়িয়ে ধরতে গেছে। তখন সেই মা চিৎকার ক'রে বলছে, "বাবা, আমি কিছু জানি না, আমাকে এই বামুনটা কিছু পয়সা দেবার লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে, আমাকে ছেড়ে দাও।" এই দৃষ্টান্তটি এইটুকু বুঝানোর জন্য দেওয়া হ'ল যে, নিজের সঙ্গে আমরা জুয়াচুরি করতে পারি না। একটু যদি স্থির হ'য়ে বিচার করি তো আমাদের মন আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবে যে আমরা সত্য সত্য ভগবানের দিকে এগোচ্ছি কিনা। ঠাকুর বলছেন, চাল কাঁড়বার সময় মাঝে মাঝে তুলে দেখতে হয়, কি রকম কাঁড়া হ'ল। ঠিক সেই রকম সাধনার সময় মাঝে মাঝে নিজেকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়, সাধনপথে আমার উন্নতি হচ্ছে কি না। ঠাকুর বলছেন

যে, একজন সমস্ত রাত ধরে জমিতে জল ছেঁচল, কিন্তু সকালবেলা দেখল যে জমিতে একফোঁটাও জল নেই। কতকগুলো গর্ত ছিল, যার মধ্য দিয়ে সব জল বেরিয়ে গিয়েছে। এই গর্তগুলো খুঁজে বার করতে হবে অর্থাৎ সাধন-সম্পদ কোথা দিয়ে চুরি হ'য়ে যাচ্ছে, নজর রাখতে হবে। আর এই গর্তগুলোই হ'ল বিষয়ে আসক্তি, যা মানুষকে এমনভাবে বিপরীত দিকে টেনে রেখেছে যে, তার সমস্ত সাধন ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। এ ঠিক সেই মাতালদের মতো অবস্থা। সমস্ত রাত দাঁড় টেনে সকালে দেখল যে তাদের নৌকা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই রয়েছে, কারণ নোঙর তোলা হয়নি। ঠিক এই কারণেই আমরা অনেক সময় দেখি যে বছরের পর বছর ধ্যান জপ করেও আমাদের কিছু হচ্ছে না। এই 'আমি-আমার' বুদ্ধি আমাদের চারিদিকে বেঁধে রেখেছে। শত শত আশা আকাঙ্ক্ষা কামনার রজ্জু দিয়ে আমরা সংসারের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা রয়েছি যে হাজার জপ-তপ করেও এগোতে পারছি না। কাজেই অনেক সময় যখন আমরা বিভ্রান্ত বোধ করি, এত সাধন যে করছি, ঠিক এগোচ্ছি তো? তখনই আমাদের উচিত, লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখা যে সত্যি সত্যি আমাদের কোন অগ্রগতি হচ্ছে কিনা? গীতায় যেমন বলেছেন যে কোথায় বাধা, আগে সেটা জানতে হবে, তাহলেই সেগুলি অতিক্রম করা সহজসাধ্য হবে। কাজেই আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে; কেননা আমি আমাকে যেভাবে জানি অপর কাকেও তো ঠিক সেভাবে জানতে পারি না। এইজন্যই গীতায় বারবার বলা হচ্ছে অকপট হওয়ার কথা, ভক্তি-শাস্ত্রে বলা হচ্ছে—সরল হওয়ার কথা, আর এই কারণেই ঠাকুরও বার বার বলছেন যে 'সরল না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।'

কুড়ি

কথামৃত—১।৬।১

এই পরিচ্ছেদের প্রথমে মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরের একটি অতি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য থাকায় প্রাকৃতিক জড় সৌন্দর্যের ভিতরে যেন একটি দিব্য-চেতনার সঞ্চার হয়েছে। পূতসলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার বর্ণনা ক'রে, মাষ্টার মশাই বলছেন, খরস্রোতা গঙ্গা যেন সাগরসঙ্গমে পৌঁছবার জন্য কত ব্যস্ত! ভাবটা হচ্ছে এই যে, এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যাঁরা আসছেন, তাঁরাও তাঁদের গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য, অর্থাৎ তাঁদের ইষ্টের সঙ্গে মিলনের জন্য যেন সেইরকম ব্যস্ত!

'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' বিচার

তারপর মণিমল্লিকের কথা উঠল। তিনি কাশীতে দেখে এসেছেন একজন সাধুকে। সাধুটি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করলে কি হবে?" ঠাকুর বলছেন, "এদের মত কি জানো? আগে সাধন চাই—শম, দম, তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—বড় কঠিন পথ।" এরপরই ঠাকুর দর্শনের একটি সূক্ষ্ম কথা বলছেন, "জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।" এই কথাটির আলোচনা হয়েছে অনেক শাস্ত্রে। জ্ঞানী বলেন, 'জগৎ মিথ্যা।' কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' মানে যে-অবস্থায় আমরা রয়েছি, সেই অবস্থায় মিথ্যাত্ব আসছে না। যতক্ষণ আমাদের 'আমি' ব'লে বোধ রয়েছে, 'আমি'র অনুভূতি রয়েছে, ততক্ষণ জগৎটাকে মিথ্যা স্বপ্নবৎ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। জগতের সমস্ত জিনিসেরই দরকার হচ্ছে, লোকব্যবহার—সর্বসাধারণে যেমন করে,

তা-ই করছি, আর মুখে বলছি, 'জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ'—এতে কথায় এবং কাজে কোন মিল থাকে না। তাই ঠাকুর বলছেন যে, যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তাহলে ও-কথা যে বলছে সেও মিথ্যা, তার কথাটাও মিথ্যা।

এই 'মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব' নিয়ে বেদান্তে আলোচনা আছে খুব। অতি সূক্ষ্ম আলোচনা। সে আলোচনা এখানে আমাদের করবার প্রয়োজন নেই। সূক্ষ্মভাবে শাস্ত্রচর্চা সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তবে ঠাকুরের কথার তাৎপর্য আমরা বুঝতে চেষ্টা ক'রব। ঠাকুর বলছেন, যে 'জগৎ মিথ্যা' বলছে, সে কি জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়? যদি সে জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেও মিথ্যা। আর সে যদি মিথ্যা হয়, তার সব কথাও মিথ্যা। সুতরাং তার 'জগৎ মিথ্যা' এই কথাটাও মিথ্যা হ'ল। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' কথাটা তো মিথ্যা নয়। অতএব 'জগৎ মিথ্যা' ও-রকম ক'রে বলা যায় না। তবে বেদান্ত যে বলেন, 'জগৎ মিথ্যা', তার কারণ একটি উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিম্নের ভূমিকে মিথ্যা বলা যায়। যতক্ষণ আমি 'রজ্জু-সর্প' দেখছি—দড়িটাকে সাপ ব'লে দেখছি—ততক্ষণ সত্য-সাপ দেখলে যে-রকম অনুভব হয়, ঠিক সে-রকম অনুভবই হচ্ছে। সাপ দেখলে যে-রকম ভয় হয়, সে-রকম ভয় হচ্ছে। সুতরাং সেই অবস্থায় সাপটা মিথ্যা হচ্ছে না। সাপটা যদি মিথ্যা হ'ত, তাহলে ভয় হ'ত না। মিথ্যা সাপ দেখলে ভয় হয় না। সাপের চিত্র দেখলে ভয় হয় না। কিন্তু এখানে রীতিমত ভয় হচ্ছে। দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, হৃৎকম্প হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় সাপটি একান্ত সত্য। এই সত্যকে আমরা মিথ্যা ব'লে এড়াতে পারি না। কিন্তু যখন আমাদের রজ্জুর জ্ঞান হয়, যখন দড়িটাকে জানতে পারি, তখন বলি যে, ওটা দড়ি—সাপ নয়। তাহলে দড়ির জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঐ সাপটি মিথ্যা হয় না। এইটি বিশেষরূপে জানবার জিনিস। অর্থাৎ ব্রহ্মকে না জানা পর্যন্ত জগৎ মিথ্যা হয় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগতে আমরা রয়েছি, ব্যবহার করছি, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করছি এবং সাধারণ লোকের মতো আগ্রহ করেই গ্রহণ করছি, ততক্ষণ এই জগৎকে মিথ্যা বলা প্রহসন মাত্র। এতে কথায় এবং কাজে একেবারেই মিল থাকে না। জগৎটাকে মিথ্যা বলতে পারি তখনই, যখন আমাদের এই জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ থাকবে না। একটা জায়গায় কি একটা চকচক করছে। তাকে যদি জানি যে, ওটা ঝিনুকের খোলা, রূপো নয়, যদিও রূপোরই মত চকচক করছে, তাহলে আমরা সেই রূপোর পেছনে ছুটব না, সেটি পেতে চেষ্টা ক'রব না। কিন্তু যখন রূপো ব'লে মনে করছি এবং নেবার জন্য ছুটছি, তখন আর ওটা 'রূপো নয়, ঝিনুকের খোলা' এ-কথাটা বলা সাজে না।

আমাদের শাস্ত্র বলছেন, জগৎটা ব্যবহারকালমাত্রস্থায়ী। যেমন ঐ দড়িতে সাপটা। যে সাপটাকে দড়িতে দেখছি ভুল ক'রে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার কাছে সত্য। আমার কাছে সত্য—অর্থাৎ যে অবস্থায় আমি দ্রষ্টা, সেই অবস্থায় আমার কাছে সাপটি সত্য। কিন্তু সাপটি নিরপেক্ষ সত্য নয়, অর্থাৎ আমার পরিবর্তে আর কেউ যদি ওটাকে ভিন্নরূপে দেখে বা আমি যদি আলো নিয়ে এসে ওটাকে দড়ি ব'লে দেখি, তাহলে সাপটা আর সত্য থাকে না। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তন হ'লে তার সত্যত্বের লোপ হয়। তখনই বলা যায় সাপটা মিথ্যা, তার আগে নয়। যতক্ষণ আমাদের ব্রহ্মানুভূতি না হচ্ছে, ততক্ষণ জগৎটা আমাদের কাছে অবশ্যই সত্য ব'লে গৃহীত হচ্ছে এবং সেই সত্যের নাম আমরা দিয়েছি—'ব্যাবহারিক সত্য'। 'ব্যাবহারিক সত্য' বলতে যাবৎ ব্যবহারকাল তাবৎ স্থায়ী। যতদিন এই ব্যবহারের রাজ্যে, এই দ্বৈতের রাজ্যে আমরা আছি, এক কথায় যতদিন আমার আমিত্ব আছে, ততদিন জগৎ আছে। সুতরাং সেই অবস্থায় 'জগৎ মিথ্যা'

বলবার অধিকার আমার নেই। যদি আমি কোন কালে আমার আমিত্বকে বর্জন করতে পারি, যদি কোন কালে আমার ব্যাবহারিক ভূমিকে অতিক্রম ক'রে পারমার্থিক ভূমিতে যেতে পারি—পারমার্থিক তত্ত্বে পৌঁছতে পারি, তখনই মাত্র জগৎটা আমার কাছে মিথ্যা হবে, তার আগে নয়।

জগৎকে স্বীকার করেই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ

পরমার্থ-সত্য (Absolute Truth)—সেই সর্ব-অবস্থা-নিরপেক্ষ সত্য যতক্ষণ আমরা অনুভব না করছি, ততক্ষণ এই জগৎটাকে সত্য ব'লে মানতেই হবে, এবং এই ভাবে মানতে হয় বলেই আমরা বলি যে, পরমার্থ সত্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের সাধনের প্রয়োজন। যদি জগৎ মিথ্যা হয়, যদি দ্বৈতবুদ্ধি মিথ্যা হয়, তাকে দূর করবার জন্য এত সাধনের প্রয়োজন কি আছে? যখন আমরা জগৎটাকে মিথ্যা বলছি, তখন কোন সাধনের প্রয়োজন নেই, কারণ সাধনও মিথ্যা। এই কথাটি শাস্ত্রকারেরা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, 'জগৎ যদি মিথ্যা হয়' 'আমি'ই যদি না থাকি, তা হ'লে আর কার জন্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের উপদেশ? কিন্তু শাস্ত্র বলছেন যে, এই আত্মতত্ত্বকে জানতে হবে, জানবার জন্য শুনতে হবে। শুনে মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই যে 'করতে হবে' বলা হচ্ছে, কার জন্য বলা হচ্ছে? কে করবে? যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকে, তাহলে আর উপদেশ কার জন্য? কে বা উপদেশ করছে, কার জন্যই বা উপদেশ? সুতরাং এইভাবে জগৎটকে কখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জগৎটাকে সত্য ব'লে মেনে নিলেই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সঙ্গত হয়। 'এটা করবে, ওটা করবে না', 'এটা ভাল, ওটা মন্দ'—এ-সব কথা তখনই অর্থবহ হয়। গীতা বলছেন, 'হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে' (১৮।১৭)—জগতের সমস্ত প্রাণীকে হত্যা

করলেও তিনি হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না। কারণ তাঁর কোন কর্ম নেই—তিনি পারমার্থিক সত্যকে জেনেছেন, নিজেকে শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় আত্মা ব'লে অনুভব করেছেন। এই যে কথাটি বলা হ'ল, এই কথাটি অবলম্বন ক'রে তাহলে আমরা কি যেমন খুশী ব্যবহার ক'রব? তাহলে তার পরিণাম কি হবে?—না, নীতি-ধর্ম এগুলি সব বৃথা হ'য়ে যাবে। এদের কোন প্রয়োজন, কোন অর্থ থাকবে না। তাই শাস্ত্র বলছেন, যতক্ষণ 'তুমি' আছ, তোমার ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে, ততক্ষণ এগুলি সত্য। বন্ধন তোমার কাছে সত্য ব'লে তোমার এই 'সত্য বন্ধন' থেকে মুক্তির জন্য সাধনের প্রয়োজন, কারণ শাস্ত্র তোমাকে এই বন্ধন-মুক্তির উপায় ব'লে দিচ্ছেন। যদি তুমি জীবন্মুক্ত হও, তাহলে এ-সবে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। বেদান্ত বলছেন, 'অত্র···বেদা অবেদাঃ' (বৃহ. উ. ৪।৩।২২), সেই জীবন্মুক্তির অবস্থায় বেদ অবেদ হ'য়ে যায়, অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। কারণ তখন আর বেদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কার জন্য বেদ? কে পড়বে? বলবে কাকে? এক আত্মাই যখন আছেন, অন্য কোন তত্ত্বই যখন নেই, তখন কোন ব্যবহারই নেই, শাস্ত্রেরও না।

অধ্যাস ভাষ্য ও মাণ্ডূক্যকারিকা

এইজন্য আচার্য শঙ্কর বলেছেন, 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য···নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' (ব্রঃ সূঃ, অধ্যাস ভাষ্য) এই জগতের সমস্ত ব্যবহার, সত্য এবং মিথ্যাকে মিশিয়ে। সমস্ত ব্যবহার লৌকিক ব্যবহার এবং বৈদিক ব্যবহার দুই-ই—'লৌকিকা বৈদিকাশ্চ সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি প্রতিষেধমোক্ষপরাণি' (অধ্যাসভাষ্য)। অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি যা কিছু বৈদিক ব্যবহার, খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ইত্যাদি যা কিছু লৌকিক ব্যবহার এবং সমস্ত বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র পর্যন্ত—সবই হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যা, এ দুটিকে মিশিয়ে। 'সত্য' মানে যেটি অপরিবর্তনশীল,

আর 'মিথ্যা' মানে সেই সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে রয়েছে যে পরিবর্তনশীল পরিণামী বস্তু। এ দুটিকে এক ক'রে অর্থাৎ অভিন্ন ক'রে, তাদের পার্থক্য বিস্মৃত হ'য়ে আমরা লৌকিক বৈদিক সমস্ত ব্যবহারই ক'রে থাকি।

সেই পরমার্থ-সত্যকে—অপরিবর্তনশীল তত্ত্বকে—লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, 'ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥' (মাণ্ডূক্যকারিকা, ২।৩২)—পরমার্থ সত্য হ'ল এই যে, নিরোধ অর্থাৎ প্রলয় নেই, উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম নেই, বদ্ধ অর্থাৎ সংসারী জীব নেই, সাধক নেই, মুক্তিকামী নেই, মুক্ত বলেও কেউ নেই। এই পরমার্থ সত্যকে ব্যবহারভূমিতে টেনে নামিয়ে আনা ভ্রান্তিকর। তাতে নানা রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ঠাকুরের কথা : দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে একজন বেদান্তী থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকে নানা রকম অপযশ রটনা করছেন, শুনে ঠাকুর ব্যথিত হ'য়ে তাঁকে বললেন, 'তুমি বেদান্তী, তোমার নামে এ-সব কি শোনা যাচ্ছে?' সাধুটি বললেন, 'মহারাজ, বেদান্ত বলছে—এই জগৎটা তিন কালে মিথ্যা। সুতরাং আমার সম্বন্ধে যা শুনছেন, তাও সব মিথ্যা।' শুনে ঠাকুর যে-ভাষায় ঐ বেদান্তের সপিণ্ডীকরণ করলেন, তা সবাই পড়েছে। নিষিদ্ধ কর্মও করা হচ্ছে, অথচ মুখে বেদান্তের লম্বা লম্বা বুলি— ঠাকুর এর অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। কারণ, এই ধরনের বেদান্ত মানুষকে শুধু যে কোন কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না, তাই নয়, তার সর্বনাশ পর্যন্ত ঘটায়, কারণ তার 'আমি ব্রহ্ম' বলায়—'আমি'কে সমস্ত বাঁধনের বাইরে বলায়—তার নিরঙ্কুশ ব্যবহার তাকে অধোগামী করে।

তৎ-ত্বম্-পদার্থবিচার

তাই বেদান্তের 'আমি ব্রহ্ম' বা 'তুমিই সেই' কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে হবে। এইজন্য শাস্ত্রে আছে 'তৎ-ত্বম্-পদার্থবিচার'-এর কথা।

'তৎ-পদার্থ' অর্থাৎ সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম, আর 'ত্বম্-পদার্থ' অর্থাৎ তুমি জীব। এই যে 'তৎ' আর 'ত্বম্', তিনি আর তুমি, এ-সম্বন্ধে বিচার করতে হয়, বিচার ক'রে ক'রে এদের শোধন করতে হয়। অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে আমরা এদের বুঝি, সেই দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। এর পিছনে আরও তত্ত্ব আছে, সেগুলি বিচার ক'রে ঐ শব্দ দুটির অর্থ ঠিক করতে হয়। 'ত্বং' বা 'তুমি' মানে এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-অভিমানী জীব। যার অমুক সময় জন্ম হয়েছে, যে এখন যুবা বা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, যে কিছুদিন পরে মরবে। সেই ব্যক্তি কখনো ব্রহ্ম হ'তে পারে না। ব্রহ্ম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই রকম জন্ম-মৃত্যু-জরাগ্রস্ত যে, সে কখনো অব্যয় অপরিণামী কূটস্থ ব্রহ্ম হ'তে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র যখন বলছেন, 'তৎ ত্বম্ অসি'—'তুমিই সেই',—তখন বুঝতে হবে 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি। 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—এইসব দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট ব'লে যাকে বলছি, তার যে পরিবর্তনশীল অংশগুলি, সেগুলিকে বাদ দিলে তার ভিতরে যে অপরিণামী সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়, সেই সত্তাটি। আর 'তিনি' বললে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তার কর্তৃত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কর্মের উপরে নির্ভর করে। তা না হ'লে তার কর্তৃত্ব কি ক'রে আসে? কিন্তু যিনি কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট, তিনি পরিণামী হ'য়ে যান; কর্তা হলেই তাকে পরিণামী বলে। সুতরাং যখন 'তৎ' বা 'তিনি' বলছি, তার মানে 'ঈশ্বর' পর্যন্ত নয়। এর পিছনে, এর পটভূমিকায় কোন একটি অপরিণামী সত্তা আছেন, যিনি কিছুই করছেন না, সৃষ্টি স্থিতি লয়—কোন কাজই যিনি করছেন না। তাঁকেই 'তৎ' বা 'তিনি' ব'লে লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং 'তৎ' পদ এবং 'ত্বম্' পদ, 'তিনি' আর 'তুমি'—এই দুটি পদকে বিশ্লেষণ ক'রে আমরা যখন এদের পিছনে যে এক অদ্বিতীয় অপরিবর্তনশীল, অপরিণামী সত্তা আছে, তাতে পৌঁছচ্ছি, তখন আর ভেদের কারণ কিছু খুঁজে পাওয়া

যায় না। একটি থেকে আর একটিকে পৃথক্ করবার মতো কোন ধর্ম সেখানে আর থাকে না। তাই এই দুটিকে এক বলা হয়েছে, দুটি ভিন্ন নয়, বলা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ব্যবহারক্ষেত্রে দ্বৈতভাব

এই যে অভেদ-জ্ঞানের কথা বলেছে, সেই অভেদ কখনো এই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে হ'তে পারে না, এ-কথা শাস্ত্র বার বার বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই অভেদত্ব মানলে বেদান্তের অপব্যবহার হয়, যার নিন্দা ঠাকুর করেছেন। যারা বেদান্তের অপব্যবহার করে, তাদের 'হঠবেদান্তী' বলে—জোর ক'রে বেদান্তী হওয়া। শাস্ত্র মানুষকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন,—তোমরা যেন এই রকম 'হঠবেদান্তী' হ'য়ো না। ঠাকুর বলছেন, তার চেয়ে পার্থক্য থাকা ভাল। বলছেন, তার চেয়ে তিনি আর আমি ভিন্ন, আমি দাস তিনি প্রভু, আমি তাঁর সন্তান, তিনি আমার পিতা, মাতা—এই রকম বুদ্ধিতে পার্থক্য রেখে মানুষ এগোতে পারে।

প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য

শাস্ত্র যখন অভেদ-জ্ঞান করতে বলেছেন, তখন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যে ভেদ, তাকে অস্বীকার ক'রে নয়। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, সোনার যা কিছু, তা সবই সোনা। যেমন সোনার ঘটি, সোনার বাটি, সোনার হাতী,—এগুলি সব সোনা। কিন্তু সোনার ঘটি আর সোনার হাতী দুটো এক হয় না কখনো। পঞ্চভূত দিয়ে সবই হয়েছে; বালিও হয়েছে, তিলও হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা তেল বার করবার জন্য চেষ্টা করি, তখন বালি পিষে তেল বার করতে পারি না, তিলকে পিষে তেল বার করি। যদি সবই ব্রহ্ম হয়, তাহলে বালিও ব্রহ্ম, তিলও ব্রহ্ম অর্থাৎ বালিও যা, তিলও তা। অতএব বালি পিষলে তেল বেরুবে।

কিন্তু তা তো কখনো হয় না! ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য আছে, সেটি রাখতেই হয়। আমরা ব্যবহারকে কখনও ঐ ভাবে 'ন স্যাৎ' করতে পারি না। যাঁরা বলেন সবই ব্রহ্ম, তাঁদের কাউকে খাবার সময় যদি ঐরকম এক রাশ বালি পাতে দেওয়া যায় এই ব'লে যে, অন্নও ব্রহ্ম, বালিও ব্রহ্ম; সুতরাং এক থালা বালি দিলাম, খাও তুমি এখন, তাহলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়! যখন আমরা সবই ব্রহ্ম বলি, তার তাৎপর্য ব্যবহারেতে কখনও নয়। ব্যবহারের পিছনে যে তত্ত্ব রয়েছে অব্যবহার্য, ব্যবহারের অতীত, যা সমস্ত বিক্রিয়ারহিত, যা কখনও কোনরকম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, সেই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা সব ব্রহ্ম বলি, ব্রহ্ম আর জীব অভেদ বলি। তা না হ'লে জীব—যে জীবকে আমরা অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ দেখি, আর ঈশ্বর যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, এ দুটি কখনও অভিন্ন হয় না। যদি অভিন্ন হ'ত তাহলে জীবই জগৎ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু জীব তা কখনও পারে না। কারণ, সে অল্পশক্তিমান্। জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছেন, 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ॥' (শ্বেতা. উ. ৫।৯) জীব কি রকম? —না, একটি চুল, তাকে একশ' ভাগ ক'রে তার একটি ভাগ নিয়ে তাকে আবার একশ' ভাগ করলে যেটি হয়, সেটি যেন একটি জীব। সুতরাং এই বিরাট জগতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব কতটুকু? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর চেয়েও অণু। সেই জীব যদি বলে, 'আমি ব্রহ্ম', তাহলে একেবারে উন্মত্তের প্রলাপের মতো হয়।

সুতরাং এই ভাবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' হয় না। আমার পিছনে যে অবিকারী সত্তা রয়েছে, যে সত্তা থাকার জন্য আমার সমস্ত ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে, যাকে অবলম্বন ক'রে আমি অস্তিত্ব-বিশিষ্ট—আমি রয়েছি, আমি অনুভব করছি, আমার প্রকাশ হচ্ছে, আমার জ্ঞান হচ্ছে, সেই তত্ত্বটিই পরমার্থতঃ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। সেই তত্ত্বটির কোন ধারণা আমাদের

হচ্ছে না, অথচ বলছি, 'আমি ব্রহ্ম।' অযথা মুখে আমরা বলি 'আমি ব্রহ্ম।' ঠাকুর বলেছেন, "কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে! কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' ক'রে উঠতে হয়।" আমি শরীর নই, দেহধারী জীব নই, এ-রকম মুখে বলছি। কিন্তু প্রতি পদে আমাদের অনুভব করিয়ে দিচ্ছে—আমি দেহধারী, আমি জরা-মরণগ্রস্ত, সর্বপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ। সেই আমিকে নিয়ে বলছি, আমি এ-সব বন্ধনাদি থেকেমুক্ত। এ-কথা বলা পাগলের মতো বলা। একজন পাগলকে দেখেছি সে বলছে, 'আমি অমুক রাজ্যের মহারাজা' আর এক টুকরো কাগজে লিখে এক ব্যক্তিকে বলছে, 'এই তোমাকে একটা চার লাখ টাকার চেক দিলুম, ভাঙিয়ে নাও।' অথচ ব্যাঙ্কে তার কিছুই নেই। একেই বলে পাগল। যে কেবল আবোল-তাবোল কথা বলে, যার কথার সঙ্গে বাস্তবের কোন সঙ্গতি নেই, তাকে বলে পাগল। সুতরাং তত্ত্বের উপলব্ধির ঘরে যদি আমাদের শূন্য থাকে, অথচ আমরা মুখে বলি, 'আমি ব্রহ্ম', সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মর্মে মর্মে বুঝি, আমি দেহধারী জীব, দুদিন আগে জন্মেছি, দুদিন পরে ম'রব, আর সারা জীবন সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, অথচ মুখে বলছি, 'আমি ব্রহ্ম'—এটা পাগলের কথা! ঠাকুর বার বার বলছেন, এ-রকম মিথ্যা অভিমান ভাল নয়। কেন? না, তাহলে তার উন্নতির আর কোন পথ রইল না। যে উন্নতিটাকে পাগলামির দরুন আমরা মিথ্যা বলছি, তার জন্য চেষ্টা থাকে না। মিথ্যা বস্তুর প্রাপ্তির জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা হয় না মানুষের। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

জগতের মিথ্যাত্ব—চরম অনুভূতিসাপেক্ষ

আমরা স্বপ্নকে মিথ্যা বলি! কখন বলি? জেগে উঠে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নকে মিথ্যা বোধ করি না। সেটাকে একেবারে একান্ত সত্য ব'লে

বোধ করি। ঘুম ভেঙে উঠে আমরা স্বপ্নটাকে মিথ্যা বলি। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্নের ভিতর আছি, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলি—জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলির মতোই সত্য মনে হয়, তার চেয়ে কম নয়। জেগে উঠলেই স্বপ্নের জিনিসগুলি মিথ্যা ব'লে জানতে পারা যায়, তখন স্বপ্নাবস্থাকে 'মিথ্যা,' বলা যায়। ঠিক সেই রকম জাগ্রৎ অবস্থাকে 'মিথ্যা' বলতে হ'লে আমাদের জাগ্রতের চেয়ে আরও একটি উচ্চতর অবস্থায় উঠতে হবে। তখনই আমরা বুঝতে পারব যে জাগ্রৎ অবস্থাটাও মিথ্যা এবং তখনই তাকে 'মিথ্যা' বলার অধিকার হবে। যতক্ষণ আমরা এই জাগ্রতের ভিতরে রয়েছি, জাগ্রৎ অবস্থাকে মিথ্যা বলবার কোন অধিকার নেই আমাদের। তবে শাস্ত্র বা আচার্যেরা 'জগৎ মিথ্যা' বলছেন কেন ? বলছেন এই জন্য যে, জগতের অতীত তত্ত্বে আরোহণ করবার জন্য আমাদের পক্ষে এই উপদেশটি প্রয়োজন। বোবায় ধরলে ঘুমন্ত লোককে ডেকে জাগিয়ে দিতে হয়, ঠিক সেই রকম শাস্ত্র আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় নাড়া দিয়ে বলেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।' তোমরা ঘুমোচ্ছ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ, তোমরা ওঠ, জাগো। শাস্ত্র বা আচার্যেরা বলছেন না, 'তুমি কল্পনা করো, জগৎটা মিথ্যা।' এই কল্পনা কোন দিন আমাদের জগৎটাকে মিথ্যা ব'লে বোধ করাতে পারবে না। জগতের অতীত তত্ত্বে না পৌঁছানো পর্যন্ত, ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত, এই জগৎটা এখন যেমন সত্য, আজ যেমন সত্য, কাল তেমনি সত্য থাকবে। সুতরাং জগৎটাকে ব্যবহার-ভূমিতে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই ঠাকুর বলছেন, যে ঐ ভাবে উড়িয়ে দেয়, তার কথাটাও উড়িয়ে দেবার মতো হয়। অতএব ঐ ধরনের বেদান্তবুলির ঠাকুর নিন্দা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ও ব্যাখ্যা

তারপর ঠাকুর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দৃষ্টান্তটিও খুব সুন্দর। বলছেন, "কি রকম জানো? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে।" 'কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না' অর্থাৎ ভাব হচ্ছে এই যে, আমাদের উপাধিগুলি, আবরণগুলি, সরাতে সরাতে কি বাকী থাকে শেষ পর্যন্ত? ঠাকুর বলছেন কিছুই বাকী থাকে না। কিছুই বাকী থাকে না মানে কি? শূন্য হ'য়ে যায়? ঠিক তা নয়। আমাদের এই যে 'আমি' যে 'আমি'কে নিয়ে সর্বদা ব্যবহার করছি সেই 'আমি'র ভিতরে পরিণামী বস্তু যেগুলি, যেগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে, সেগুলিকে এক এক ক'রে সরিয়ে দিলে বাকী কি থাকে? বাকী থাকে একটি জিনিস। বাকী থাকে সে নিজে যে সরিয়ে দিল। আমি উপাধিগুলোকে এক এক ক'রে সরালাম, কিন্তু আমাকে আমি কি ক'রে সরাবো? এক এক ক'রে আমি আমার উপরে যত আবরণ সব সরালাম, কিন্তু একটি তত্ত্ব রইল, সে তত্ত্বকে আর সরাবার কেউ রইল না। ভাব হচ্ছে এই যে, জীব যখন সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মের মতো অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় হয়—ব্রহ্মস্বরূপ হয়। তখন আর তার জীবত্বের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীজী এই বেদান্তেরই কথাটি বলেছেন—তাঁর ভাষায়: " 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।" 'এ নয়, এ নয়' ক'রে চলতে চলতে শেষে যেখানে এসে মানুষ থেমে যায়, সেখানে অবশিষ্ট থাকে 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন, দেশহীন, সর্বহীন' তত্ত্ব, যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়, যিনি জীবের প্রকৃত স্বরূপ!

অধ্যারোপ-অপবাদ

এই যে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে এক এক ক'রে সরানো, একে বলে অপবাদ—'অধ্যারোপের অপবাদ'—আমার উপরে যা কিছু আরোপিত

হয়েছে, যে সব আবরণ এসে পড়েছে, সেই সব আবরণ বা আরোপিত বস্তু সরিয়ে দেওয়া। যেন আত্মার উপরে কতগুলি খোলস চাপা দেওয়া হয়েছে, সেই খোলসগুলিকে এক এক ক'রে সরিয়ে দিতে হয়। তারপর সরাতে সরাতে আর যখন সরাবার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, তখন যা রইল তা-ই থাকে। কিছু রইল না, এ-কথা বলা যায় না। নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বহু জায়গায় এই জিনিসটি—বেদান্তের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি—বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই বাকী থাকে না, এই কথা বলেছেন। সেই রকম উপাধিগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যা ছাড়ানো যায়। কিন্তু অবশিষ্ট থাকে না মানে হচ্ছে, এমন কিছু থাকে না, যা সরানো যায়। 'এটা আমি নয়', 'এটা আমি নয়' বলতে বলতে, যেখানে আর নিষেধ করবার কিছু বাকী থাকে না—নিষেধের শেষ যেখানে, সেখানে আর কোন শব্দাদির দ্বারা ব্যবহার সম্ভব নয়। তাকে শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা যায় না। তাকে বর্ণনা করা যায় না। কে বর্ণনা করবে? ঠাকুর বলেছেনঃ নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, গিয়ে সমুদ্রে গলে গেল। সমুদ্র কেমন—আর কে খবর দেবে? নুনের পুতুল—শব্দটি লক্ষ্য করবার মত—মানে নুনটি পুতুলের স্বরূপ। নুনই তার সব, কেবল একটা আকার আছে। সমুদ্র, তারও স্বরূপ নুন। নুনের পুতুল সমুদ্রে নামল সমুদ্রকে মাপবে ব'লে। কত জল, ভিতরে কি আছে দেখবে ব'লে। কিন্তু মাপতে গিয়ে সে গলে গেল। সমুদ্রের সঙ্গে তার আকারগত যে একটা পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্যটি দূর হ'য়ে গেল। আর খবর দেবে কে? জীব যখন ব্রহ্মের অনুসন্ধান করতে করতে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নতা বুঝাবার মতো তার যে ধর্মগুলি ছিল, যে রূপগুলি ছিল, যে বিশেষণগুলি ছিল, সেগুলি থেকে এক এক ক'রে মুক্ত হ'য়ে গেল, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ আর কে বলবে?

উপনিষদ্বাক্য-জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥' (কঠ. উ ২।১।১৫)

—যেমন একবিন্দু শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলরাশির ভিতরে পড়ে সেই জলরাশির সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যায়, তদ্রূপ হ'য়ে যায়, সেই রকম জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মাও ব্রহ্মাভিন্ন হ'য়ে যায়—ব্রহ্মরূপ হ'য়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর আর সেই ব্রহ্মবস্তু থেকে পৃথক্ করবার মতো কোন ধর্ম (বৈশিষ্ট্য) অবশিষ্ট থাকে না। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যান। এই অভিন্নতা কিন্তু অর্জিত নয়। আবরণগুলি সরানো হয় ব'লে, পোশাক ছাড়ার মতো আরোপিত বস্তুগুলি এক এক ক'রে সরাতে হয় ব'লে—এ-কথা বলা চলে না যে, জীব ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা অর্জন করে। যেমন দৃষ্টান্ত আছে: কলসী সমুদ্রে ডোবানো আছে। সমুদ্রের ভিতরে কলসীটি সম্পূর্ণ ডোবানো আছে। আমরা বলি বটে সমুদ্রের জল আর কলসীর জল। আসলে কলসীতে যে জল, সমুদ্রেও সেই জল। কলসীর যে আকারটা, তা যেন সমুদ্রের জলটাকে কলসীরূপেতে আকারিত করছে। কলসীটাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ কলসীর জলটার কি হয়? সমুদ্রে মিশে যায়? সে তো মিশেই ছিল! সে তো কোন দিন সমুদ্রের জল থেকে পৃথক্ ছিল না—সমুদ্রের জল আর কলসীর জল তো সর্বদাই এক হ'য়ে ছিল। আমরা কেবল তার আবরণের জন্য তাকে পৃথক্ ব'লে মনে করছিলাম। বিচারের দ্বারা আমাদের সেই পার্থক্যবোধটা দূর হ'য়ে যায়। জীবেরও ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ-প্রাপ্তি মানে যে পার্থক্যবোধটা তার মনে রয়েছে, যার ফলে তার 'আমি' দানা বেঁধেছে, সেই পার্থক্যবোধটার লোপ হওয়া—কিছু অর্জন করা নয়। তখন যা ছিল, তা-ই থাকে।